অন্তর দীপ জ্বালো

জীবনের
বহুমুখী
চ্যালেঞ্জকে
সুযোগে
রূপান্তরের
কলাকৌশল

মহাজাতক

মহামতি বুদ্ধ
যখন নগরে নগরে ধর্মপ্রচার করছেন,
তখন কিশোরপুত্র রাহুল
এসে বলল, মা বলেছেন—
আপনার অনেক সম্পদ।
সেখান থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে
আমাকে কিছু দিন।

বুদ্ধ হেসে তাকে জীবনের আসল
সম্পদের সন্ধান দিলেন। বললেন—
'আত্মদীপ ভবঃ!'

অন্তর দীপ জ্বালো বইয়ের মূল লক্ষ্যও তা-ই। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ইতিবাচক করার, চ্যালেঞ্জগুলোকে সুযোগে রূপান্তরিত করার, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কলাকৌশলই বর্ণিত হয়েছে এ বইয়ের সংকলিত আলোচনায়।

মহাজাতকের লেখা অন্যান্য বই

- সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড
- শুদ্ধাচার
- আত্মনির্মাণ
- কাজ প্রেম দেশ
- বন্ধুত্ব প্রেম বিয়ে
- পরিবার সুখ সম্মান
- জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন
- কোয়ান্টাম ভাবনা ফিউশন (অণু বই)
- আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা
- 1001 Autosuggestions to change your life

অন্তর দীপ জ্বালো

অন্তর দীপ জ্বালো

মহাজাতক

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

অন্তর দীপ জ্বালো

মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ

মার্চ ২০২৬

মুদ্রাকর

প্রজ্ঞাপ্রকাশ
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

৩৬০ টাকা
[এ বই থেকে প্রাপ্ত আয় সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত]

ISBN : 978-984-35-8734-3

Antor Deep Jwalo
(Light the lamp within)

By : **Mahajataq**

Published by

Quantum Foundation
quantummethod.org.bd

Price : $15
[All earnings dedicated to charity]

কৃতজ্ঞতা

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সকল স্তরের
নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের—
যাদের মেধা, সময় ও শ্রমে
তরুণ প্রজন্মে কল্যাণ ভাবনার
সামাজিকায়ন ঘটছে।

সূচিপত্র

অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করবে নৈতিক জ্ঞান	১১
সততা বাঙালির শাশ্বত পরিচয়	১৭
সমমর্মিতাই হোক সকল সম্পর্কের ভিত্তি	২২
সাফল্যের বীজ ॥ আন্তরিক প্রয়াস ও সবর	২৯
ভালো কাজ ক্ষুদ্র হলেও নিয়মিত করুন	৩৪
ভালো পরামর্শ দিন, জীবন বদলে যাবে	৩৯
প্রতিকূলতা সক্ষমতা বাড়ায়	৪৬
মানুষ যা ভাবতে পারে তা অর্জন করতে পারে	৫০
কোটা নয়, মেধায় বিশ্বাস রাখুন	৫৮
তারুণ্যে জেগে উঠুক সমমর্মিতা	৬৩
সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব আপনার	৬৯
বিপন্ন সন্তানকে বাঁচান!	৭৪
একটি প্রজন্ম কি হারিয়ে যাবে?	৮০
ডিজিটাল মাদক থেকে সন্তানকে দূরে রাখুন	৮৮
ই-কমার্স ॥ আপনি প্রতারিত হচ্ছেন না তো?	৯২
আগামীর মহামারি ॥ নিঃসঙ্গতা	৯৭
ঈদ আনন্দে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করুন	১০৪
সঙ্ঘে একাত্মতা জীবনে আনে গতি	১০৯
ধ্যানঘর ॥ ভালো মানুষ, ভালো দেশ	১১৩

সূচিপত্র

জনসংখ্যাই শক্তি	১১৮
রক্ত দিন ॥ অন্তত বাঁচুক একটি জীবন	১২২
সুখাদ্য সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলে	১২৮
কোয়ান্টাম ব্যায়ামচর্চা শরীর-মন ভালো রাখে	১৩৪
ঘুম ॥ প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ	১৪০
নব্যধনিক রোগ ॥ হৃদরোগ	১৪৭
নবীপ্রেম বদলে দিক আপনার জীবন	১৫৩
গভীর ধ্যান ॥ কোরআন অনুধাবনের পথ	১৫৭
নামাজ হোক আপনার মেরাজ	১৬১
কীসে আপনি তৃপ্তি পাবেন?	১৬৬
দাতারাই স্মরণীয় হন	১৭২
অভাবীকে দিয়ে স্রষ্টার কাছে চান	১৭৯
আত্মদীপ ভবঃ	১৮৩

অন্তর দীপ জ্বালো

'বল! বল! আপনা বল!' নিজের বল বা নিজের শক্তিই আসল শক্তি। অন্যের বলের ওপর ভরসা করে কেবল দুর্বল। দুর্বল মনে করে, অমুক সাহায্য করবে। অমুক আমার বন্ধু। বন্ধু আমার পাশে থাকবে। আসলে দুর্বলের কেউ বন্ধু হয় না। সবল সাধারণত দুর্বলের সাহায্যে এগিয়ে আসে না; বরং বন্ধুত্বের নামে দুর্বলের বিপদ থেকে নিজের সুযোগটুকু নিতে চায়। সবল স্বভাবতই চায় না দুর্বল নিজের পায়ে দাঁড়াক, চায় না দুর্বল তার শক্তির উৎস খুঁজে পাক।

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে প্রতিটি মানুষের শক্তির উৎস তার নিজের মধ্যেই রয়েছে। এজন্যে মহামানবেরা সবসময় তার অনুসারীদের বলেছেন—নিজের ভেতর ডুব দাও। নিজের শক্তির উৎসে যুক্ত হও। নিজের শক্তিকে বিকশিত করতে পারাই তোমার সবচেয়ে বড় সাফল্য, সবচেয়ে বড় অর্জন।

মহামতি বুদ্ধ রাজপ্রাসাদ ও ভোগবিলাস ছেড়ে দীর্ঘ মৌনতায় ডুব দিয়ে এই সত্যটিকেই উপলব্ধি করেছেন। বোধি লাভ করার পরে তিনি যখন নগরে নগরে ধর্মপ্রচার করছেন, তখন কিশোরপুত্র রাহুল এসে বলল, মা বলেছেন—আপনার অনেক সম্পদ। সেখান থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে আমাকে কিছু দিন। মহামতি বুদ্ধ হেসে তাকে জীবনের আসল সম্পদের সন্ধান দিলেন। বললেন—'আত্মদীপ ভবঃ!'

অন্তর দীপ জ্বালো বইয়ের মূল লক্ষ্যও তা-ই। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ইতিবাচক করার, চ্যালেঞ্জগুলোকে সুযোগে রূপান্তরিত করার, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কলাকৌশলই বর্ণিত হয়েছে এই বইয়ের সংকলিত আলোচনায়।

অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করবে নৈতিক জ্ঞান

আমরা পরম প্রভুর কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে, তিনি আমাদের দেশকে নৈতিকতার চারণভূমি হিসেবে কবুল করেছেন। ইতিহাসের নানা কালপর্বে নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে আমাদের এই অঞ্চল, এই প্রাচ্য। যখন আমাদের পূর্বপুরুষরা উপনিষদের শিক্ষা—এক ঈশ্বরের উপাসনা, সমমর্মিতা, প্রেম, জীবে দয়া অর্থাৎ শাশ্বত ধর্মের বাণীসমূহ থেকে দূরে সরে গিয়ে বর্ণবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, তখন নৈতিক পুনর্জাগরণের জন্যে মহামতি বুদ্ধ এলেন।

মহামতি বুদ্ধ সাম্য, মৈত্রী এবং প্রেমের চেতনাকে নতুনভাবে জাগরিত করলেন। তিনি মানুষের দুঃখের কারণ উপলব্ধি করলেন এবং দুঃখ দূর করার প্রক্রিয়া শেখালেন। সে-সময় উচ্চবর্ণের মানুষের গায়ে নিম্নবর্ণের মানুষের ছায়া পড়লে তার অশুচি হতো। তিনি বর্ণবাদী চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিলেন যে, প্রতিটি মানুষ সমান এবং প্রতিটি মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনা করে যে-কোনো স্তরে উন্নীত হতে পারে।

সকল ধর্মের উৎসভূমি প্রাচ্য আর নৈতিকতার প্রাণ হচ্ছে ধর্ম। নৈতিক শিক্ষা, মানবিক শিক্ষার ব্যাপারে আমরা সবসময়ই উদার ছিলাম। যখন শান্তির বাণী নিয়ে সুফিরা দরবেশরা এই অঞ্চলে এলেন, তখন আমরা সহজেই তাদের বাণীকে গ্রহণ করলাম। ধর্মীয় শিক্ষার ফলে অসাম্প্রদায়িক চেতনা অর্থাৎ ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে যে-কোনো মানুষকে আপন করে নেয়ার সামর্থ্য এই অঞ্চলের মানুষের সবচেয়ে বেশি।

প্রাচ্যের ধ্যানের জ্ঞান, ধর্মের জ্ঞান যিনি গ্রহণ করেছেন তিনি হয়েছেন সমমর্মী ও ন্যায়বিচারক। আপনি খেয়াল করে দেখেন, পাশ্চাত্যের সব দস্যুরা

হচ্ছে হিরো। হলিউডের ওয়েস্টার্ন সিরিজ দেখেন। সেখানে বীর তারা, যারা শুধু গুলি চালায়। পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান-এর বীর কী করে? জলদস্যু। সম্পদ লুট করে। সম্পদ লুট করে কত জড়ো করেছে, শুধু সেটার প্রদর্শনী। আর আমাদের দস্যুরা? যারা প্রবীণ আছেন তারা পড়েছেন দস্যু মোহন আর দস্যু বাহরাম সম্পর্কে। এরা ধনীরটা লুট করে গরিবের মধ্যে বিতরণ করে। কেন? কারণ হাজার বছরের যে নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, এটা আমাদের ডিএনএ-র মধ্যে বহমান। যে কারণে কোনটা কল্যাণকর, কোনটা অকল্যাণকর—এটা আমরা যত দ্রুত বুঝতে পারি, পাশ্চাত্যের লোকজন এত দ্রুত পারে না।

ইংরেজ রাজনীতিক লর্ড ম্যাকলের নেতৃত্বে ১৮৩৫ সালে ভারতবর্ষে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করা হলো। আমরা নৈতিক জ্ঞান থেকে প্রথমবারের মতো বঞ্চিত হলাম। ভেজালের দুনিয়ায় প্রবেশ করলাম। আমাদের পণ্ডিতরা জ্ঞানীরা ঋষিরা দরবেশরা শিক্ষা দিতেন—অন্যায় করবে না, অপচয় করবে না, মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না আর ভেজাল দেবে না। সেই শিক্ষার বদলে ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হয়। আমরা শিখলাম, ভেজাল করলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। আমাদের শেখানো হলো, পাঁচ সের দুধের সাথে দুই সের পানি মেশালে গোয়ালার কত লাভ হবে। ভেজালটা যে লাভজনক, অন্যায়টা যে লাভজনক, অনৈতিকতা আর প্রতারণা যে লাভজনক, শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই দুর্বুদ্ধি আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আজ আমাদের সমাজের একটি শ্রেণির ওপর অনৈতিকতার প্রভাব প্রবলভাবে দৃশ্যমান।

গত কয়েক দশক ধরে নৈতিকতার জ্ঞান থেকে আমাদের তরুণ প্রজন্ম বঞ্চিত। তারা পণ্য-সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পরে পড়েছে। অভিভাবকেরা সন্তানকে একটাই লক্ষ্য দিয়েছেন—গোল্ডেন এ প্লাস! চারপাশের সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ হচ্ছে এই নৈতিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং নৈতিকতা বিনাশী উপাদানগুলোর সহজলভ্যতা, যেটাকে আমরা ডিজিটাল আসক্তি বলি। ফলে গেম, পরকীয়া আর অবুঝ প্রেমে চারদিক সয়লাব। সাত-আট বছর বয়স থেকে শুরু। প্রেম কী এটা বোঝেই না, কিন্তু সে প্রেম করছে!

নৈতিকতার মানদণ্ডটা কী হতে পারে? আপনার অন্তরকে যা প্রশান্ত করে, যা তৃপ্তির অনুভূতি দেয়, যা মানবিকতার প্রকাশ ঘটায় সেটাই হচ্ছে নৈতিকতা। অন্যদিকে কোনো চিন্তা বা কাজ যদি অন্তরে বাধা সৃষ্টি করে, দ্বিধা সৃষ্টি করে, কোনো চিন্তা বা কাজ যদি অন্য কেউ জেনে যাওয়াটাকে আমরা অপছন্দ করি সাধারণভাবে সেটাই অন্যায়, সেটাই অনৈতিক। এ ব্যাপারে

রসুলুল্লাহ (স) খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'পাপ কী, পুণ্য কী—তা তুমি জানতে চাচ্ছ? তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করো, উত্তর পেয়ে যাবে। যে চিন্তা বা কাজ অন্তরে তৃপ্তি ও প্রশান্তি আনে, তা-ই পুণ্য। আর যে কাজ করতে গিয়ে মনে খটকা লাগে, অন্তরে অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়, তা-ই পাপ। যদিও কেউ কেউ সে-কাজকে বৈধ বলে ফতোয়া দিতে পারে, কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তাতে কিছু যায়-আসে না।' *[ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ (রা); আহমদ, দারিমি]*

আমাদের এই বাংলা নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং মানবিকতার লীলাভূমি। এখানে রাজা অন্যায় করলে রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেত। কাজির সামনে সেই অভিযোগের জবাব দিতে রাজা বাধ্য হতেন। অভিযোগের মীমাংসা করা হতো কাজির নির্দেশ অনুসারে। প্রাচ্যে খলিফার অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের জামা কেন লম্বা হলো, এই অতিরিক্ত কাপড় তিনি কোথা থেকে পেলেন, জুমআর খুতবা থামিয়ে আগে তার জবাব দিতে হয়েছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের শিক্ষাই হচ্ছে, কিং ক্যান ডু নো রং—রাজা কোনো অন্যায় করতে পারে না। তফাৎ হচ্ছে এখানটায়। এই নৈতিক জ্ঞান, নৈতিক শিক্ষা যে দেশে গিয়েছে, তারা মানুষ হিসেবে সভ্য হয়েছে। তাদের দেশে, তাদের এলাকায় নিরাপত্তা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের জাতির পিতা হচ্ছেন লি কুয়ান ইউ। দীর্ঘ তিন দশক তিনি সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অপরাধ ও দারিদ্র্য জর্জরিত দেশকে সভ্য দেশে পরিণত করেছিলেন তিনি। কী দিয়ে? নৈতিক শিক্ষা দিয়ে। যখন প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়লেন তার কয়েক বছর পরে একটা ডেভেলপার কোম্পানি থেকে তিনি দুটি সম্পত্তি ক্রয় করেন। কোম্পানিটির পরিচালক পদের একজন ছিলেন লি-এর নিজের ভাই। এই ঘটনার পর পরই সম্পত্তির মার্কেট প্রাইজ বেড়ে যায় এবং ডেভেলপার কোম্পানিগুলো স্বাভাবিকভাবেই বাড়ির দাম বাড়িয়ে দেয়। সে-সময় দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গোহ চক তং। নামটাও সুন্দর। আমাদের নাম শুনে তারাও হয়তো এরকমই বলে যে, নামটা খুব সুন্দর!

প্রধানমন্ত্রী গোহ চক তং অভিযোগ করেন যে, ডেভেলপারদের কাছ থেকে লি কুয়ান বাড়তি সুবিধা নিয়েছেন। স্বজনপ্রীতি আর ক্ষমতার কারণে ডিসকাউন্ট লাভ করেছেন। গোহ চক তং-এর অভিযোগের ভিত্তিতে লি কুয়ান-এর বিরুদ্ধে তদন্ত হলো। সিঙ্গাপুর এক্সচেঞ্জ এবং মনেটারি অথরিটি তদন্ত করার পরে বললেন, না, লি কুয়ান নির্দোষ। লেনদেনটি নিয়মমতোই

হয়েছে। কিন্তু লি খুব মনোকষ্টে ভুগছিলেন।

ডিসকাউন্টের পরিমাণ ছিল এক মিলিয়ন ডলার। তিনি এক মিলিয়ন ডলার সরকারি কোষাগারে জমা দিলেন। যেহেতু আইনি প্রক্রিয়ায় অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ-কে টাকাটা ফেরত দেয়া হয়। লি কুয়ান বিষয়টাকে ধামাচাপা দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। ভবিষ্যতে যে-কেউ বলতে পারে—ভাই পরিচালক হওয়ার সুবাদে লি কুয়ান বাড়তি সুবিধা পেয়েছেন। এজন্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে তিনি বললেন, তুমি সংসদে অভিযোগটি উত্থাপন করো। অন্যায় যে তিনি করেন নি সেটা সংসদেও প্রমাণিত হয়। কিন্তু ঐ এক মিলিয়ন ডলার তিনি আর ফেরত নেন নি। তিনি সেটা সরকারি কোষাগারেই দিয়ে দিয়েছেন।

কোনো ব্যাপারে প্রশ্নবিদ্ধ না হওয়ার এই যে গুণ, সেটা লি কুয়ান ইউ-এর ছিল। যেহেতু তিনি নৈতিক শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন সেজন্যে তিনি সিঙ্গাপুরকে অপরাধ দুর্নীতি ও দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে পেরেছিলেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতা যদি বলেন, সংসদে অভিযোগ নিয়ে আসো—সেখানে আইনশৃঙ্খলার কোনো ব্যত্যয় হতে পারে না।

সিঙ্গাপুর এমন একটি দেশ, যেখানে রাতের বেলা একটি কিশোরী রাস্তায় একা চলাফেরা করতে পারে। কারণ সে জানে যে, তার দিকে অন্যভাবে তাকানো মানে হচ্ছে প্রকাশ্যে ১০ বেত! যদি সে অভিযোগ করে। সিঙ্গাপুরে কেউ থুথু ময়লা যেখানে-সেখানে ফেলে না। থুথু এবং ময়লা ফেললে এটার শাস্তিও খুব ভালো। পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের ওপর দিনব্যাপী সেমিনারে অংশ নিতে হবে, এটা হচ্ছে এক নম্বর শাস্তি। দুই নম্বর শাস্তি হচ্ছে, যে-কোনো এলাকা সারাদিন ঝাড়ু দিতে হবে। আসলে শাস্তি সবসময় দৃষ্টান্তমূলক হতে হয়। তা না হলে আইনের শাসন ঠিক থাকে না।

আমাদের যারা বুদ্ধিজীবী ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন, বিচারক ছিলেন, ইংরেজ শাসন আমলেও তারা নৈতিক শক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপে নুরেমবার্গ ট্রায়ালের অনুরূপ ট্রায়াল ছিল টোকিও ট্রায়াল। জাপানিজ যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির জন্যে জেনারেল ম্যাকআর্থার ট্রাইবুনাল গঠন করেছিলেন। আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চায়না, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং ভারতের মোট ১১ জন বিচারক নিয়ে ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। এই ট্রাইবুনাল সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, ট্রাইবুনাল জেনারেল ম্যাকআর্থারের পরামর্শ মতোই কাজ করবে।

অস্ট্রেলিয়ান বিচারপতি উইলিয়াম ফ্লাড ওয়েব ট্রাইবুনালের প্রধান

ছিলেন। সেই ট্রাইবুনালে তখনকার ব্রিটিশ ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাধা বিনোদ পাল। যিনি বিচারকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে সবচেয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিচারপতি রাধা বিনোদ পাল আমাদের কুষ্টিয়ার সন্তান।

১৯৪৬ সালে ট্রাইবুনাল কাজ শুরু করে। তখনকার জাপানিজ প্রধানমন্ত্রীসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। তার মধ্যে দুই জন আত্মহত্যা করেন বা মারা যান এবং একজন পাগল হয়ে যান। ২৫ জনের বিচার কাজ চলে। ম্যাকআর্থারের পরিকল্পনা ছিল, অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ডসহ নানান মেয়াদের কারাদণ্ডের পাশাপাশি জাপানের ওপর যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনে বিপুল অর্থদণ্ড করা, যেন যুগের পর যুগ সেই টাকা তারা শোধ করতেই থাকে।

পুরো ট্রাইবুনালে ১০ জনের বিপক্ষে পাহাড়ের মতো দাঁড়ান বিচারপতি রাধা বিনোদ পাল। তিনি প্রথমেই ট্রাইবুনালের ভেতরের কর্মকাণ্ডের বিষয় গোপন রাখার শপথ নিতে অস্বীকৃতি জানান যে, না, এটা গোপন কেন থাকবে! ম্যাকআর্থার তাকে বিশেষ বিমানে করে আনেন এবং বিলাসী স্থানে রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তিনি প্রশ্ন তোলেন এই ট্রাইবুনালের বিচার করার নৈতিক অধিকার নিয়ে। কারণ ট্রাইবুনালের সব দেশই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। ১৯৪৮ সালে বিচার কাজ শেষ হয়।

পুরো ট্রাইবুনাল দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগে ১০ জন, আরেকভাগে এই বাঙালি বিচারপতি রাধা বিনোদ পাল। ১০ জন রায় দেন একরকম। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছে, ট্রাইবুনাল এটাকেও জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে যে, যদি পারমাণবিক বোমা ফেলা না হতো, তাহলে জাপান যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করত না।

রাধা বিনোদ পাল এর বিরোধিতা করে মত দেন—পারমাণবিক হামলা না হলেও জাপান আত্মসমর্পণ করত। ট্রাইবুনালের রায়কে তিনি প্রহসন হিসেবে বর্ণনা করেন। ট্রাইবুনালের মূল রায় ছিল আটশ পৃষ্ঠা। এর বিপরীতে তিনি লেখেন ৪৩৫ পৃষ্ঠা। এটাই ছিল প্রথম এত বিশাল আকৃতির, ১২৩৫ পৃষ্ঠার, কোনো আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের রায়। তিনি বলেছিলেন, জাপানকে এককভাবে অপরাধী করা চরম ভুল। বাকি দেশগুলোও একই অপরাধে অপরাধী। তিনি আরো বলেছিলেন, হিরোশিমায় এক লাখ ৪০ হাজার এবং নাগাসাকিতে ৭৪ হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। যুদ্ধাপরাধের জন্যে যদি জাপানের বিচার করতে হয়, তাহলে বাকিদেরও বিচার করতে হবে।

আসলে একজন মানুষের কতটা নৈতিক শক্তি থাকলে একটি পরাধীন দেশের বিচারপতি হয়েও ১০ জন বিচারকের বিপক্ষে এত শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে পারেন! সেখানে ন্যায়ের পক্ষে একমাত্র বলেছিলেন এই বাঙালি—রাধা বিনোদ পাল। ৬ আগস্ট ১৯৫২ সালে হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা হামলার স্মরণ অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, যদি জাপানিরা আবার যুদ্ধে জড়ায়, তবে হিরোশিমার নৃশংসতায় নিহত মানুষদের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা করা হবে। এরপরেই জাপান ১৯৫৩ সালে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে এবং যুদ্ধ না করার নীতি ঘোষণা করে।

১৯৫৩ সালে জাপানের ওপর থেকে পাশ্চাত্য অনেক অবরোধ এবং নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। সে-বছরই ট্রাইবুনালের পুরো রায়টি বই আকারে প্রকাশিত হয়। জাপানিরা এই বইয়ের নাম দিয়েছে *দ্য বাইবেল অব পিস*।

আমাদের চারপাশে অনৈতিকতার ছড়াছড়ি, কিন্তু এটা তো সত্য যে, কিছু ভালো মানুষও আছে। সেজন্যে আমাদের সমাজ এখনো টিকে আছে। আসলে ইংরেজরা একদিন আমাদেরকে শিখিয়েছিল কীভাবে ভেজাল মেশাতে হয়, কীভাবে প্রতারণা করতে হয়। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে নৈতিকতার পুনর্জাগরণে কোয়ান্টাম কাজ করছে ৩০ বছর ধরে।

যখন আত্মবিশ্বাসহীনতা আমাদেরকে সামর্থ্যের তলানিতে নিয়ে গিয়েছিল তখন আমরা প্রাচুর্যের মনছবি দেখেছি, অর্জনের মনছবি দেখেছি। এখন আমরা আমাদের ইতিবাচকতার শক্তি অনুভব করছি। আমাদের আর্থিক প্রাচুর্য আসছে। যদি আমরা নৈতিক শক্তি দিয়ে আমাদের দেশের সম্পদকে গতিশীল করি, দেশে কোনো উন্নয়ন কাজের জন্যে বিদেশিদের কাছ থেকে একটি পয়সাও নেয়ার প্রয়োজন হবে না।

নৈতিকতার পুনর্জাগরণের জন্যেই আমাদের আকর গ্রন্থ *শুদ্ধাচার*। এই বইটি যদি আমরা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করি, তাহলে নৈতিকতার জ্ঞানে মানুষ জ্ঞানী হবে। করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হবে। আমরা আমাদের ইতিবাচক ভাবনাকে সুগঠিত করতে পারব। আমাদের ভবিষ্যতের মনছবি—শান্তি সমৃদ্ধির চারণভূমি বাংলাদেশ! স্বর্গভূমি বাংলাদেশ! সেটি অর্জন করা আমাদের জন্যে শুধু সময়ের ব্যাপার হবে, যদি আমরা নৈতিক জ্ঞানকে পৌঁছে দিতে পারি প্রত্যেকটি ঘরে।

সংক্ষিপ্ত : ২৫ মার্চ ২০২২, ঢাকা

সততা বাঙালির শাশ্বত পরিচয়

একটি চিঠি দিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করতে পারি। এসএসসি পরীক্ষার্থী এক মেয়ের চিঠি। সে লিখেছে—তার বাবা ঢাকার কাকরাইলে মেডিটেশন প্রোগ্রাম শেষ করে বাসায় ফিরছিলেন। পথে বাদাম কিনলেন। বাসায় ফিরে পকেটে হাত দিয়ে দেখেন মানিব্যাগ নেই। মাসের পুরো বেতন, লাইসেন্স, এনআইডি-সহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজপত্র ছিল সেই মানিব্যাগে। সেগুলো যদি আবার নতুন করে করতে হয়, লাখ টাকার খরচ। আর পুরো মাসের বেতন তো আছেই। স্বাভাবিকভাবেই তার বাবা চিন্তায় পড়ে গেলেন। মেয়ে সাথে সাথে তার জমানো টাকা থেকে কিছু টাকা দান করল।

ভদ্রলোকের বাসা বনশ্রী। তিনি আবার বেরোলেন মানিব্যাগ খোঁজার জন্যে। খুঁজতে খুঁজতে সেই বাদামওয়ালার কাছে উপস্থিত হলেন, যার কাছ থেকে তিনি বাদাম কিনেছিলেন। তাকে দেখেই বাদামওয়ালা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মানিব্যাগটা বের করে তার হাতে দিলেন, যেন মানিব্যাগটা দেয়ার জন্যেই তিনি ওখানে বসে ছিলেন। মানিব্যাগের ভেতরে পুরো টাকা এবং কাগজপত্র সব একইরকম ছিল।

চিঠিটা পেয়ে খুব ভালো লাগল। আসলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সততার এই গুণ এখনো অবশিষ্ট আছে। চিঠি পড়তে পড়তে মনে হলো কয়েক মাস আগে নাটোরের ঘটনা। ট্রাক নিয়ে মহাসড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন ট্রাকচালক মোহাম্মদ বাবু। এসময় ট্রাকের সামনে থাকা মোটরসাইকেলের পেছন থেকে একটি ব্যাগ পড়ে যেতে দেখেন তিনি। ট্রাকটি থামিয়ে ব্যাগটি হাতে নেন। চেইন খুলে দেখেন ব্যাগটি ৫০০ ও এক হাজার টাকার নোটের বান্ডিলে ভরা! এরপর খুঁজতে থাকেন ব্যাগের মালিককে।

না পেয়ে একপর্যায়ে থানায় গিয়ে ঘটনাটি খুলে বলেন। বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ নেয়ার পর টাকার প্রকৃত মালিকের খোঁজ মেলে। ব্যাগের মালিক থানায় এসে টাকাভর্তি ব্যাগটি দেখে কেঁদে ফেলেন। ২৫ লাখ টাকাভর্তি ব্যাগ ফিরে পেয়ে ঐ ট্রাকচালককে বকশিশও দিতে চান, কিন্তু ট্রাকচালক তা নিতে অস্বীকৃতি জানান। মোহাম্মদ বাবু বকশিশ না নেয়ার প্রসঙ্গে বলেন, ২৫ লাখ টাকাই যখন ফেরত দিলাম, তখন বকশিশ কেন নিতে হবে!

গত মাসে ঢাকার গুলশানে মার্কিন নাগরিকের আইফোন ফেরত দিলেন এক রিকশাচালক। যাত্রী নামিয়ে দেয়ার পর রিকশাচালক আমিনুল ইসলাম গদির ফাঁকে একটা মোবাইল ফোন খুঁজে পান। মডেল না চিনলেও তিনি বোঝেন, ফোনটা বেশ দামি। চার্জ না থাকায় সেটি বন্ধ ছিল। ফলে কে যে ফোনের মালিক সেটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। মালিককে খুঁজে বের করতে ফোনটা চালু করা দরকার। আমিনুল উত্তর বাড্ডার একটি দোকানে গিয়ে চার্জার কেনার চেষ্টা করেন, কিন্তু চার্জারের অনেক দাম। আমিনুল তখন ফোনটির সিম খুলে নিজের ফোনে চালু করেন। ফোনের মালিক সেখানে কল করেন। আমিনুল পুলিশের মাধ্যমে মালিকের কাছে আইফোন থার্টিন প্রো ম্যাক্স ফিরিয়ে দেন। রিকশাচালক আমিনুলের স্ত্রী গার্মেন্টস কর্মী। আমিনুল বলেন, আমি গরিব। সংসারে অভাব আছে, কিন্তু অন্যের সম্পদের ওপর আমার কোনো লোভ নেই। সততা নিয়েই বাঁচতে চাই।

আমিনুল যেদিন মার্কিন নাগরিককে আইফোনটি ফিরিয়ে দেন সেদিনই বরিশালের আরেকটি ঘটনা। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া এক লাখ ৯০ হাজার টাকা স্থানীয় কাউন্সেলরের মাধ্যমে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেন এক দিনমজুর! ব্যবসায়ী শংকর কুমার সাহা মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন। দোকানে গিয়ে টের পান যে, হ্যান্ডেলে ঝোলানো টাকার ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছেন। পরে বরিশাল শহরে মাইকিং করান, কিন্তু টাকার হদিস পাওয়া যায় নি। অবশেষে টাকার আশা তিনি ছেড়ে দেন। এরপরে ঐ টাকার ব্যাগটি একজন ওয়ার্ড কাউন্সেলরের কাছ থেকে শংকর বাবু ফেরত নেন। ওয়ার্ড কাউন্সেলর বলেন, যে টাকা পেয়েছে সে একজন দিনমজুর। নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চান। ঐ দিনমজুর টাকা নিয়ে আমার কাছে এসে হারানো ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। তাকে পরীক্ষা করার জন্যে বলি, 'ঐ টাকা তুই নিয়ে যা। দেয়া লাগবে না।' সে বলে, 'একদিন মরতে হবে না! হিসাব দিতে হবে না! আপনি বিশ্বস্ত বলেই আপনার কাছে টাকার ব্যাগ রেখে গেলাম। যার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিয়েন। তাকে আমার কথা বলার দরকার নাই।'

আসলে ভালো সংবাদগুলো সংবাদপত্রে সাধারণত সামনের পাতায় আসে না। ভেতরের পাতায় থাকে। সামনের পাতায় কেবল অপরাধ দুর্নীতির খবর পড়তে পড়তে আমরা ভাবি দেশের সব মানুষই বুঝি দুর্নীতিপরায়ণ, সব মানুষই খারাপ! আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, বাংলার সাধারণ মানুষ কখনোই লোভী বা স্বার্থপর ছিল না। বরং আমাদের নির্লোভ স্বভাব, ধর্মপরায়ণতা, সততা বিদেশিদের জন্যে ছিল চরম বিস্ময়ের।

এখন থেকে ৬০০ বছর আগে বাংলার সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তার শাসনামলে চীনের সাথে বাংলার কুটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। আমাদের রাজদূতরা যেমন চীনে যেতেন, চীনের দূতরাও বাংলাদেশে আসতেন। চীনা দূতরা তাদের বইগুলোতে লিখে গেছেন বাংলার প্রকৃতি অর্থনীতি ও মানুষের স্বভাব চরিত্রের বিবরণ। ইতিহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলছিলেন, তিনি যখন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছিলেন, লন্ডনে অবস্থিত ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে চীনাদের লেখা বইগুলোতে বাঙালিকে দুটো সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। এক. বাঙালিরা মিথ্যা বলে না। দুই. তারা কারো সাথে প্রতারণা করে না।

এরও আড়াইশ বছর পরের কথা। সেই সময় বাংলার সুবেদার ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহজাদা সুজা। সুবেদারের প্রাসাদ ছিল বাংলার তৎকালীন রাজধানী রাজমহলে। এটা এখন ভারতের ঝাড়খণ্ডের ছোট্ট একটি শহর। পর্তুগীজ ধর্মযাজক সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক তার ভ্রমণকথায় লিখেছেন, তিনি গৌড় নগরের এক প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গুপ্তধন পাওয়ার কথা শোনেন মোগল কর্মচারী মির্জার কাছে। তার কাছ থেকে জানতে পারেন, এক রাখাল ছেলে ভেড়া খুঁজতে এসে একটি ভাঙা দেয়ালের নিচে এক গর্তে তিনটি তামার পাত্র পায়। দুটি বড় ও একটি ছোট। সে তার কৃষক বাবাকে ওখানে নিয়ে আসে। রাতের বেলা বাবা-ছেলে দুজনে মিলে ঘটিগুলো নিয়ে যায় বাড়িতে। একটি পাত্র খুলতেই সেটি সোনার মুদ্রায় ভরা দেখতে পেয়ে কৃষক বাবা আর ছুঁয়ে দেখেন নি। কৃষকের মনে হলো, এটি রাজকীয় সম্পত্তি এবং রাজার কাছে তা পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন। সেই কৃষক গৌড় থেকে রাজমহলে গিয়ে ঘোরাঘুরি করেন, কিন্তু সুবেদারের সাথে দেখা করার সুযোগ পান না। অনেক অপেক্ষার পর সুজার দেখা পান এবং ঘটনাটি তাকে জানান। সুজা তার কর্মচারী মির্জাকে পাঠিয়ে পাত্রগুলো আনালেন।

প্রথম দুটো পাত্র বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রায় ভরা ছিল। আর তিন নম্বর অর্থাৎ ছোট পাত্রটি খোলার পর সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল। পুরোটাই

দামি মণিমুক্তায় ভরা। পরীক্ষা করে দেখা গেল, শাহ সুজার সংগ্রহে যেসব রত্ন ছিল, তার চেয়েও এগুলো উন্নত ও মূল্যবান। তিন জন অভিজ্ঞ জহুরি দিয়ে এগুলোর দাম যাচাই করেন শাহ সুজা। তিন জনই গড় দাম বলেছিলেন, তিন কোটি টাকা। ১৬৪০-এর দশকে তিন কোটি টাকা মানে কী! এ ঘটনার ১০০ বছর পর অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, সে-সময় তিন কোটি টাকা মানে এখনকার মূল্যে এক বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১০ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি! বাবা-ছেলের সততায় মুগ্ধ হয়ে শাহজাদা সুজা সেই কৃষককে মূল্যবান উপহার ও রাজকীয় পোশাক প্রদান করেন।

সততার এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ বরাবরই সৎ নির্লোভ ও ধর্মপরায়ণ। একজন দিনমজুরও বলেন, 'একদিন মরতে হবে না! হিসাব দিতে হবে না!' এই ঘটনাগুলোর উল্লেখ আমরা এ কারণে করছি যে, নিজেদের ইতিহাস, নিজেদের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন না হলে কোনো জাতি কখনো বড় হতে পারে না। তার মধ্যে আত্মসম্মান বোধ তৈরি হয় না। জাতিগত হীনম্মন্যতা চেপে বসে।

আমাদের দেশের পাঠ্যবই পড়ে আলেকজান্ডারের বীরত্ব ও রাজা পুরুর প্রতি তার মহানুভবতার গল্প শিশুরা শেখে, কিন্তু আলেকজান্ডার যে আমাদের পূর্বপুরুষ গঙ্গারিডিদের ভয়ে রাতের আঁধারে শিবির তুলে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেই ঘটনা শিক্ষার্থীরা কখনো শোনে না।

আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন বালক বয়সে একটি চেরি গাছ কেটে ফেলে। তার বাবা যখন জিজ্ঞেস করলেন, কে কেটেছে? বালক ওয়াশিংটন স্বীকার করেছিলেন, আমি কেটেছি। খুশিতে আপ্লুত বাবা পুত্রকে জড়িয়ে ধরেন। আমরাও ওয়াশিংটনের সততা পড়ে মুগ্ধ হই। এই গল্পটি বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে ইংরেজি পাঠ্যবইগুলোতে থাকে। কই, শাহ সুজার আমলে গৌড় অর্থাৎ মালদা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার সেই কৃষকের সততার গল্প তো পাঠ্যবইতে লেখা থাকে না! এ কারণেই আমরা ভুলে যাই সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলার মানুষ অতিথিপরায়ণ উদারমনা ধর্মপরায়ণ অসাম্প্রদায়িক এবং সৎ। এটাই আমাদের ঐতিহ্য।

ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণ আমাদের সমাজ কাঠামোটাকেই ওলটপালট করে দিয়েছে। ইংরেজদের দানবীয় ক্ষুধা মেটাতে বাংলার শস্যক্ষেত, রাজকোষ, ব্যবসাবাণিজ্য সব উজাড় হয়ে যায়। সততার প্রতীক আমাদের টোল ও মক্তবগুলো তারা নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। অনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে তারা ইংরেজদের বশংবদ শ্রেণি তৈরি করে দেশীয়দের

মধ্য থেকে। যারা চেহারা-সুরতে বাঙালি হলেও ব্রিটিশ প্রভুর হয়ে খাজনা আদায় ও লাঠিয়াল বাহিনীর কাজ করত। দুর্নীতি ও ঘুষের সিলসিলা এদের হাত ধরেই এসেছে। ইংরেজদের তৈরি এই মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষেরা আজও দুর্নীতি করে। এরাই বিদেশে টাকা পাচার করে। সাধারণ মানুষ চুরি করে না, ঘুষ খায় না, অন্যের সম্পদ বাগাতে চায় না। দেশের ক্ষতি করে বিদেশে টাকা পাচার করে না, বরং তারা বিদেশে পায়ের ঘাম মাথায় তুলে মেহনত করে টাকা উপার্জন করে সেটা দেশে পাঠায়।

নিয়তির পরিহাস হচ্ছে, সাধারণ পরিবারগুলো থেকে যারা মেধার জোরে উঠে আসে এবং এই সুবিধাভোগী শ্রেণিতে নিজের একটা জায়গা করে নেয়, তারাও কেউ কেউ একসময় চৌর্যবৃত্তি ও দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ সিস্টেম নাকি সেই রকমই। যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ—এই দুষ্টচক্র থেকে বেরোনোর জন্যে আমাদের এখন দরকার ভালো মানুষ, সর্বত্র শুদ্ধাচারের প্রচলন। পঞ্চাশের দশকে চীন ও সত্তরের দশকে সিঙ্গাপুর যেভাবে জাতিগত বদভ্যাসগুলো থেকে মুক্ত হয়েছে সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।

সিঙ্গাপুরের নীতি নির্ধারকরা দেখল, প্রাপ্তবয়স্কদের যতই বোঝানো হোক যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলবেন না, থুতু ফেলবেন না—তাদের নতুন করে শেখানো যায় না। অতএব তারা সিদ্ধান্ত নিল স্কুলপড়ুয়া ছোট ছোট শিশুদের শেখাও শিষ্টাচার, শুদ্ধাচার, ভালো কথা। শিশুরা যখন এগুলো আত্মস্থ করতে শুরু করল, তারা তাদের আচরণ দ্বারা নিজেদের মা-বাবাকে প্রভাবিত করল। মা-বাবা হয়তো রাস্তায় বেরিয়ে ঠোঙাটা কোথাও ফেলতে নিয়েছেন, সঙ্গে থাকা শিশুটি সাথে সাথে বলে উঠছে, 'এখানে ফেলবে না! স্কুলের শিক্ষক বলেছে, রাস্তায় থুতু ফেলতে হয় না। কোনো জিনিসের ঠোঙা পথের ধারে না, নির্দিষ্ট ঝুড়িতে ফেলতে হবে।'

আমাদের কোনোকিছুর অভাব নেই, অভাব শুধু সিস্টেমের। আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ফিরে এসেছে। এখন প্রয়োজন নৈতিক পুনর্জাগরণ, সর্বত্র শুদ্ধাচারের প্রচলন। এখন প্রয়োজন শিশু-কিশোরদের শুদ্ধাচারী হিসেবে গড়ে তোলার আয়োজন। আমাদের সন্তানরা শুদ্ধাচারী হয়ে গড়ে উঠলে তারাই সময়ের সাথে সাথে যুবক হবে এবং তাদের নৈতিক বল, নৈতিক শক্তি দেশের চেহারাটাই পাল্টে দেবে। তখন বাংলাদেশের মানুষ যে দেশেই যাবে সেখানকার মানুষ বলবে—বাংলাদেশের মানুষ ভালো মানুষ, শুদ্ধাচারী মানুষ।

সংক্ষিপ্ত : ২ সেপ্টেম্বর ২০২২, ঢাকা

সমমর্মিতাই হোক
সকল সম্পর্কের ভিত্তি

আপনাদের (তরুণদের) দিকে তাকালে মনে হয়, আমারও একসময় এরকম বয়স ছিল। হাতের তালিতে এরকম জোর ছিল। এখন তালি দিলেও তালিটা অত জোরে হয় না বা হিসাব করে দেই যে, জোরে হয়ে গেল কিনা। আপনাদের এই বয়সে তালি কখনো হিসাব করে দিতাম না। দৌড়ও কখনো হিসাব করে দিতাম না। কোথায় পা পড়ছে, খেয়াল করতাম না। এখন অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়। পা গর্তে পড়বে, না কলার খোসার মধ্যে পড়বে, পা পিছলে যাবে, না উঠে দাঁড়াতে পারব—ঐ বয়সে এই চিন্তাটা ছিল না।

আমরা আসলে একদিক থেকে খুব ভাগ্যবান। আমাদের প্রজন্ম সমমর্মিতার মাঝে, মায়া-মমতার মাঝে বড় হয়েছে, কিন্তু ৪০-এর কম যাদের বয়স, তাদের মায়া-মমতা কমতে শুরু করেছে। কেন? তারা অনেক বস্তুর মধ্যে, অনেক পণ্যের মধ্যে, অনেক খেলনার মধ্যে, অনেক খাবারের মধ্যে বড় হয়েছেন। আমাদের সময় খাবার কম ছিল, পোশাক কম ছিল, কিন্তু মমতা ছিল। আসলে মমতা ভালবাসা প্রেম সমমর্মিতা শ্রদ্ধা—শব্দ ভিন্ন সুর এক। বয়স ভেদে, সম্পর্ক ভেদে নামটা আলাদা। আমাদের মা-বাবা অনেক কিছু দিতে পারতেন না, কিন্তু মায়া দিতেন, মমতা দিতেন, স্নেহ দিতেন। আমরাও মা-বাবাকে ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম।

একটি ঘটনা—আজকে আমরা বলছি কোয়ান্টামের ৯৮ ব্যাচের একজন গ্রাজুয়েটের কথা। তার নাম আবু মহিন চৌধুরী মঈন। এই মার্চ মাসেই তার জন্ম। ৪ মার্চ ১৯৬২। আবার এই মার্চ মাসে গতকালই ভোরবেলা মহাজাগতিক সফরে তিনি যাত্রা করেছেন। আজকে সকালবেলা তার জানাজা আমরা পড়লাম ও জাবলে রাজিউনে (কোয়ান্টামমে আরোগ্যশালা সংলগ্ন কবরস্থানে) শায়িত করলাম।

২৬ বছর অর্থাৎ সিকি শতাব্দী আমরা একসাথে কাজ করেছি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মতিঝিল শাখার নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। তার ডাক নাম মঈন। অসাধারণ ভালো মানুষ, বিনয়ী মানুষ। ২০১৮ সালে কোয়ান্টামমের মারহামান হলে অনুষ্ঠিত আত্মশুদ্ধি কার্যক্রমে তিনি ছিলেন। সেখানে প্রত্যেকে কোয়ান্টামনামা লিখেছিলেন। কোয়ান্টামের সাথে তাদের পরিচয়, তাদের সম্পর্ক, সম্পৃক্ততা, কীভাবে তারা এলেন এবং তাদের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা তারা লিখেছিলেন কোয়ান্টামনামায়। মঈন চৌধুরীও লিখেছেন। গতকাল তিনি মারা যাওয়ার পর তার সেই লেখা খুঁজে বের করা হয়েছে।

লামায় যখন প্রথম ধ্যানসাফারি হয়, তখন এরকম ব্যবস্থা ছিল না। এখানে একটা টিনের ঘর ছিল। শোয়ার জন্যে কম্বলও ছিল না। কারণ এত কম্বল আনা মুশকিল। ধানের খড় বিছানো হতো, তার ওপরে চাদর এবং আলোর জন্যে হারিকেন জ্বালানো হতো। এখন হারিকেন দেখা যায় না। সব বৈদ্যুতিক বাতি। সে সময়কার স্মৃতি নিয়ে মঈন চৌধুরী লিখেছেন—'লামায় প্রথম ধ্যানসাফারিতে এলাম। মাহতাব স্যার নিজ থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিলেন। তার সাথে সাথে রাখলেন।' মাহতাব সাহেবকেও জাবলে রাজিউনে সমাহিত করা হয়।

'নতুন জায়গা, নতুন দায়িত্ব। কাজ করছি। আনন্দ আর আনন্দ। মাহতাব স্যার প্যান্টের বেল্ট ভুলে রেখে এসেছেন। এখানে এসে আর কী করবেন? ইয়া বড় রশি দিয়ে বেল্ট বানিয়েছেন। রশি যেহেতু বড়, সেটা আবার ঝুলছেও। সবার সে কি হাসাহাসি। রাতে গান হলো। মাহবুব সাহেব আয়োজন করেছিলেন।' মাহবুব সাহেবও মতিঝিল শাখার সদস্য ছিলেন। তাকেও সমাহিত করা হয় এই জাবলে রাজিউনে।

জাবলে রাজিউন সবাই চেনেন তো? আমাদের আরোগ্যশালার পাশে অবস্থিত। যেখানে অনেক বড় বড় মানুষ শুয়ে আছেন। যেখানে শেষ নিদ্রার জন্যে সবাই যায় এবং যারা গিয়েছেন তারা খুব ভাগ্যবান।

তিনি আরো লিখেছেন, 'আসলে কোয়ান্টামম প্রথম থেকেই অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে। ভালবাসায় সিক্ত এই তীর্থভূমি প্রতিবছর বার বার শুধু টানে। তাই তো ছুটে আসি।' প্রত্যেক বছরই একবার করে হলেও তিনি এসেছেন এখানে। তার লেখার শেষ লাইনটা হচ্ছে—'আল্লাহ যেন এখানেই শান্তিতে ঘুমাতে দেন, পারিবারিকভাবে বলা আছে।'

তার পরিবারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সবার প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাই।

একজন মানুষ এখানে কেন বার বার ছুটে আসে? কোন জিনিস তাকে টানে? মায়া-মমতা। এই মায়া-মমতারই পোশাকি নাম সমমর্মিতা। মায়া-মমতা শব্দটা এসেছে মা থেকে। সেটা কী রকম? মঙ্গন চৌধুরীর ঘটনা। তখন তিনি ছাত্র। তার ভাষায় বলি—

'ঢাকাতে পড়াশোনা করি। প্রতিমাসেই গ্রামের বাড়িতে যাই। একবার ঠিক দুপুরের দিকে বাড়িতে গিয়ে হাজির। মা বললেন, গোসল করে ভাত খাও। মা ইতোমধ্যেই গোসল করে নিয়েছেন। আমি খাচ্ছি। মা পাশে বসা। আমি বললাম, মা, তুমিও খেয়ে নাও। মা বললেন, পরে খাব।

একপর্যায়ে মা একটু বাইরে গেলেন। হঠাৎ কী মনে করে পাশে রাখা ভাতের পাতিলের ঢাকনাটা খুললাম। একটুকুও ভাত নেই!'

আগেকার দিনে গ্রামের বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না, ডাইনিং টেবিল ছিল না। মেহমান এলে আলাদা ব্যাপার, না হলে সাধারণত বাড়িতে পাতিল থেকেই মা খাবার তুলে দিতেন।

'মা কী খাবেন—মনে প্রশ্ন জাগল। তাড়াতাড়ি ঢাকনা বন্ধ করে চুপচাপ খেয়ে উঠে গেলাম। মা সেদিন না খেয়েই ছিলেন। নিজের খাবারটুকু আমাকে দিয়ে তিনি উপোস ছিলেন। নতুন করে আর রান্না করে খান নি। আজ মা নেই। মা চলে গেছেন। এখন আমি এই ঘটনা লিখছি এবং কাঁদছি!'

আসলে আমি যখন তরুণ-তরুণীদের মুখের দিকে তাকাই, তখন খুব মায়া লাগে। তারা সবকিছু পায় চাওয়ার আগে। কম্পিউটার পাচ্ছে চাওয়ার আগে, পোশাক পাচ্ছে চাওয়ার আগে, কেক পাচ্ছে, পিৎজা পাচ্ছে, ফুডপান্ডা থেকে খাবার পাচ্ছে, কিন্তু কী পাচ্ছে না? মায়া-মমতা। মা যদি কর্মজীবী হন, তখন মা-ও ব্যস্ত, বাবাও ব্যস্ত। অনেক সময় মায়ের সে সময় তারা পায় না।

মায়া-মমতাই মানুষকে মানুষ করে তোলে। সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে এই মায়া-মমতা। যে সম্পর্কের মধ্যে মমতা নাই সেটা আসলে কোনো সম্পর্ক নয়। সম্পর্ক তৈরি করতে হলে ভালবাসতে হবে, মায়া থাকতে হবে, হৃদয়ের টান থাকতে হবে। কার প্রতি আমাদের আকর্ষণ থাকে? যাকে ভালো লাগে। সে বন্ধু হতে পারে, চাচা হতে পারে, মামা হতে পারে, খালা হতে পারে, ফুফু হতে পারে, অপরিচিতও হতে পারে। যাকে দেখলে ভালো লাগে, যার কথা শুনলে ভালো লাগে, যার আচরণ ভালো লাগে, ব্যবহার ভালো লাগে, যার মধ্যে কিছু গুণ আছে। যার সম্পর্কে মনে ভালো চিন্তা আসে তাকে আমাদের ভালো লাগে। আর যার সম্পর্কে মনে খারাপ চিন্তা আসে, তাকে কি ভালো লাগে? তাকে ভালো লাগে না।

তাহলে ভালো লাগতে হলে কী করতে হবে? তার সম্পর্কে ভালো ভাবতে হবে। এই ভালো ভাবা থেকে মায়া-মমতা সৃষ্টি হয়। একজন মানুষের মনে মায়া-মমতা যখন থাকে, তখন সে ভালো ব্যবহার করে। যার মনে মায়া নেই, সে কখনো ভালো ব্যবহার করতে পারে না।

আমাদের কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ছিলেন শিশুবন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। খুব ভালো মানুষ ছিলেন। বাচ্চাদের খুব ভালবাসতেন। তার পেশাজীবনের প্রথম দিককার একটি ঘটনা। তিনি মাত্র এমবিবিএস পাশ করে নিজের এলাকা সাতক্ষীরা শহরে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। একদিন আট মাইল দূরে সাইকেল চালিয়ে এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তখনকার দিনে মোটরসাইকেল সহজলভ্য ছিল না। দীর্ঘসময় রোগীর পাশে তাকে থাকতে হলো। ফেরার সময় রোগী দুই টাকা ফি দিতে চাইল। যদিও তার কম্পাউন্ডার আগেই আট টাকায় রফা করেছিল যে, ডাক্তার সাহেব এলে আট টাকা দিতে হবে। কম্পাউন্ডার পুরো টাকাটা আদায়ের চেষ্টা শুরু করল। ডা. এম আর খান স্যার তাকে নিবৃত্ত করলেন। বললেন, 'ওরা গরিব মানুষ। তুমি বরং ওদের দুই টাকাও ফিরিয়ে দাও।' এই মায়া-মমতা ছিল বলেই তিনি এত বড় ডাক্তার হয়েছিলেন, লক্ষ মানুষের ভালবাসা পেয়েছিলেন।

এই যে অন্যের অভাবটাকে বোঝা, অন্যের সমস্যাটাকে বোঝা, এটাই হচ্ছে অন্যের প্রতি মমতা-ভালবাসা। অর্থাৎ যখন অন্যের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হবে, তখন আপনি অন্যকে বুঝতে পারবেন। যারা বড় হয়েছেন, ভালবাসার এই গুণটা সবসময় তাদের মধ্যে ছিল। তারা অন্যের সম্পর্কে ভালো ভাবতেন, ভালো আচরণ করতেন। সেটা ঘরে-বাইরে সব জায়গাতেই।

এই কালের একজন অনন্য মানুষ—ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত এপিজে আবদুল কালাম। তার জীবনের একটি ঘটনা। তিনি তখন ছোট। একদিন তার মা রুটি ভাজতে গিয়ে কিছু রুটি পুড়ে ফেলেন। রাতের বেলা খেতে বসেছে বাড়ির সবাই। মা ভালো রুটিগুলো ছেলেমেয়েদের আর পোড়া রুটি দিলেন আবদুল কালামের বাবাকে, মানে তার স্বামীকে। আবদুল কালাম লিখেছেন, বাবা যখন সেই পোড়া রুটি খাচ্ছেন, তখন মা রুটি পুড়ে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। বাবা হেসে বললেন, আমি তো পোড়া রুটি খেতে পছন্দ করি এবং তিনি খুব আনন্দ নিয়ে খেলেন।

আবদুল কালাম তখন কিশোর। তার বয়স ১২-১৩ হবে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, তুমি যে বললে, তুমি পোড়া রুটি পছন্দ করো। সত্যি সত্যি কি তুমি পোড়া রুটি খেতে পছন্দ করো?

বাবা উত্তর দিলেন, তোমার মা সারাদিন কত কষ্ট করে রান্না করেন! রুটিটা তো ইচ্ছে করে পুড়িয়ে ফেলেন নি। পোড়া রুটি মানুষকে কষ্ট দেয় না, কিন্তু রূঢ় কথা, কটু কথা, খারাপ কথা, দুর্ব্যবহার কষ্ট দেয়।

পোড়া রুটি মানুষ খেয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু রূঢ় কথা কি হজম হয়? রূঢ় কথা হজম হয় না। চিন্তা করেন! একজন মানুষ রাতের বেলা খেতে বসেছেন। স্বাভাবিকভাবে ক্ষুধার্ত। পোড়া রুটিও তিনি হাসিমুখে খেয়ে উঠতে পারলেন। কেন? তার মধ্যে মায়া ছিল, মমতা ছিল, টান ছিল। আবদুল কালাম রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরও বাবার এই ঘটনাটাকে মনে রেখেছেন যে, তার মাকে বাবা কষ্ট দেন নি। আসলে এই সমমর্মিতা মানুষকে মহান করে। আর রূঢ়তা মানুষকে কষ্ট দেয়, মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে।

আপনার মধ্যে ভালবাসা সমমর্মিতা আছে কিনা বুঝবেন কীভাবে?

পবিত্র বাইবেলে খুব সুন্দর একটা বাণী আছে। বাইবেলে বলা হয়েছে—'ভালবাসা সবসময় ধৈর্য ধরে। কখনো ঈর্ষা করে না, গর্ব করে না, অহংকার করে না, দুর্ব্যবহার করে না, সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে না, রাগ করে না, খোঁটা দেয়ার জন্যে ভুলের তালিকা তৈরি করে না। ভালবাসা অধার্মিকতায় আনন্দ পায় না, সত্যে আনন্দিত হয়। ভালবাসা সহ্য করে, বিশ্বাস করে, প্রত্যাশা রাখে এবং সব অবস্থায় স্থির থাকে।' *[১ করিন্থীয় ১৩:৪-৭]*

অর্থাৎ যাকে আপনি ভালবাসেন, যার প্রতি আপনার মায়া আছে, মমতা আছে, যদি তার কথায়, আচরণে ধৈর্য ধরতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে তার প্রতি আপনার ভালবাসা আছে। যাকে ভালবাসবেন, সে অনেক বড় হতে পারে কিন্তু তার ব্যাপারে আপনার কখনো ঈর্ষা হবে না। ভালবাসা কী করে না? ঈর্ষা করে না, গর্ব করে না, অহংকার করে না, দুর্ব্যবহার করে না। অনেক সময় আমরা সুযোগ নিই। ভালবাসা এই সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে না, রাগ করে না, খোঁটা দেয়ার জন্যে ভুলের তালিকা তৈরি করে না।

অনেক স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া হলে যাতে খোঁটা দিতে পারে সেজন্যে তিক্ত ঘটনাগুলো তালিকা করে মুখস্ত রাখে। অন্যদিকে যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসে, যে মা সন্তানকে ভালবাসে, যে সন্তান বাবাকে ভালবাসে, যে ছাত্র শিক্ষককে ভালবাসে, যে শিক্ষক ছাত্রকে ভালবাসে সে কখনো ভুলের তালিকা তৈরি করে রাখে না। বরং ভুলটাকে ক্ষমা করে দেয়।

ভালবাসার ব্যাপারে বাইবেলের এই শিক্ষার চেয়ে সুন্দর কথা আর কী হতে পারে? পৃথিবীতে যত ধর্ম এসেছে, যত মহামানব এসেছেন, নবী-রসুল এসেছেন, মুনি-ঋষি এসেছেন, তারা সবসময় ভালবাসার কথা বলেছেন,

মমতার কথা বলেছেন, ক্ষমার কথা বলেছেন।

নবীজী (স) খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, 'দয়া, ভালবাসা ও সমমর্মিতার বন্ধনে বিশ্বাসীরা আবদ্ধ। তাদের অবস্থা একটি দেহের মতো। দেহের একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়লে পুরো দেহই সেই ব্যথা অনুভব করে।' *[নোমান ইবনে বশীর (রা); বোখারী, মুসলিম]*

আমরা যারা কোয়ান্টামমে রয়েছি, কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে রয়েছি, যে যে-ই ক্যাম্পাসেই থাকি না কেন—হিকমানে থাকি, ফিকরানে থাকি, ইকরানে থাকি, আমরা হচ্ছি একটা দেহের মতো। কারো হাতে ব্যথা লাগলে পুরো শরীর ব্যথা অনুভব করে, না করে না? না বলে, দূর! হাতে ব্যথা হয়েছে, হাত থাকুক হাতের জায়গায়, আমি আনন্দ করি। আনন্দ করা যায় তখন? করা যায় না। সে-রকম আমাদের কোনো এক ভাই, কোনো বোন, মা-বাবা অসুস্থ হলে সেই ব্যথাটা আমরা যখন সবাই অনুভব করতে পারব, তখন বুঝব যে, আমাদের মধ্যে মায়া-মমতা, সমমর্মিতা সৃষ্টি হয়েছে।

নবীজী (স) আরো বলেছেন, 'সকল বিশ্বাসী পরস্পরের ভাই। একজন বিশ্বাসী অপর বিশ্বাসীর ওপর জুলুম করতে পারে না, পারে না তাকে বিপদাপন্ন অবস্থায় অসহায়ভাবে ছেড়ে যেতে।' তাই নবীজী (স) পরামর্শ দিয়েছেন, 'কখনো অন্যকে হেয় মনে করবে না, কখনো অন্যের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হবে না, কখনো অন্যের প্রতি ক্ষোভ পুষে রাখবে না, কখনো পারস্পরিক বন্ধন ছিন্ন করবে না, কখনো পারস্পরিক রেষারেষি বা শত্রুতাকে উসকে দেবে না।' *[আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম, তিরমিজী]*

তাহলে কী করতে হবে? আমরা কখনো অন্যকে ছোট মনে করব না। সবাইকে সমান মনে করব। কখনো অন্যের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হবো না। অমুকে আজকে সুন্দর একটা পোশাক পরায় তাকে খুব সুন্দর লাগছে, আমাকে তো অত সুন্দর লাগছে না! এটা হচ্ছে ঈর্ষা।

কখনো অন্যের প্রতি ক্ষোভ পুষে রাখব না। এক সহপাঠী একটু খোঁচা দিয়েছে। সেজন্যে খুব রাগ হচ্ছে। এই রাগটাকে ধরে রাখব না। ক্ষমা করে দেবো। কখনো পারস্পরিক রেষারেষি বা শত্রুতাকে উসকে দেবো না যে, ঠিক আছে, লাগিয়ে দিলাম দুজনের মধ্যে। তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের সমমর্মিতার অভাব হয়েছে। পরস্পরের প্রতি যত আমরা সমমর্মী হবো, আমাদের সম্পর্ক তত সুন্দর হবে, তত ভালো হবে।

আজকে মঈন চৌধুরীকে জাবলে রাজিউনে শেষবারের মতো শুইয়ে দেয়ার জন্যে সেই ঢাকা থেকে ৫০-৬০ জন কোয়ান্টামমে চলে এসেছেন।

কেন? এটাই হচ্ছে সমমর্মিতা—আমরা আত্মার আত্মীয়। আমরা যারা একসাথে সঙ্ঘে আছি, আমরা সহযাত্রী। সহযাত্রীরাও আত্মার আত্মীয়। একজন আরেকজনের সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে আপনজন। একজনের দুঃখে আরেকজন দুঃখী হবে। একজনের আনন্দে আরেকজন আনন্দিত হবে। বন্ধুর আনন্দ কার আনন্দ? আমার আনন্দ। ভাইয়ের আনন্দ কার আনন্দ? আমার আনন্দ। বোনের আনন্দ কার আনন্দ? আমার আনন্দ।

ভালো হওয়া সম্ভব, না সম্ভব না? ভালো হওয়া, ভালো বলা, ভালো করা সম্ভব। এই যে পরস্পরের প্রতি সমমর্মিতা, ভালবাসা, টান, মায়া-মমতা—এটাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ। তাই আমরা কারো সাথে রূঢ় ব্যবহার করব না। সবসময় সবার সাথে ভালো আচরণ করব, ভালো কথা বলব।

১১ মার্চ ২০২২, কোয়ান্টামম

সাফল্যের বীজ ॥
আন্তরিক প্রয়াস ও সবর

আজকের প্রসঙ্গটা খুব পরিচিত এবং আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাফল্যের বীজ আন্তরিক প্রয়াস ও সবর। ‘সাফল্য’ শব্দটা অপছন্দ করেন অথবা সফল হতে চান না, আমি এই পর্যন্ত এমন কাউকে খুঁজে পাই নি। শব্দটা আমাদের সবারই প্রিয়।

সাফল্য কী? সাফল্য হচ্ছে নিজের চাওয়াকে, নিজের ভাবনাকে পাওয়ায় পরিণত করা। আমি যা ভাবব সেটা করার সামর্থ্য আমার আছে। অর্থাৎ সাফল্য মানে আত্মক্ষমতায়ন, যেখানে আমি এমন শক্তি বা ক্ষমতা অর্জন করব, যা আমার ভাবনাকে পাওয়ায় পরিণত করবে। এই সামর্থ্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজন আন্তরিক প্রয়াস, মেহনত করার আগ্রহ।

সাফল্যের একটি সূত্র—মনছবি সম্পর্কে আমরা বলেছি। মনছবি, লক্ষ্য বা ভাবনা যদি কর্ম সৃষ্টি না করে, তবে তা অলীক কল্পনা। যেখানে কর্মের কোনো প্রয়োজন হয় না সেটা মেটাভার্সের জগৎ বা অলীক জগৎ।

সাফল্যের আরেকটি সূত্র হচ্ছে সবর। সবর মানে অপেক্ষা। ইয়েস, আই ক্যান ওয়েট। কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্য অর্জিত না হয়। *জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন* বইয়ের একটা অটোসাজেশন হলো—‘আমি হাসিমুখে ক্ষুধার কষ্ট সইতে পারি, পারি নীরবে চিন্তা করতে, পারি অপেক্ষা করতে ... ।’ এই অপেক্ষা করতে পারার নামই হচ্ছে সবর।

সবর কোন পর্যায়ের হওয়া উচিত? গালিবের একটা শায়ের আছে—‘মারনে কে বাদ ভি মেরা আঁখে খুলি রাহি, আদত জো পাড় গায়ি থি তেরে ইনতেজার কি।’ মৃত্যুর পরেও আমার চোখ খোলাই রয়ে গেল। কেন?

অপেক্ষা করাটা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সে অপেক্ষা করছে, প্রিয় কখন আসবে? গালিব সেই কবে মারা গেছেন, আর আমরা আজকে কোথায় দাঁড়িয়ে তার কবিতা স্মরণ করছি! অমরত্ব তো এটাই!

তাহলে সবর কী? অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে নিরলস পরিশ্রমের নাম হচ্ছে সবর। পরিশ্রমে ক্লান্তি থাকতে পারবে না, বয়স আপনার যা-ই হোক। যে-কোনো বয়সে পরিশ্রম করা যায়, যদি আপনি চান।

আমরা অনেক সময় মনে করি যে, এমনি এমনি হয়ে গেল। এমনি এমনি হয় না। আমরা সবাই সেলিব্রেটি হয়ে যেতে চাই, সাফল্য চাই, শুধু মেহনত করতে চাই না। ভাবি, আলাদিনের চেরাগের মতো সাফল্য চলে আসবে। যার জীবনে সাফল্য এসেছে তার জীবনে পরিশ্রম রয়েছে, মেহনত রয়েছে। তারা নিজের কাজের মাঝে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। কাজের ব্যাপারে তারা কোনো প্রশ্ন তোলেন না যে, আজকে আমার ছুটির দিন না!

আবার সেলিব্রেটি হয়ে যাওয়ার পরে অধিকাংশই সেলিব্রেটি থাকতে পারেন না কেন? কারণ তিনি আর মেহনত করতে চান না। তিনি শুধু তালিয়া চান, তিনি শুধু তেল চান।

আমরা লতা মঙ্গেশকরের কথা বলি। ১০ বছর আগের ঘটনা। লতাজীর বয়স তখন ৮২ বছর। একটা হিন্দি সিনেমায় গানের জন্যে তিনি চুক্তিবদ্ধ হলেন। গানের রেকর্ডিং হওয়ার কথা ছিল ১৫ নভেম্বর। সিনেমার যিনি পরিচালক তার ভাষায় বলছি—

'লতাজী নিজেই জানালেন তিনি ৯-১০ নভেম্বর নাগাদ চেন্নাইতে রহমানের স্টুডিওতে চলে আসবেন। আমরা সবাই ভেবেছিলাম, অন্য কোনো প্রয়োজনে আগে চলে আসছেন। পরে জানলাম, লতাজী শুধু আগে মহড়া দিয়ে নিখুঁতভাবে গানটা গাইবেন বলেই আগে চলে এসেছেন।'

পরিচালক বলছেন, 'এত বড় একজন মানুষ, এখনো এমন করতে পারেন, আমাদের কল্পনাতেও আসে নি। অবশ্য তখনো জানতাম না, লতাজী এর চেয়েও বেশি অবাক করে দেবেন আমাদের!'

তিনি বলছেন, 'সেদিন ছিল গানের রেকর্ডিং, ঠিক সময় লতাজী পৌঁছে গেলেন স্টুডিওতে। তারপর টানা আট ঘণ্টা মাইকের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে।' একটা গান বড়জোর কত সময় হয়? তিন মিনিট, চার মিনিট? কিন্তু তিনি টানা আট ঘণ্টা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে!

'আমরা চেয়ার রেখেছিলাম পাশে। বসেন নি। আট ঘণ্টা ধরে ওভাবেই পুরো গান রেকর্ডিং করেছিলেন অত বড় একজন শিল্পী। আমরা হা করে

দেখছিলাম সবটা। শিখেছিলাম ওনার কাছ থেকে।' ৮২ বছর বয়সে আট ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রেকর্ডিং করা, তা-ও চার-পাঁচ মিনিটের গান। কত বার রেকর্ড করেছেন? যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তৃপ্ত না হয়েছেন, তিনি মাইক ছাড়েন নি। অর্থাৎ মেহনত ছাড়েন নি, পরিশ্রম ছাড়েন নি একটা সংগীতের জন্যে। স্বাভাবিকভাবে এটি সুপারহিট সংগীত ছিল।

আমরা সুপারহিট হতে চাই, কিন্তু এর পেছনে যে মেহনত, সেই মেহনত করতে চাই না। কাজকে যখন আপনি ভালবাসতে পারবেন তখন আপনি আপনার সবচেয়ে ভালোটা দিতে পারবেন। সর্বোচ্চটা যখন দেবেন, সে কাজটা আপনাকে অমর করে রাখবে। আপনি ইতিহাস হয়ে যাবেন। একটা গানের জন্যে ৮২ বছর বয়সে এত পরিশ্রম যিনি করতে পারেন তার গান শ্রোতাকে আবেগে আপ্লুত করবেই। তার গান হিট হবেই। শুধু গান নয়, যে কাজই করেন—নাচেন, নাচের মধ্যে হারিয়ে যান। আপনি একইরকম অমর হবেন। মেঝে ঘষেন, ঘষার মাঝে হারিয়ে যান। অমর হয়ে যাবেন আপনি।

রোমানরা যখন সিসিলি দ্বীপের সিরাকিউজ নগরী আক্রমণ করল, সেনাপতির নির্দেশ ছিল—আর্কিমিডিসকে যেখানে পাও বন্দি করে নিয়ে আসো। আর্কিমিডিস তখন তার ঘরের আঙ্গিনায় মেঝেতে অংক কষছিলেন। অংকে এত নিমগ্ন ছিলেন যে, রোমান সৈন্যরা যখন তার বাড়িতে গিয়ে তাকে ধরল, তখন তিনি বললেন, আমাকে বিরক্ত করছ কেন? বিজয়ী সৈনিক ভাবছে, বিরক্ত করছি? তোমাকে আমি! অর্থাৎ তিনি এতই নিমগ্ন ছিলেন—লোকটা যে শত্রু সেটাই বুঝতে পারেন নি। মেঝেতে আঁকিবুকি করেছেন, সৈন্যরা ওটা মুছে দিতে গেল পা দিয়ে। আর্কিমিডিসের শেষ বাক্যটি ছিল—Kill me but don’t kill my figures!

তাকে মেরে ফেলা হলো। তার মৃত্যু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার এই একটি বাক্য দুই হাজার বছর ধরে অমর।

কাজকে ভালবাসা, কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়া এবং নিজের সর্বোত্তমটুকু দেয়ার নামই আন্তরিক প্রয়াস। এটাই সবর সৃষ্টি করে এবং এটাই মানুষকে সফল করে।

কোয়ান্টামের কথা এখন মানুষ শুনতে চায় কেন? কারণ কোয়ান্টাম যা বিশ্বাস করে, যা ভাবে, সেই ভাবনা অনুসারে কাজ করে। আমরা রক্তদান কার্যক্রম শুরু করেছিলাম ২০ বছর আগে। কোয়ান্টাম ল্যাব প্রতিষ্ঠা করলাম ২০০০ সালে। এর আগে আমাদের দেশে দুটো রক্তদান কার্যক্রম প্রতিষ্ঠান অনেক সামর্থ্য, অনেক অর্থবিত্ত, জনবল থাকা সত্ত্বেও টিকে থাকতে পারে নি।

আমরা যখন এ কাজে হাত দিলাম, আমাদেরকে বলা হলো যে, এটা চলবে না। প্রথম বছর রক্ত সংগ্রহ করে ৮০ শতাংশই ফেলে দিতে হয়েছে। কোনো হাসপাতাল রক্ত নেয় নি। দ্বিতীয় বছর, তৃতীয় বছর ভর্তুকি দিয়ে আমরা চলেছি। কারণ আমরা বিশ্বাস করেছি যে, একটু সময় লাগবে কিন্তু এটা সফল হবে। আমাদের মধ্যে কোনো নেতিবাচকতা আসে নি।

আজকে কী হয়েছে? গত বছর স্বাধীনতার ৫০ তম বার্ষিকীতে নারীসহ ৫০ জন রক্তদাতা ৫০ বার রক্তদান সম্পন্ন করেন, যা বাংলাদেশে এই প্রথম! আজকে ডাক্তারদের প্রথম পছন্দ কোয়ান্টাম ল্যাব। তারা আজ রক্তের জন্যে প্রেসক্রাইব করে দেন কোয়ান্টাম ল্যাব-এর নাম। যেখানে ২০ বছর আগে ডাক্তাররা রক্ত গ্রহণ করতে চাইতেন না। কীভাবে সম্ভব হয়েছে? সবর, অপেক্ষা। আমরা তাড়াহুড়া করি নি। অপেক্ষায় আমাদের ক্লান্তি ছিল না।

কোয়ান্টামম লামার কথা ধরুন। ১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল। বহুবার এমন হয়েছে যে, আমি একা রাতে ভ্রমণ করে লামা গিয়েছি। আমিরাবাদ নামতাম। আমার অবশ্য একা হাঁটতে খুব ভালো লাগে সবসময়। আমি মাইলের পর মাইল একা হেঁটে চলে যেতে পারি। আমার সাথে মাঝে মাঝে যারা লামা যেতেন তারা আমাকে ভালবেসে ওখানে যেতেন। তাদেরও তো নানানরকম ব্যস্ততা থাকে। তাই তাদেরকেও সবসময় নিয়ে যাওয়া যেত না বা নিতাম না। অনেকে বলতেন যে, ওখানে কেউ যাবে না। এমনকি আমাদের কোনো কোনো সহকর্মীও থাকতে চাইতেন না। একজনের ভাষাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। সে যখন বুঝতে পারল যে, ওখানে তাকে রেখে আসার সম্ভাবনা আছে তখন বললেন, 'গুরুজী! ডার্ক কন্টিনেন্ট অব আফ্রিকাতে আমাকে একা ফেলে রেখে যাবেন না!' সে-সময় কাউকে যখন লামাতে ট্রান্সফার করা হতো, সে মনে করত এটা তার শাস্তি। আর আজকে লামা থেকে কাউকে ট্রান্সফার করা হলে সে মনে করে যে, এটা তার জন্যে শাস্তি!

কেয়াজুপাড়া থেকে রাস্তা ছিল না। আমাদের এক সহকর্মীর সাথে প্রথম যেই সরকারি কর্মকর্তা ওখানে গিয়েছিলেন; তাকে বকতে বকতে গিয়েছিলেন যে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! আজকে যে-কোনো সরকারি কর্মকর্তা ঐ এলাকায় গেলে মনে করেন যে, যদি কোয়ান্টামম দেখে না যাই, তাহলে পাহাড়ে আসাটাই অসম্পূর্ণ হলো। আজকে তারা নিজেরা যোগাযোগ করে চলে আসেন। এমনটা হবে, একথা আমরা ২০ বছর আগে বলেছিলাম। হেলিপ্যাড কোথায় হবে সেটাও আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম। এখন সেখানে চাইলে হেলিকপ্টার নামতে পারে।

নিরলস পরিশ্রম কখন সম্ভব? সবর করতে পারা কখন সম্ভব? ভাবনাটা যখন পুরোপুরি ইতিবাচক হবে। ওখানে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই। যখন আপনার আস্থা থাকবে শতভাগ, আপনার ভাবনাটা অন্য কিছু দিয়ে দূষিত বা ভেজাল হবে না। ভাবনাতে ভেজালটা কী? নেতিবাচকতা।

আপনি নক্ষত্র হবেন না উল্কাপিণ্ডের মতো ছাই হয়ে যাবেন, আপনি অমর হবেন না হারিয়ে যাবেন, এটা নির্ভর করে আপনার ভাবনার শক্তির ওপর। ভাবনা যখন ইতিবাচক হবে, দৃষ্টিভঙ্গিটা যখন পাল্টে যাবে তখন নিজের চাওয়াকে পাওয়ায় পরিণত করার সামর্থ্য সৃষ্টি হবে। আপনি আন্তরিক প্রয়াস চালাতে ও সবর করতে পারবেন অর্থাৎ অপেক্ষা করতে পারবেন। অপেক্ষা করাটা অত সহজ কাজ নয়। অপেক্ষার জন্যে প্রয়োজন আস্থা এবং বিশ্বাস। এটা তখনই সৃষ্টি হবে যখন আপনার ভাবনাটা পুরোপুরি ইতিবাচক হবে। তখন সাফল্যের বীজ শুধু না, সাফল্যের মহীরুহ হয়ে যাবেন আপনি।

আসলে আল্লাহ সবসময় চান মানুষ ধীরস্থিরভাবে কাজ করুক আর শয়তান চায় সে যেন তাড়াহুড়া ও হুলস্থূল করে। এজন্যে সবসময় সতর্ক থাকবেন। তাড়াহুড়া ও হুলস্থূল করতে গিয়ে শয়তানের ফাঁদে পড়ে যাবেন না। শয়তানের ফাঁদে পড়ে গেলে ভাবনাটা ভেজাল হয়ে যাবে। আপনি অপেক্ষা করার ক্ষমতা হারাবেন। স্রষ্টা সবসময় সবরকারীর সাথে থাকেন। অর্থাৎ যিনি অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে ধৈর্যের সাথে নিরলস পরিশ্রম করতে পারে স্রষ্টা তার সাথে থাকেন। তিনি জীবনে জয়ী এবং সফল হন।

২৮ জানুয়ারি ২০২২, ঢাকা

৩—

ভালো কাজ ক্ষুদ্র হলেও নিয়মিত করুন

আজকের বিষয় হচ্ছে—'ভালো কাজ ক্ষুদ্র হলেও নিয়মিত করুন' আর রসুলের (স) শিক্ষা হচ্ছে—কোনো ভালো কাজকে তুমি ছোট বা তুচ্ছ মনে করবে না। কাউকে একটা সুতো বা জুতার একটা ফিতা দিয়ে সাহায্য করে হোক, পানির পাত্র থেকে অন্যকে একগ্লাস পানি খাইয়ে হোক, মানুষের চলার পথ থেকে একটা কাঁটা, ইটের টুকরা বা যে-কোনো ছোট্ট বাধা অপসারণ করে হোক, হাসিমুখে ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা বা কাউকে সালাম দিয়ে হোক, একটি খেজুরের চার ভাগের একভাগ আরেকজনকে দিয়ে হোক, তুমি ভালো কাজ করো। অর্থাৎ কোনো ভালো কাজই তুচ্ছ নয়।

রসুলুল্লাহ (স) বলেন, 'সামর্থ্য অনুসারে ইবাদত ও ভালো কাজ করা ওয়াজিব। আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় উত্তম কাজ বা আমল হচ্ছে—যা আমলকারী নিয়মিত করে।' *[আয়েশা (রা); বোখারী, মুসলিম]*

আমল মানে হচ্ছে ভালো কাজ। কাজটা নিজের কল্যাণে হতে পারে, অন্যের কল্যাণে হতে পারে। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, নিজের কল্যাণে বোধহয় ভালো কাজ হয় না। নিজের কল্যাণেও ভালো কাজ হয়। যে-রকম একটা অন্যায় করা থেকে বিরত থাকলেন, একটা কুখাদ্য খাওয়া থেকে নিজেকে সংবরণ করলেন। এতে নিজের কল্যাণ হলো, উপকার হলো।

আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় কাজ হলো, যে ভালো কাজ নিয়মিত করা হয়। একদিন করলেন, দুদিন করলেন—নজরে পড়ে না। মনে করে, কাজটা খেয়ালবশত করেছে। কিন্তু যখন আপনি নিয়মিত করবেন, তখন সেটা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় কাজ হয়ে যায়। নিয়মিত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সমস্যা হলো আমরা বড় কাজ করতে চাই। ভাবি, কল্পনা করি, কিন্তু এর জন্যে যে ছোট পদক্ষেপটা নেয়া দরকার সেটা নিই না। বড় কাজ বড় ভাবে হয় না, বড় কাজকে সবসময় ছোট ছোট অংশে ভাগ করে করতে হয়। একটার পর একটা। একটা বিল্ডিং বানাতে চাচ্ছেন, আপনি সব ইট একসাথে গাঁথতে পারবেন না। একটা ইট গেঁথে তার ওপরে আরেকটা গাঁথতে হবে। আবার একটু বিরতি দিয়ে আরেকটা। ধাপে ধাপে ওঠাতে হবে, কিন্তু নিয়মিত করতে হবে। যত বড় ভবন হোক, শুরু করতে হয় ইটের পর ইট রেখে। আপনি কোথাও যেতে চান, আপনাকে শুরু করতে হবে প্রথম পা ফেলার মধ্য দিয়ে। এরপর যখন একটার পর একটা পা ফেলবেন, আপনি এগিয়ে যাবেন মাইলের পর মাইল। তাই যাত্রা শুরু করতে হয় ছোট ছোট পা ফেলে।

আমাদের অসুবিধাটা কোথায়? আমরা কাজ জমিয়ে রাখি। আমরা নিয়মিত করি না। শুধু মেধা দিয়ে উজ্জ্বল হওয়া যায় না। উজ্জ্বল হওয়ার জন্যে খুব আস্তে আস্তে ঘষতে হয়। যে-রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। যারা প্রতিদিন ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন তারা পরিচ্ছন্ন থাকতে পারেন, কিন্তু যারা ভাবেন ছুটির দিনে সবকিছু একসাথে করব—তাদের পরিষ্কার করাও হয় না, মাঝখান থেকে ছুটির দিনটারও ১২টা বাজে। দিনটা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের কাজ জমিয়ে না রেখে প্রতিদিন যদি করতে পারেন, আপনি স্বস্তিতে থাকবেন। বিপদের সময়ও আরামে থাকতে পারবেন।

এ নিয়ে একটা গল্প আছে—এক গৃহস্থ তার বাড়ির জন্যে কামলা খুঁজছেন। হাটে গিয়েছেন। কাউকে পছন্দ হচ্ছে না। অবশেষে মাঝবয়সী একজনকে পাওয়া গেল। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার খামারবাড়িতে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে? বলল, হাঁ, অভিজ্ঞতা আছে। গৃহস্থ বলল, কেমন অভিজ্ঞতা? লোকটি বলল, আমি প্রচণ্ড ঝড়ের মাঝেও আরামে ঘুমাতে পারি। গৃহস্থ বিস্মিত হলেন। তার কাছে কথাটা অদ্ভুত মনে হলো। এরকম কথা তো আগে কেউ বলে নি। ঝড় এলে ঘুমাবে—একথা তার পছন্দ হয় নি, কিন্তু গৃহস্থ তাকেই ঘরে নিয়ে এলেন এবং কাজ বুঝিয়ে দিলেন। লোকটি সবকিছু খুব সুন্দরভাবেই করছে এবং গৃহস্থ তার কাজে খুব সন্তুষ্ট।

একরাতে ঝড় এলো। প্রচণ্ড ঝড়। গৃহস্থ বিছানা থেকে নেমে প্রথমে লোকটির ঘরে গেলেন। দেখেন, সে ঘুমাচ্ছে। তার কোনো বিকার নেই। গৃহস্থ ওঠার জন্যে তাড়া দিলেন যে, ওঠো ওঠো ওঠো। ঝড় এসেছে, সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটির ঘুম ভাঙল কিন্তু সে আবার কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, কর্তা! আমি আগেই বলেছি, ঝড় এলে আমি ঘুমাতে পারি।

ঝড় আমার ঘুমে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

গৃহস্থ স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত হলেন। তার মেজাজ খারাপ হলো, কিন্তু কী আর করবেন? ভাবলেন, এই লোককে আর রাখা যাবে না। একাই বের হলেন সবকিছু সামলাতে। বাইরে এসে তো অবাক! দেখেন, সব কয়টা খড়ের গাদা রশি দিয়ে চমৎকার করে বাঁধা। মুরগির খোঁয়াড়গুলো ঠিকঠাকভাবে লাগানো। গরুগুলো সব খোঁয়াড়ে ভালোভাবে বেঁধে রাখা। শস্যের চাতালও গুছিয়ে রাখা। ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যাবে এমন কোনোকিছু বাইরে নেই। তখন গৃহস্থ বুঝলেন যে, ঝড় এলেও এই লোকটি কেন ঘুমাতে পারে!

করোনাকালে আমরা কাজ করতে পেরেছিলাম কেন? কারণ করোনা মোকাবেলার জন্যে যে জিনিসটি দরকার—সাহস এবং মিনিমাম ফিজিক্যাল ফিটনেস, সেটা আমরা ৩০ বছরে ধীরে ধীরে একটু একটু করে গড়ে তুলেছিলাম। সাহস আসে কোত্থেকে? জ্ঞান থেকে। সমস্ত ভয়ের কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা, অন্ধকার অর্থাৎ আলোর অভাব। এটা নিয়েও গল্প আছে। এক লোক রাতেরবেলা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। পড়ার সময় গাছের একটা গুঁড়ি ধরে ফেলল। গুঁড়ি ধরে ঝুলে আছে, কিন্তু উঠতে আর পারছে না। গভীর রাত। সে প্রতিনিয়ত ভাবছে যে, হাত ছুটে গেলেই আমি পড়ে যাব। মৃতপ্রায় অবস্থা। আস্তে আস্তে ভোর হলো। সূর্যের আলোয় যখন অন্ধকার কেটে গেল, লোকটি দেখল যে, যেখানে সে ঝুলে আছে তার একহাত নিচেই সমতলভূমি! যতক্ষণ অন্ধকার ছিল ততক্ষণ সে কিন্তু বুঝতে পারে নি।

ভূতের ভয় কখন থাকে? যখন অন্ধকার থাকে। আলোতে কিন্তু ভূতের ভয় থাকে না। অন্ধকারে এই মানুষটি মৃত্যুভয়ে কুঁকড়ে ছিল। যখন আলো ফুটল, সত্যটা উদ্ভাসিত হলো যে, মাটি একহাত নিচে। তার সমস্ত ভয় কেটে গেল। এটাই হচ্ছে সত্য উপলব্ধি। এটাই হচ্ছে বোধি।

ঘুম কখন ভালো হয়? যখন আপনি করণীয় কাজগুলো ঠিকভাবে করবেন, যখন আপনার মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হয়। আমাদের কোয়ান্টাম শিক্ষার্থীদের দেখেছি—আগামীকাল পরীক্ষা, আজকে ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামে এসে উপস্থিত। আমি বললাম, আগামীকাল পরীক্ষা, আজকে কেন প্রোগ্রামে? তারা বলে, আমার প্রস্তুতি শেষ! প্রোগ্রামে এলাম না—এই অস্থিরতার কারণে বরং পরীক্ষা খারাপ হবে। অতএব তারা প্রোগ্রামে ছিল এবং পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। কেন? তারা করণীয় কাজ ভালোভাবে করেছে, নিয়মিত করেছে।

নিজের বা অন্যের কল্যাণে যা করা হয়, প্রত্যেকটা কাজই আমল বা ভালো কাজ। আমল বলতে সাধারণভাবে আমরা মনে করি কিছু সূরা-কেরাত

পড়া, তসবিহ জপা। পড়াশোনা নিয়মিত করাও ভালো আমল। আপনি যখন আস্তে আস্তে করবেন, ধীরে ধীরে করবেন, যত ছোট হোক, কাজটা ইতিহাস সৃষ্টি করবে। কিন্তু করতে হবে নিয়মমতো, সময়মতো এবং নিয়মিত।

আমরা ভারতের তুলসী গৌরীর কথা অনেকেই জানি। তুলসী গৌরী ৭৭ বছর বয়সী এক আদিবাসী। ২০২০ সালে ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করেন। অনেক জ্ঞানী-গুণী মনে করেন, এই পুরস্কারটা জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। তুলসী গৌরী ছিলেন কর্ণাটক গ্রামের এতিম এক কিশোরী। দুবেলা খাবার জোগাড় করার জন্যে তিনি গ্রামের একটি নার্সারিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই গাছের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। গাছকে তিনি ভালবাসতে শুরু করলেন। একটার পর একটা গাছ তিনি লাগিয়েছেন ও আগলে রেখেছেন নিজের সন্তানের মতো করে।

আমাদের দেশে গাছ লাগানো নিয়ে বিখ্যাত গল্প আছে। একবার বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উপলক্ষে এক মন্ত্রী গাছ লাগাচ্ছেন। কোথায় গাছ লাগাবেন, তা নিয়ে অফিসারদের মধ্যে কথা চালাচালি হচ্ছে যে, এখানে না ওখানে। এর মধ্যে হেড মালি এগিয়ে এসে বললেন, স্যার! এইখানে লাগান। মালিকে জিজ্ঞেস করা হলো, এখানে লাগানোর বিশেষত্ব কী? তিনি বললেন, স্যার! তার আগে যত মন্ত্রী এসেছেন সবাই এখানেই গাছ লাগিয়েছেন! অর্থাৎ গাছ লাগানোর পরে সেই গাছটাকে কেউ আগলে রাখে নি।

যা-হোক ধীরে ধীরে সেই নার্সারিতে তুলসী গৌরী বড় হতে লাগলেন ও সেখানেই জীবনের ৬০ বছর পার করেছেন। তার লাগানো গাছের সংখ্যাটা ৩০ হাজারেরও বেশি! অর্থাৎ ৬০ বছরে ২১,৯০০ দিন। গড়ে প্রতিদিন একটি বা দুটি করে চারা রোপণ করে লাগিয়েছেন ৩০ হাজার গাছ! গাছ সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞানের জন্যে তাকে বলা হয় গাছের এনসাইক্লোপিডিয়া। আসলে পুঁথিগত জ্ঞানই শুধু জ্ঞান নয়। আমাদের মহীয়সী নারী খনার যে জ্ঞান, সেটাই পরবর্তীকালে খনার বচন হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। তুলসী গৌরী, এতিম কিশোরী ছিলেন, গাছ লাগিয়েই বিখ্যাত হয়েছেন, জ্ঞানী হয়েছেন।

একটা অবহেলিত জনপদের এক নারী গাছ লাগিয়ে যা করেছেন, জলবায়ু নিয়ে যে-সকল ডাকসাইটে বিশ্ব নেতারা সম্মেলন করেন, তারা যদি প্রতিদিন একটা করে গাছ লাগাতেন, তাহলে পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে যেত। আসলে ভালো কাজ কিন্তু একবারে করা যায় না বা একবারে করে কোনো লাভও হয় না। একটু একটু করে করতে হয়।

কোরআন শরীফ কিন্তু একবারে নাজিল হয় নি। ৬,২৩৬ আয়াত।

রসুলুল্লাহর (স) ওপর ২৩ বছর ধরে অল্প অল্প করে নিয়মিত নাজিল হয়েছে। তিনি কোরআনের জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করার জন্যে সাহাবীদের উপদেশ দিতেন। কারণ অনেক জানলে কোনো লাভ নেই, যদি সেই জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করা না যায়। হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে সেই জ্ঞান একজন মানুষকে পরিশুদ্ধ করবে, তার অন্তরে ঈমান শক্তিশালী হবে। যে কারণে উসমান ইবনে আফফান (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং যারা সেই সময় কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন, তারা একসাথে পুরো সূরা মুখস্থ করার পরিবর্তে ১০টি করে আয়াত মুখস্থ করতেন। সেটা আত্মস্থ করতেন, হৃদয়ে ধারণ করতেন এবং নিজেদের জীবনে তা অনুশীলন করতেন। তারা তো আরবি বুঝতেন। তাদের মুখস্থ করা সহজ ছিল। কিন্তু শুধু মুখস্থ করলেই আত্মস্থ হয় না, যদি অর্থ না বোঝেন, এর মর্ম না বোঝেন। অর্থ উদ্ধার করে সূরা বাকারা আত্মস্থ করতে ওমরের (রা) লেগেছিল ১২ বছর! ওমরের ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা) লেগেছিল আট বছর!

আমরা যখনই একটা কাজ আন্তরিকভাবে করব, তখন সেই কাজটি আত্মস্থ হবে, সেই কাজটি নিজের জীবনের অঙ্গ হয়ে যাবে। এজন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—কাজটি নিয়মিত করা। ধরুন, নামাজ কায়েম করার জন্যে কী প্রয়োজন? সময়মতো দিনে পাঁচ বার আদায় করা। তখন নামাজ আপনার জীবনে কায়েম হবে। অন্যায় এবং অশ্লীলতা থেকে আপনি রক্ষা পাবেন।

অন্যায় করতে গেলে, অশ্লীলতার মধ্যে জড়ালে আপনার বুক কেঁপে উঠবে। কখন? যখন আপনি অর্থ বুঝে জায়নামাজে দাঁড়াবেন তখন আপনি স্রষ্টাকে অনুভব করবেন যে, স্রষ্টা আপনাকে দেখছেন! যখনই আপনার মধ্যে এই অনুভূতি আসবে, আপনার জীবনে শৃঙ্খলা বিনয় এবং শোকারগোজারি সৃষ্টি হবে। তা না হলে দোকানে কোরআনের অডিও বাজছে যে, 'তোমরা ওজনে কারচুপি করো না।' দোকানদার ওটা শুনতে শুনতেই কম দিচ্ছে। কারণ আরবিতে কী বলা হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। আরবির সাথে এর মর্মার্থটা থাকলে অন্তত সে বুঝত। আর বুঝলে হৃদয়ে ধারণ করা সহজ হয়।

আল্লাহ তায়ালা যে বিধানই কোরআনে দিয়েছেন সেটা তাঁর নিজের কোনো কল্যাণের জন্যে নয়, যিনি পালন করবেন তার কল্যাণের জন্যে। ধর্মের মূল শিক্ষার একটি হচ্ছে সময়মতো নিয়মিত প্রতিটি কাজ ভালোভাবে করা। আর তা করতে পারলেই মানবজীবন সার্থক হবে।

১৫ এপ্রিল ২০২২, ঢাকা

ভালো পরামর্শ দিন জীবন বদলে যাবে

ভালো কাজ কী—এটা বোঝানোর জন্যে *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী*র ২৫৭ নম্বর হাদীস স্মরণ করতে পারি। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত। নবীজী (স) বলেন, 'প্রত্যেকটি ভালো কাজই সৎকর্ম, সাদাকা বা দান।' *[বোখারী, মুসলিম]*

এই যে আপনারা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, সাদাকা হয়ে গেল। কারণ আপনাদের হাসি দেখে আমি তৃপ্ত হলাম, খুশি হলাম। হাসি দেখলে খুশি হন না এমন কেউ নেই। আবার অন্যায় কী? দেখলেন কিন্তু মুখটা বেজার করে রাখলেন, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এতে আমি কিন্তু খুশি হতে পারতাম না। আপনি বলতে পারেন, আমার মুখ আমি অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখব, কার কী বলার আছে? কেউ কিছু বলবে না। এটা যে খুব বড় ভুল, বড় অন্যায়, তা-ও না। ছোট্ট ভুল, ছোট্ট অন্যায়। আপনি যদি মুখ ঘুরিয়ে নেন, আপনার প্রিয়জন কষ্ট পাবে। আপনি তাকে কষ্ট দিলেন। 'স্যরি' না বলা পর্যন্ত ভুলটা কিন্তু ভুলই থেকে যায়। প্রত্যেকটা ভালো কাজ করা আর ভুল থেকে বিরত থাকাই সৎকর্ম।

অনেকের ধারণা, আগে উপার্জন করে নিই, টাকাপয়সা মালপানি কামাই করি, তারপরে যখন বুড়ো হবো, তখন সেই টাকা দিয়ে সমাজসেবা করব। স্কুল করব, হাসপাতাল করব, এতিমখানা করব। আমরা যখন তরুণ ছিলাম, আমাদের সহপাঠীদের এরকম অনেক স্বপ্ন ছিল। কোনো কোনো সহপাঠী অর্থবিত্তে বাংলাদেশের প্রথম ১০ জনের একজন হয়েছেন। তাদের কত অর্থবিত্ত সেটা হয়তো তারা নিজেরাও হিসাব করে বলতে পারবেন না, কিন্তু

তারা এখন পর্যন্ত কোনো সেবামূলক কাজ করতে পারেন নি।

যে-কোনো ভালো কাজ সাদাকা দান সেবা, সেটা যত ছোট হোক। এমনকি কেউ আপনাকে একটা প্রশ্ন করল, আপনি যখন সুন্দরভাবে প্রশ্নের উত্তর দিলেন—এটা দান হলো, সাদাকা হলো, সেবা হলো। যখন একজন শিক্ষক ছাত্রকে সুন্দরভাবে একটা বিষয় বুঝিয়ে দেন, এটা সেবা, সাদাকা বা ভালো কাজ। একজন ছাত্র যখন তার সহপাঠীকে সেই বিষয়টা আবার বুঝিয়ে দেয়—এটাও সেবা, সাদাকা বা ভালো কাজ।

ভালো কথা বলা, ভালো উপদেশ দেয়া ভালো কাজের মধ্যে অন্যতম। যুগে যুগে বাণীবাহকেরা এই কাজটিই করেছেন। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, '... একটি ভালো কথা এমন একটি ভালো গাছের মতো, যার শিকড় রয়েছে মাটির গভীরে আর শাখাপ্রশাখার বিস্তার দিগন্তব্যাপী, যা সারাবছর ফল দিয়ে যায় প্রতিপালকের নির্দেশে।' *[সূরা ইব্রাহিম : ২৪-২৫]*

তার মানেটা কী? একটা ভালো কথা, ভালো উপদেশ, ভালো বাণী, ভালো বাক্যের প্রভাব অনেক সুদূরপ্রসারী হতে পারে, যেটা করা সহজ। টাকা থাকলে একটা স্কুল, কলেজ বা হাসপাতালের জন্যে ভবন নির্মাণ করা সহজ, কিন্তু দুর্গম এলাকায় হাজার ছাত্রের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা খুব কঠিন কাজ। আমাদের অনেক স্কুলের অবস্থা হলো—সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং আছে, কিন্তু ছাত্র নাই, শিক্ষক নাই, কখনো-বা ভালো পড়াশোনা নাই।

একটা ভালো কথা কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে?

১৯৪০ সাল। এখন থেকে ৮১ বছর আগের কথা। তখন এই উপমহাদেশ—ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ, আমরা সবাই ইংরেজদের গোলাম ছিলাম। তখনকার ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলের শিক্ষা বিভাগের একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী তার ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে গেলেন। দরিদ্র কর্মচারী। সেই সময় নিম্নপদস্থ কর্মচারী আর অফিসার—আকাশ-পাতাল তফাৎ! নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের তখন অচ্ছুৎ বিবেচনা করা হতো।

কী অনুরোধ? খুব বিনয়ের সাথে তিনি বললেন, স্যার! আমার ছেলেটা ক্লাস এইট পাশ করেছে। ওকে যদি একটা পিয়নের চাকরি দিয়ে দেন, তাহলে খুব উপকার হয়। তখনকার দিনে এইট পাশ হলেই পিয়নের চাকরি পাওয়া যেত। ছেলের রেজাল্ট কী জানতে চাইলেন অফিসার। রেজাল্ট শোনার পর তিনি ছেলেটাকে দেখতে চাইলেন যে, আচ্ছা, তোমার ছেলেটাকে নিয়ে আসো। কথা বললেই কিন্তু একজন মানুষ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আপনি

কীভাবে হ্যান্ডশেক করছেন বা সালাম দিচ্ছেন—যারা বুদ্ধিমান তারা এ থেকেই আপনার সম্পর্কে ধারণা করে নেবেন।

তিনি দেখলেন, চমৎকার কিশোর! অফিসার তাকে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু ভালো কথা বললেন। তারপর তার বাবাকে ডেকে বললেন, তোমার ছেলেটি মেধাবী। পড়াশোনা বন্ধ কোরো না। তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু তাকে ম্যাট্রিক পাশ করাও। এরপর আমার কাছে আসো।

তিনি প্রথমে কষ্ট পেলেন। তারপর আবার ভাবলেন যে, ম্যাট্রিক পাশ করলে তো ক্লাস এইট পাশের চেয়ে একটু ভালো চাকরি পাওয়া যাবে। ছেলেটি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল এবং পুরো পাঞ্জাব শিক্ষাবোর্ডে ম্যাট্রিকে রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম হয়ে গেল! দরিদ্র পিতা। কলেজে পড়ানোর সামর্থ্য নেই। সেই অফিসার যেহেতু শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা, তিনি লাহোর সরকারি কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে যোগাযোগ করলেন। অফিসার প্রিন্সিপালকে বোঝালেন যে, ছেলেটি খুব ভালো ছাত্র। ফুল স্কলারশিপে তার পড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিএ পাশও করে ফেলল রেকর্ড পরিমাণ নম্বর নিয়ে। এখানেও প্রথম! জীবন কীভাবে বদলে যায়!

এরপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল স্কলারশিপে পিএইচডি করার সুযোগ পেল এবং সে কেমব্রিজ-এ চলে গেল। পিএইচডির সুপারভাইজার দেখলেন—ছেলেটা মেধাবী, যদিও ভারতীয়। তাকে চ্যালেঞ্জ দিলেন যে, একবছর সময় তোমার। তুমি পদার্থবিজ্ঞানের একটা জটিল সূত্র সমাধান করবে। এটাই ছিল তার পিএইচডির ওয়ার্ক। প্রফেসর ড. পল ডির‍্যাক এবং প্রফেসর রিচার্ড ফাইনম্যান—দুজনই পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সমস্যাটা এত জটিল ছিল যে, সেটা সমাধান করার জন্যে তারাও হিমশিম খাচ্ছিলেন বছরের পর বছর, কিন্তু সে ছয় মাসের মধ্যে সমাধান বের করে ফেলল! যখন কেউ প্রস্তুত হয়, যখন কেউ লক্ষ্যটা বড় করে, লক্ষ্যও তার দিকে এগিয়ে আসে।

এতদিনে এই তরুণ নিজের সম্ভাবনাকে বুঝতে পেরেছে। নিজের ওপর আস্থা, নিজের ওপর বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এই তরুণ পরবর্তী সময়ে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছে। তার নাম হচ্ছে অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম।

অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, তিনি শুধু নিজেই পিএইচডি করেন নি, তার দেশের আরো ৫০০ বিজ্ঞানী তার সুপারিশে পিএইচডি করেছেন।

একজন অধীনস্থের প্রতি তার ঊর্ধ্বতনের একটা পরামর্শ শুধু একজন মানুষকে না, একটি দেশের বিজ্ঞানের কাঠামোকে পরিবর্তন করে দিয়েছে!

আসলে যার মধ্যে সম্ভাবনা আছে তাকে যদি পথ দেখাতে পারেন, তার সম্ভাবনাটাকে কাজে লাগাতে পারেন, সেটা অনেক বড় কাজ।

আপনারা অনেকে ডা. দেবী শেঠির নাম জানেন। যাদের হার্টে প্রবলেম আছে, দেবী শেঠির পুরো ঠিকুজি, মানে জীবনবৃত্তান্ত তাদের মুখস্ত। তিনি শুধু উপমহাদেশে না, সারা পৃথিবীতে কার্ডিয়াক সার্জন হিসেবে খ্যাত। বিদেশ থেকে সার্জন হয়ে তিনি যখন কলকাতায় প্র্যাকটিস শুরু করলেন, একদিন তার চেম্বারে একটা ফোন এলো। হাউজ কল। ডাক্তারদের সবচেয়ে অনীহা রোগীকে তার বাসায় দেখতে যাওয়া।

তিনি বলেই ফেললেন, আপনি একজন কার্ডিয়াক সার্জনকে হাউজ কল করেছেন! ফোনের ওপাশ থেকে এক মহিলা রোগী দেখে যেতে অনুরোধ করলেন। মহিলার কণ্ঠস্বরের মধ্যেই কিছু ছিল। মহিলাদেরকে সাধারণত যত দুর্বল ভাবা হয়, তারা কিন্তু অত দুর্বল না। তাদের কথার শক্তি অনেক বেশি। আসলে আওয়াজ যত বেশি হয়, কথার শক্তি তত কম। আওয়াজ যত মোলায়েম, কথার শক্তি তত বেশি।

তিনি বিরক্তি চেপে রোগীর বাড়ি গেলেন। রোগীর সাথে দেখা হলো। পরবর্তীকালে দেবী শেঠি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই ফোনকলটাই তার জীবন বদলে দিয়েছে। যাকে দেখতে গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন মাদার তেরেসা! মাদার তেরেসা তাকে বলেছিলেন, দেখ, আমরা যে হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তার চেয়েও অনেক দামি হাত তোমার।

কেন? দেবী শেঠি কার্ডিয়াক সার্জন। ১৬ হাজার হার্ট সার্জারি করেছেন। অর্থাৎ ১৬ হাজার মানুষের হৃদযন্ত্রকে ঠিকঠাক করে দিয়েছেন। তাদেরকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছেন।

তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কেন সার্জারি করা দরকার, আগে রোগীকে এটা বোঝাতে একঘণ্টা সময় লাগত। আর এখন অবস্থা হয়েছে এই যে, সার্জারি করার প্রয়োজন নেই—এটা বোঝাতে একঘণ্টা লাগে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের একজন শুভানুধ্যায়ী, বাবু সুকুমার চক্রবর্তী, ৮৭ বছর বয়স। তিনি ব্যাংকার ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকারদের চাপ অনেক বেশি। ঋণ দেয়ার চাপ, আবার ঋণ উদ্ধার করার চাপ। তিনি দেবী শেঠির কাছে গিয়েছিলেন। দেবী শেঠি তার চিকিৎসা করেছেন। সুকুমার বাবুর প্রতি তার শেষ পরামর্শ ছিল—আপনি যেহেতু ঢাকা থেকে এসেছেন, আপনি শান্তিনগরে যাবেন মহাজাতক বাবুর কাছে। তিনি যা বলেন সেগুলো অনুসরণ করবেন। আমার কাছে আপনার আর আসতে হবে না।

আজকে ২০ বছর। সুকুমার বাবু এখনো নিয়মিত ইয়োগা করেন, মেডিটেশন করেন। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কো-অর্ডিনেটর ডা. মনিরুজ্জামানের পরামর্শ অনুযায়ী লাইফস্টাইল অনুসরণ করেন। এখনো এত চমৎকার চেহারা তার, বিয়ের প্রস্তাব এসে পড়াও অসম্ভব কিছু নয়। কেন? তিনি ভালো ফলোয়ার। তাকে যা বলে দেয়া হয়েছে, তিনি সেটা অনুসরণ করেছেন। করোনাকালেও তিনি দিব্যি ভালো ছিলেন। কোনো অসুবিধা হয় নি। অনেকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে যে, আপনার বয়স হয়েছে। উনি আবার খুব রসিক মানুষ। তাদেরকে বললেন, আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নাই। গুরুজী বলেছেন, আই অ্যাম এ প্রিন্স!

ডা. দেবী শেঠির সার্জারির হাত এত ভালো কেন? কারণ তিনি তার কাজটা সবচেয়ে ভালোভাবে করেছেন। একজন মানুষ একটা পরামর্শ, একটা আলোচনা বা একটা কথা যদি সবচেয়ে ভালোভাবে বলেন, সেটা ভালো ফল প্রসব করবে। আর ভালোভাবে কাজ করা যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ, তিনি ফরজ আদায়ের নেকি পাবেন। আসলে ভালো কথা অন্যের উপকারের মানসে অন্তর থেকে বলতে হবে যে, আমার এই কথায় তার অন্তর যেন প্রভাবিত হয়। সে যেন এই কথাটা অনুসরণ করার শক্তি পায়।

দেবী শেঠির নাম কেন নিয়েছি? ১৬ হাজার মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করেছেন তিনি। যদি শুধু পয়সা উপার্জন উদ্দেশ্য হতো তো প্রত্যেককে লাইন ধরে শোয়াতেন, এরপর একটার পর একটা সার্জারি করতেন। যার প্রয়োজন নাই, তাকে তিনি বলেছেন যে, আপনার সার্জারি করা লাগবে না। লাইফস্টাইল পরিবর্তন করেন। বাংলাদেশের অনেকে তার পরামর্শে ঢাকায় এসে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছেন। কলকাতা থেকেও কেউ কেউ ঢাকায় এসে কোর্স করে গেছেন।

অন্যায় থেকে বিরত রাখা সম্পর্কেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিষ্কার হওয়া উচিত। চুরি ডাকাতি খুন অপহরণ নিঃসন্দেহে অন্যায়, কিন্তু এগুলোই শুধু অন্যায় নয়। আপনার প্রতিদিনের আচরণ যদি অন্যের বঞ্চনার কারণ হয়, সেটাও অন্যায়। ধরুন, আপনি শিক্ষক। দুজন ছাত্র। দুজনেরই চমৎকার রেজাল্ট। দুজনকেই আপনি সুযোগ দিতে পারেন শিক্ষকতায় বা দুজনই স্কলারশিপ পেতে পারে। কারণ দুজনই যোগ্য। একজনকে আপনি পছন্দ করেন, আরেকজনকে কোনো কারণে অপছন্দ করেন। যাকে পছন্দ করেন, তাকে সুযোগ দিলেন। যাকে অপছন্দ করেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাকে আটকে দিলেন। তিনি বঞ্চিত হলেন। তার জীবনের সম্ভাবনাটা আপনি নষ্ট

করে দিলেন। এটা অন্যায়।

ছেলেকে মুরগির রান দিচ্ছেন, মেয়েকে দিচ্ছেন মুরগির গলা। ছেলের লেখাপড়া নিয়ে আপনার ঘুম নাই, কিন্তু মেয়ের লেখাপড়ার ব্যাপারে আপনার কোনো চিন্তা নাই। এটাও অন্যায়। কারণ একটি সন্তানকে আপনি বঞ্চিত করছেন। স্নেহ মমতা যত্ন পাওয়া তারও সমান অধিকার।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, একজন একটা বিপদে পড়তে যাচ্ছে। বললেন, আমার কী গরজ পড়েছে তাকে উদ্ধার করার! এখানেও আপনি অন্যায় করলেন। আপনি তাকে একটু সতর্ক করলে সে হয়তো বেঁচে যেতে পারত। আপনি মনে করতে পারেন—আপনি সতর্ক করলে সে না-ও শুনতে পারে। কিন্তু শুনতেও তো পারে। আপনি সতর্ক করলেন না, সে বিপদে পড়ে গেল। আপনি অন্যায় করলেন। আপনি একজনের ব্যাপারে আরেকজনের কাছে কূটনামি করে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দিলেন, এটা অন্যায়। গীবত করলেন, এটা অন্যায়।

যদি ভালো মানুষের সংস্পর্শে থাকেন, আপনি ভালো কাজের সাথে যুক্ত থাকবেন। আর খারাপ মানুষের সাথে থাকলে আস্তে আস্তে খারাপের সাথেই যুক্ত হবেন। যারা মাদক নেয়, তাদের অনেককে রিহ্যাবে রাখা হয়। রিহ্যাব থেকে বাসায় ফিরে এসে কিছুদিন ভালো থাকে, কিন্তু যেই তার পুরনো বন্ধুবান্ধব অর্থাৎ মাদকসেবীদের সাথে যোগাযোগ হয়, একদিন, দুই দিন, তিন দিন, আবার সে মাদকে আসক্ত হয়ে যায়। তাই ভালো মানুষের সাথে যে-রকম যুক্ত থাকা দরকার; মন্দ কাজ, অন্যায় কাজ, ভুল কাজ, পাপ কাজ যারা করে, তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখাও দরকার। কারণ ঐ যে বলে না, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

এজন্যে যারা গীবত করে, যারা আজেবাজে কথা বলে, গালিগালাজ করে, নেতিবাচক কথা বলে তাদের থেকে দূরে থাকবেন। নেতিবাচক মানুষ হচ্ছে নয় মণ দুধের মধ্যে এক ফোঁটা চোনা। এরা প্রথমে ভালো ভালো কথা বলে বন্ধুত্ব করবে, কিন্তু একটা নেতিবাচক কথা দিয়েই আপনার সর্বনাশ করে ফেলতে পারে। আপনি হয়তো একটা স্বপ্ন নিয়ে, আশা নিয়ে এগোচ্ছেন। নেতিবাচক কথা বলে আপনার সেই স্বপ্ন, আপনার সেই আশা ভেঙে চুরমার করে দেবে।

অনেকে বলেন, স্বামী নেতিবাচক হলে, স্ত্রী নেতিবাচক হলে দূরে থাকব কীভাবে? দূরে থাকার তো কোনো উপায় নেই। দূরে থাকা মানে হচ্ছে তার কথা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। তার কথা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান

দিয়ে বের করে দেবেন। নেতিবাচক মানুষের কথা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

সবসময় ভালো কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখবেন, কাজটা যত ছোট হোক। একটা গাছ লাগানো, গাছে পানি দেয়া, গাছের যত্ন নেয়া হতে পারে। নিজের ঘরটাকে পরিষ্কার রাখা বা টেবিল গুছিয়ে রাখা হতে পারে। আর আপনার মনছবি, আপনার লক্ষ্যটাকে সবসময় চোখের সামনে রাখবেন, যাতে আপনি একটু একটু করে হলেও এগোতে পারেন। বিন্দু বিন্দু ভালো কাজই একদিন একটা টিলা সমান হতে পারে, পাহাড় সমান হতে পারে, পর্বত হতে পারে, একটা দেশ গড়তে পারে।

আমাদের বাংলাদেশের কথাই ধরুন। বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ কিন্তু বিন্দু বিন্দু বালি, বিন্দু বিন্দু পলি জমে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মতো আরেক বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের নিচে, জেগে ওঠার অপেক্ষায়। মাঝে মাঝে একটু উঁকি দেয়, আবার পানির নিচে চলে যায়। এজন্যে সবসময় সৎসঙ্ঘে থাকবেন, ভালো মানুষের সঙ্গে থাকবেন। এই বিন্দু বিন্দু ভালো কাজই আপনাকে রোগমুক্ত ও দীর্ঘায়ু হতে সাহায্য করবে, সফল করবে।

১৫ অক্টোবর ২০২১, কোয়ান্টামম

প্রতিকূলতা সক্ষমতা বাড়ায়

হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের দেশ ধ্যানের দেশ। যোগ প্রাণায়াম ধ্যান ধর্ম নৈতিকতা সমমর্মিতা মিশে আছে আমাদের অস্থিমজ্জায়। যে কারণে যে-কোনো প্রতিকূলতা, বিপদ-আপদ, দুর্যোগ মোকাবেলায় শুধু ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত সক্ষমতাও আমাদের বেশি। অবশ্য আতঙ্কের বেনিয়ারা সবসময় তৎপর থাকে নতুন নতুন আতঙ্ক দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে নিজেদের আখের গোছাতে। করোনাকালে আতঙ্কের ধুম্রজাল বিস্তার করে তারা নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করেছে। এখন নতুন করে ইউক্রেন যুদ্ধ লাগিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বাড়িয়েছে। এই মজুদদার মুনাফাখোর আতঙ্কের বেনিয়ারা একেক সময় একেক পণ্য বাজার থেকে হাওয়া করে দেয়। তারপরে বেশি দামে বিক্রি করে। এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিলেই তাদের হীন চক্রান্ত থেকে জাতি মুক্ত হতে পারে।

প্রতিকূলতা ও বাধা বিশ্বাসী-প্রত্যয়ী মানুষের সক্ষমতা বাড়ায়। আমরা যদি সাম্প্রতিক ঘটনাবলি দেখি—একসময় কোরবানির পশু ও প্রাণীজ আমিষের জন্যে আমরা প্রতিবেশী দেশ ভারতের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। তারা পশু পাঠালে আমাদের কোরবানি হতো। পশু পাঠানো নিয়ে গড়িমসি করলেই অসুবিধা হতো। একবার তারা ঘোষণাই দিয়ে দিল—কোরবানির পশু তারা আর পাঠাবে না। এই ঘোষণা আমাদের অর্থনীতির জন্যে শাপেবর হয়ে গেল। আমরা কোরবানির পশু এবং প্রাণীজ আমিষে স্বনির্ভর হয়ে গেলাম!

জার্মান সংবাদ মাধ্যম ডয়চে ভেলে-র একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করতে পারি। ২০২১ সালের জুলাই মাসে প্রবল বৃষ্টিপাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জার্মানি বেলজিয়াম নেদারল্যান্ডস। আকস্মিক বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় গ্রামের

পর গ্রাম। ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়িঘর তলিয়ে প্রাণ হারায় মানুষ। প্রস্তুতি নেয়ার সময়ও পায় নি এসব ধনী দেশের নাগরিকেরা। ২২০ জন মারা যায়। তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ইউরোপে। এক জার্মান নাগরিক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেন—গরিব দেশগুলোতে বন্যায় লোক মারা যেতে পারে, কিন্তু জার্মানির মতো দেশে বন্যায় কেউ মারা যাবে, এটা তো কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। ডয়চে ভেলে বলছে, অথচ বাস্তবতা তুলে ধরছে উল্টো চিত্র। ইউরোপে যে বন্যা নিয়ে এত মাতম ও আতঙ্ক, তার চেয়ে ঢের বেশি ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা ২০২০ সালে আঘাত হানে বাংলাদেশে। ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় দেশটি বেশ জনবহুল ও দরিদ্র। অথচ ঘূর্ণিঝড় আম্পানে বাংলাদেশে মারা যায় ২৬ জন।

যদি ঘূর্ণিঝড়টি ইউরোপের কোনো উপকূলে আঘাত হানত, প্রাণহানী বেশি হতো বলেই ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা এটাও বলছেন, বন্যা ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় পৃথিবীর যে-কোনো দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ! কীভাবে এটা সম্ভব হলো? ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশটি ধারাবাহিকভাবে তার সক্ষমতা বাড়িয়েছে। এই কারণেই সংবাদ মাধ্যম ডয়চে ভেলে বলছে, ধনী দেশগুলোর উচিত বাংলাদেশের কাছ থেকে শেখা কীভাবে দুর্যোগ সামলাতে হয়! ডয়চে ভেলে-কে ধন্যবাদ। তারা এ বিষয়ে যথাযথ সত্য বলেছেন।

জাতীয় জীবনে আমাদের এই সক্ষমতার পাশাপাশি চারপাশের ব্যক্তিজীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখব, প্রতিকূলতার মাঝে যারা বেড়ে উঠেছেন তাদের সক্ষমতা আদরে লালিত মানুষের চেয়ে অনেক বেশি।

রাজশাহীর ঘটনা। প্রতিকূলতায় যার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা, সেই শিউলি এখন চিকিৎসক হওয়ার পথে। শিউলির ভাষায়, এক কেজি আটার দাম তখন ১০ টাকা। একটা খাতার দামও ১০ টাকা। আটা কিনলে খাতা হয় না, আবার খাতা কিনলে না খেয়ে রাত কাটাতে হয়। তারপরও খাতাই কিনেছিলেন শিউলি। ভাতের অভাব থেকে মুক্তির আশায় স্কুলে পড়ার সময় মা-বাবা তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্বশুরবাড়িতে ভাতের অভাব ছিল না, কিন্তু সেখানেও তার কান্না থামে নি। বাড়ির বউকে আর পড়াতে চান নি তারা। শিউলির জেদ, তিনি পড়বেন। স্বামীও পড়াবেন। একপর্যায়ে শ্বশুরবাড়িতে শিউলির ভাত বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিবাদ করায় স্বামীসহ শিউলিকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়। স্বামী সামান্য বেতনে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। বাড়িভাড়া দিলে আর

খাওয়ার কিছু থাকে না। এর মধ্যে শিউলি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পান। পড়তে পড়তেই মা হয়েছেন। এসব করেই এবছর তিনি রাজশাহীর বারিন্দ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেছেন। এটা শুধু এক শিউলির ডাক্তার হওয়া নয়, প্রতিবছর বহু শিক্ষার্থী দারিদ্র্য অনটন সত্ত্বেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

যশোরের কিশোর দেবনাথ দিনমজুরের ছেলে। এবার যশোর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। পিরোজপুরের মোছাম্মৎ শাবনুর সপ্তম শ্রেণি থেকেই টিউশনি করে নিজের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে আসছেন। এবছর জামালপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন।

সাতক্ষীরার মারুফা খাতুন। জেলের মেয়ে। তিন বেলা খাবার জোটে না প্রতিদিন। এবার সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। কুষ্টিয়ার সবুজ আহমেদ। গ্রামের হাটে সবজি বিক্রি করে সংসার চালান তার বাবা। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন।

এরকম বহু ছেলেমেয়ে প্রতিবছরই অভাব-অনটন প্রতিকূলতা কাটিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। অর্থাৎ প্রতিকূলতা বিশ্বাসী-প্রত্যয়ী মানুষের ভেতরে নতুন সক্ষমতার জন্ম দিতে পারে। আর যারা নিয়মিত মেডিটেশন অনুশীলন করেন, প্রতিকূলতা মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেয়ার সামর্থ্য তাদের বেশি। তারা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারেন। দুর্বিপাক মোকাবেলার পাশাপাশি রোগব্যাধি থেকেও তারা অন্যদের চেয়ে দ্রুত নিরাময় লাভ করেন। এ কারণে ডাক্তাররা এখন ক্রনিক রোগীদের নিরাময়ে প্রেসক্রিপশনে লিখছেন যোগ, প্রাণায়াম, মেডিটেশনের কথা।

দ্য গার্ডিয়ান-এর ২০২২ সালের মে মাসের একটি রিপোর্ট হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার ডাক্তাররা এখন ক্রমবর্ধমান হারে বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ, ইয়োগা, মেডিটেশন করার জন্যে রোগীদের উৎসাহিত করছেন। রিপোর্টে বলা হয়, রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান কলেজ অব জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স যৌথভাবে পার্করান অস্ট্রেলিয়ার সাথে ক্রনিক ব্যাধি নিরাময়ের উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রতি শনিবার সকালবেলা বিনামূল্যে পাঁচ কিলোমিটার দৌড়ের ব্যবস্থা করেন পার্করান অস্ট্রেলিয়ার স্বেচ্ছাসেবকরা। কেউ দৌড়ান, কেউ হাঁটেন, কেউ জগিং করেন, কেউ-বা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন। এই সামাজিক দৌড় তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও ভালো থাকার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

২০১৯ সালে রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান কলেজ অব জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়, ২০ শতাংশ অস্ট্রেলিয়ান দুই বা ততোধিক ক্রনিক রোগে আক্রান্ত এবং মানসিকভাবে অসুস্থদের অর্ধেকই কোনো না কোনো ক্রনিক রোগে আক্রান্ত। রিপোর্টে বলা হয়, রোগীকে নন-মেডিকেল এক্টিভিটিস যেমন—ফিটনেস প্রোগ্রাম, ইয়োগা ও মেডিটেশন চর্চায় উৎসাহ দেয়ার ফলে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং তারা ভালো থাকছে। ক্রনিক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়াতে ডাক্তাররা রোগীদের যোগ এবং মেডিটেশনের পরামর্শ দিচ্ছেন, বাস্তব সামাজিক মেলামেশায় উদ্বুদ্ধ করছেন। আইসোলেশন থেকে এখন তারা সোশ্যালাইজেশন-এর পথে পা বাড়াচ্ছেন।

একজন মানুষ সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে, নিঃসঙ্গ হয়ে কখনো সুস্থ ও ভালো থাকতে পারে না। সুস্থতার জন্যে প্রয়োজন শরীরের যথাযথ যত্ন নেয়া। যখন একজন মানুষ শারীরিক মানসিক সামাজিক ও আত্মিকভাবে নিজের পরিপূর্ণ যত্ন নেয়, তখন সে টোটাল ফিটনেসের সন্ধান পায়, পরিপূর্ণ সুস্থতার সন্ধান পায়। সে তখন নির্দ্বিধায় বলতে পারে—আমি ভালো আছি!

কোয়ান্টাম ৩০ বছর ধরে মানুষকে পরিপূর্ণরূপে ভালো রাখার জন্যেই কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ যেন শারীরিক মানসিক পারিবারিক বা সামাজিক এবং আত্মিকভাবে ভালো থাকতে পারে সেজন্যে পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। শুধু শেখা ও জানার মধ্য দিয়েই এই কার্যক্রম শেষ হয়ে যায় না, বরং নিয়মিত অনুশীলন করার জন্যে যে অনুষঙ্গ, যে পারিপার্শ্বিকতা প্রয়োজন, সবই আছে কোয়ান্টাম মেথডে। যারা কোর্স করে বা *কোয়ান্টাম মেথড* বই পড়ে মেডিটেশন শিখেছেন, তারা নিয়মিত অনুশীলন করতে কখনো গাফেলতি করবেন না। শেখা এবং জানা যে-রকম গুরুত্বপূর্ণ; অনুশীলন তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনুশীলনটা যখন নিয়মিত হবে তখন নতুন নতুন ক্ষেত্রে আপনি অনায়াসে আপনার সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারবেন। প্রতিটি প্রতিকূলতা বা চ্যালেঞ্জকে তখন মনে হবে একটা নতুন সুযোগ, নতুন সাফল্যের সিঁড়ি।

ধ্যানের পাশাপাশি ইয়োগা বা যোগের চর্চা, প্রাণায়ামের চর্চা আপনাকে আরো প্রাণবন্ত, আরো প্রাণোচ্ছল করে তুলবে। আপনার জীবন সুন্দর হোক, সফল হোক। আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, প্রাণবন্ত থাকুন।

৩ জুন ২০২২, ঢাকা

৪—

মানুষ যা ভাবতে পারে তা অর্জন করতে পারে

মানুষ যা ভাবতে পারে তা অর্জন করতে পারে। যে-কোনো কিছু অর্জন করতে হলে আগে ভাবতে হবে। মানুষ যখন ভাবতে পারে—আমি পারি, আমি করব, তখন সে করতে পারে। যখন সে ভাবে—হবে না, পারব না, তখন হয়ও না, পারেও না। খেলাধুলা বলেন, পড়াশোনা বলেন, জীবনযুদ্ধ বা রণক্ষেত্র বলেন, জয়-পরাজয়টা নির্ধারিত হয়ে যায় ভাবনার জগতে। খেলাধুলাও অনেকটা রণক্ষেত্র। এখানেও দুই পক্ষ যখন নামে, জানপ্রাণ দিয়ে খেলে। যে টিম ভাবতে পারে যে, আমরা জিতব, সে টিম জেতে। তার খেলা একরকম হয়। আর যে টিম মনে করে যে, হেরে যাব, পারি কি না পারি, কী জানি কী হয়! তারা হেরে যায়।

আপনি সফল হবেন না ব্যর্থ হবেন, নক্ষত্র হবেন না উল্কাপিণ্ড হবেন, প্রদীপের দীপশিখার মতো জ্বলজ্বল করবেন না টিমটিম করতে করতে নিভে যাবেন; এটা নির্ভর করে আপনার ভাবনার ওপরে। উল্কাপিণ্ড কী হয়? নিভে যায়। আর নক্ষত্র জ্বলজ্বল করে আলো ছড়ায়। যদি ভাবতে পারেন যে, আমি জ্বলজ্বল করব, আপনি জ্বলজ্বল করবেন। যদি ভাবতে না পারেন, তাহলে নিভে যাবেন। ছাই হয়ে শেষ হয়ে যাবেন, জ্বলজ্বল আর করতে পারবেন না।

আমাদের ভাবনাটা এক বিশাল শক্তি। ভাবনাই বাস্তবতা নির্মাণ করে। মুক্তিযুদ্ধের কথাই ধরি। একটা সুসজ্জিত নির্মম বাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্যে যে প্রস্তুতি দরকার, অস্ত্র দরকার, গোলাবারুদ দরকার, রসদ দরকার, তার কিছুই আমাদের ছিল না; কিন্তু স্বাধীনতার, মুক্তির ভাবনা ছিল। এই ভাবনাটা সর্বত্র প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। অস্ত্র নাই। ঠিক আছে, শত্রুর অস্ত্রই আমার অস্ত্র। রসদ নাই। শত্রুর রসদ আমার রসদ। যেহেতু

আমরা বিশ্বাস করতাম যে, আমরা স্বাধীন হবো, আমরা জয়ী হবো; আমরা সত্যিই স্বাধীন হয়েছি, জয়ী হয়েছি।

আমরা বুদ্ধিমান জাতি। আমরা দক্ষ জাতি। আমাদের জাতি যখন কোনোকিছু ভাবে যে, এটা সে করবে, তখন তার ব্রেন সে লক্ষ্যে কাজ করতে শুরু করে এবং সেটা সে অর্জন করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এত কম সময়ে কোনো জাতি রক্তাক্ত যুদ্ধ করে এরকম একটা নৃশংস হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীন হতে পারে নি, কিন্তু আমরা পেরেছি। কেন? আমরা ভাবতে পেরেছি। আমরা যেহেতু দুর্যোগ মোকাবেলায় দক্ষ জাতি, আমাদের ভাবনাটা বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে প্রথম, তারপরে সেটা কর্মে রূপান্তরিত হয়েছে এবং দেশের মানুষ মুক্তির সৈনিক হিসেবে কাজ করেছে। কেউ অস্ত্র নিয়ে, কেউ রসদ সরবরাহ করে, কেউ খাবার সরবরাহ করে।

ছোট্ট এক মেয়ে তার পোষা ছাগলও নিয়ে এসেছে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ানোর জন্যে। 'আমার এই ছাগলটাই আছে, খুব যত্নের ছাগল। এটা মুক্তিযোদ্ধারা খাবে।' গরিব মেয়ে, কিন্তু কোনো টাকা নিতে চায় নি। ভাবনাটা যখন সৎ ভাবনা হয়, সুন্দর হয়, তখন স্রষ্টার রহমত তার ওপর নাজিল হয়। যে কারণে সবচেয়ে স্বল্পতম সময়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি। আমাদেরকে বলা হতো, স্বাধীন হয়েছ তাতে কী হয়েছে? তোমরা কখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। তোমরা দরিদ্রই থাকবে!

এ নিয়ে গ্রামে গল্প আছে। যাকে দেখতে পারে না তার সম্পর্কে বলে যে, অমুকের ছেলে পাশ করতে পারবে না, কিন্তু এসএসসি পাশ করল। কলেজ পাশ করতে পারবে না, কলেজও পাশ করল। বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করতে পারবে না, বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করল। তাতে কী! চাকরি পাবে না, চাকরিও পেল। চাকরি করলে কী হবে, বেতন পাবে না। বেতনও পেল। বেতন পেলে কী হবে, এই টাকায় চলতে পারবে না!

আমরা স্বাধীন হলাম। আমাদের সম্পর্কে অনেকে বলল, বাংলাদেশ একটা তলাবিহীন ঝুড়ি। এ দেশ টিকতে পারবে না, কিন্তু আমরা সবসময় বিশ্বাস করতাম যে, আমাদের দেশ হচ্ছে স্বর্গভূমি। আমরা যদি লক্ষ্য স্থির করি তো আমরা যে-কোনো কিছু অর্জন করতে পারি। আমরা এখন থেকে ৩০ বছর আগে লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, পৃথিবীর সেরা ১০-এর মধ্যে আমরা থাকতে চাই। এখন অনেক কিছুতেই আমরা পৃথিবীর সেরা ১০-এর মধ্যে।

আমাদের দেশ এখন ধান উৎপাদনে চতুর্থ, ইলিশে প্রথম, কাঁঠালে দ্বিতীয় এবং ইনশাআল্লাহ আগামী ১০ বছরের মধ্যে কাঁঠাল উৎপাদনে আমরা

প্রথম হবো। সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আলু উৎপাদনে ষষ্ঠ, আমে অষ্টম, পেয়ারায় অষ্টম, ছাগলের দুধে দ্বিতীয়, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয়। অর্থাৎ যেখানে আমরা মনোযোগ দিয়েছি সেখানে আমরা টপ অব দ্য লিস্টে চলে এসেছি। আমরা যদি ভাবতে থাকি, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা ১০-এর মধ্যে থাকতে পারব।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, যে যত নেতিবাচক কথা বলুক, আমরা সবসময় ইতিবাচক থেকেছি এবং জাতিগতভাবেই আমরা এগিয়েছি। পৃথিবীতে যারাই বড় হয়েছেন, প্রথমে তারা ভাবনাটাকে বড় করেছেন।

এখন থেকে ১১০-১১১ বছর আগে। ১৯১০-১১ সাল। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস। প্যারিস শহরের একটা রেস্তোরাঁয় লেখকদের আড্ডা হতো। যে-রকম কলকাতায় কফি হাউজ আছে। লেখক কবি সাহিত্যিক চিত্রকরেরা সাধারণত আড্ডা দিতে পছন্দ করেন। সেখানে নিয়মিত যারা আড্ডা দিতেন তারা পরবর্তীকালে অনেক বিখ্যাত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন চিত্রকর পাবলো পিকাসো, কবি নাট্যকার ও চিত্র পরিচালক জাঁ ককতো, কবি এপোলিনিয়ার। বয়সে সবাই তরুণ।

একদিন জাঁ ককতো লক্ষ করলেন যে, পাশের টেবিলে এক ভদ্রলোক রোজ চুপচাপ বসে তাদের কথা শোনেন। দেখলেই বোঝা যায়, লোকটার তেমন টাকাপয়সা নেই। ককতোর কৌতূহল হলো। জিজ্ঞেস করলেন, 'মশাইয়ের কী করা হয়? ছবি আঁকেন? না গল্প-কবিতা লেখেন?' তিনি বললেন, 'আঁকিও না, লিখিও না। তবে লেখা বা আঁকা নিয়ে আপনারা কী ভাবেন তা জানার আমার খুব ইচ্ছা। তাই বসে বসে আপনাদের কথা শুনি।' জাঁ ককতো তখন পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে করেনটা কী?' ভদ্রলোক বললেন, 'আসলে আমার কাজ হলো ভাবা। বসে বসে আমি ভাবি।' ককতো একটু বিরক্তই হলেন।

'তা মশাই, কী নিয়ে ভাবেন?' ভদ্রলোক বললেন, 'জানেন তো, অত্যাচারী সম্রাটের শাসনে আমার দেশ। আমি ভাবি, কীভাবে এই অত্যাচার উচ্ছেদ করে আমার দেশের মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করব।' ককতো ভাবলেন যে, লোকটার মাথা খারাপ। স্ক্রু ঢিলা। নইলে এমন ভাবনা আসতে পারে মাথায়! কারণ সে দেশের সম্রাট অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

এটা ছিল ১৯১০-১১ সাল। ছয়-সাত বছর পরে। তখন ককতো, পিকাসোর একটু নামডাক হয়েছে। এমন সময় একদিন ককতো খবরের কাগজ নিয়ে পিকাসোর কাছে ছুটে এসে বললেন, 'ঐ লোকটার কথা মনে

আছে, যে রেস্তোরাঁয় আমাদের পাশের টেবিলে বসে আমাদের আলোচনা শুনত আর অত্যাচারী সম্রাটের শাসন উচ্ছেদ করার কথা ভাবত?' পিকাসো বলল, 'হাঁ, মানে আছে। কী হয়েছে?' ককতো বলল, 'লোকটা তো সত্যি সত্যি রাশিয়ায় বিপ্লব করে ফেলেছে! জারের শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। রাশিয়ার নতুন নাম হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে গেছে সে!'

এই লোকটির নাম হচ্ছে ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেলিন! লেলিনের নাম শোনেন নি এরকম মানুষ খুব কম। আপনারাও শুনেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতির পিতা লেলিন। আসলে মানুষ যখন একটা জিনিস ভাবতে থাকে, সেটা বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয় এবং বিশ্বাস কর্মে রূপান্তরিত হয়। যখন এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়, মস্তিষ্ক সেভাবে কাজ করতে শুরু করে এবং এই কর্ম নতুন বাস্তবতা নির্মাণ করে।

আমাদের ভাবনার শক্তি বোঝানোর জন্যে অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কোয়ান্টামমে এলেই আপনারা বুঝতে পারেন যে, ভাবনার শক্তিটা কত! আমরা যখন এখানে প্রথম এসেছিলাম, এখন যেটা রাহমাতান, এই বাংলোটা করতে মিস্ত্রিদের পর পর ছয়টা টিমের দুই বছর সময় লেগেছিল। পাঁচটা টিম তাদের যন্ত্রপাতি রেখে পালিয়ে গিয়েছিল মশার কামড়ে। ছয় নম্বর টিম এসে ঘরটার কাজ শেষ করেছে।

যখন এখানে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম, আমরা বলেছিলাম, এখানে হেলিপ্যাড হবে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় হবে। যারা স্থানীয়, মান্যগণ্য লোক, তারা নিশ্চিত হলেন যে, আমাদের মাথা ...! তারা আমাদেরকে খুব মায়া করতেন। একদিন আমরা বেশ কয়েকজন গাছের চারা কাঁধে করে নিয়ে আসছি। দেখি দূরে এক জায়গায় বাড়ির মহিলারা বাচ্চাদের ডাকছে আমাদের দেখানোর জন্যে এবং কিছু বলছে। চট্টগ্রামের ভাষা আমি বুঝি না। আমাদের সাথে একজন চট্টগ্রামের লোক ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কী বলছে? বললেন, গুরুজী! বলা যাবে না। আমি বললাম, কেন বলা যাবে না! বললেন, মহিলারা বলছে, আয় আয়, পাগল দেখে যা! এটা শুনে আমিও তাদের দিকে তাকিয়ে হেসেছি।

আজকে যে হলে আপনারা বসে আছেন—এখানে এই যে ছয় ইঞ্চি (ব্যাস এবং) বিশ ফিট (লম্বা) ডায়া পাইপ। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বললেন, এটা তো ক্রেন ছাড়া ওঠানো সম্ভব না। আমি বললাম, এখন থেকে চার হাজার বছর আগে পিরামিড গড়ার জন্যে যদি এরকম পাথরের টুকরা দেড়শ

মাইল, দুইশ মাইল দূর থেকে আনা যায় তো আমরা এত বুদ্ধি থাকার পরে পাইপ সোজা করতে পারব না, এটা কি হয়? তারা বললেন, ঠিক আছে, পারব। এখানে ক্রেন আসবে কোত্থেকে? স্থানীয় প্রযুক্তিতে বাংলা ক্রেন বানানো হলো। জিপের মধ্যে বালুর বস্তা দিয়ে জিপটার ওজন বাড়িয়ে পাইপ ওঠানোর চেষ্টা করা হলো। ওঠাতে গিয়ে জিপটা উল্টে গেল। অতঃপর ক্রেন যাতে না উল্টায় সেটার ব্যবস্থা করা হলো। তারপর পাইপ তোলা হলো।

যেহেতু আমরা ভাবতে পেরেছি আমরা করতে পারব, হয়ে গেল। কোয়ান্টামমের প্রত্যেকটা জিনিসই যখন ভাবা হয়েছিল, প্রথমে সেটাকে অসম্ভব মনে হয়েছে। কিন্তু আমাদের ভাবনাটা সবসময় বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে এবং আমরা করতে পেরেছি। আপনি যেভাবে ভাববেন, ঘটনা কিন্তু সেভাবেই ঘটবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আপনি যা হতে চান, যেখানে যেতে চান, যা অর্জন করতে চান সেটা মনে মনে চর্চা করতে হবে, মনে মনে কল্পনা করতে হবে। তখন এই কল্পনাই আপনাকে লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। যেটাকে আমরা বলি মনছবি।

আমাদের কোয়ান্টা শৈক্য চিং যখন ক্লাস এইটে, বলল, আমার মনছবি হচ্ছে বুয়েটে পড়ব। শৈক্য বুয়েটে পড়ছে কি পড়ছে না? পড়ছে। আমরা মিল্টন বমের কথা বলেছিলাম। সে পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয় পাতিয়ালায় মাস্টার্স করার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের কোয়ান্টাদের মধ্যে প্রথম সে দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে গিয়েছে। খুব ভালো ছেলে, মেধাবী ও বুদ্ধিমান। সে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। সবসময় সঙ্ঘের সাথে ছিল। করোনাকালে পুরো সময়টা দাফন কার্যক্রমে কাটিয়েছে। মিল্টন বম আমাকে একটা চিঠি লিখেছে। তার চিঠির শেষ প্যারাটা আমি পড়ে শোনাই—

'আমি এটা পুরোপুরি বিশ্বাস করছি যে, সৎসঙ্ঘ সবসময় মানুষকে এগিয়ে চলতে, মানুষের গুণাবলিকে বিকশিত করতে সহযোগিতা করে। আমি পৃথিবীর সকল প্রান্তে চলতে চাই। আমি মাস্টার্স ডিগ্রি নেয়ার পরে পিএইচডি সম্পন্ন করতে চাই এবং পরিবার সমাজ সঙ্ঘ গুরু ও দেশকে ভালবেসে এগিয়ে যেতে চাই।' এই যে ভাবনা—পরিবার সমাজ সঙ্ঘ গুরু ও দেশের প্রতি ভালবাসা, এই ভালবাসাটা একজন মানুষের শক্তিকে বিকশিত করে। ক্রমাগত ভাবনা মানুষকে লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

এই ভাবনার শক্তিকে খেলোয়াড়রা খুব চমৎকারভাবে ব্যবহার করছেন। ক্রীড়াঙ্গনে যত সফল খেলোয়াড় রয়েছেন, তারা আগে ভাবেন কীভাবে বলটাকে মারবেন, কীভাবে গোল করবেন, কোথায় হিট করবেন, তারপর

তিনি বাস্তবে খেলেন। এই ভাবনাটা যাতে এলোমেলো হয়ে না যায়, ভেজাল না হয় সেজন্যে এর মধ্যে নেতিবাচক কোনোকিছু ঢোকাবেন না। নেতিবাচক কোনোকিছু ঢুকলে কী হবে? দুধের সাথে পানি মেশালে কী হয়? ভেজাল হয়। ভাবনাকে তেমনি ভেজাল করা যাবে না। ভাবনাকে একদম খাঁটি দুধ বা মধুর মতো রাখতে হবে।

আমার খুব প্রিয় একজন দার্শনিক, জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিখ নিটশে। আমি যখন তরুণ ছিলাম, সুপারম্যানের আইডিয়া ফ্রেডরিখ নিটশে থেকে পেয়েছিলাম। ফ্রেডরিখ নিটশে বলেন, 'জীবনে যার বেঁচে থাকার একটা কারণ আছে, জীবনটা তার জন্যে অনেক সহজ।' আমি আমার জীবন থেকে উপলব্ধি করেছি যে, জীবনটা কত সহজ হতে পারে। কেন? আমার বেঁচে থাকার একটা কারণ আছে যে, আমি এই কারণে বেঁচে থাকব। এটাই আমার জীবন, এটাই আমার মরণ। পৃথিবীর কোনো প্রতিকূলতা, কোনো সমালোচনা আপনাকে স্পর্শ করবে না, কোনো বাধা আপনাকে আটকাতে পারবে না, যদি বেঁচে থাকার একটা কারণ আপনি বের করতে পারেন।

মনোবিজ্ঞানীদের ৭০ বছরের গবেষণার ফলাফল হলো—যাদের জীবনে একটা লক্ষ্য আছে তারা লাভ করেন দীর্ঘজীবন। যার যত সুন্দর ও বড় লক্ষ্য, তার জীবনটা তত সুন্দর, তত দীর্ঘ। তাদের ঘুম ভালো হয়। স্ট্রোক ও বিষণ্ন হওয়ার ঝুঁকি তাদের কম। যারা নিজ লক্ষ্যের ব্যাপারে যত সচেতন, রোগ ও অন্যান্য কারণে তাদের মৃত্যুহার কম।

১৬ হাজার মধ্যবয়সী মার্কিন এবং ব্রিটিশ নাগরিকদের নিয়ে একটা গবেষণা হয়েছিল। সেই গবেষণায় তারা দেখেছেন, যাদের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি কমেছে ২৭ শতাংশ, স্ট্রোকের ঝুঁকি কমেছে ২২ শতাংশ, বয়সজনিত স্মৃতিভ্রম—আলঝেইমার্সের ঝুঁকি নেমে এসেছে অর্ধেকে। তাদের কাছে জীবন অনেক সুন্দর, সহজ, সুস্থ ও প্রাণবন্ত।

তাহলে কী করতে হবে? এক. আপনাকে জীবনের একটা লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। ভাবনাকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। লেনিনের ভাবনাটা খুব সুনির্দিষ্ট ছিল যে, জারের অত্যাচার থেকে জনগণকে মুক্ত করতে হবে। তার ভাবনা একটা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তো আপনি কী হতে চান আগে তা ঠিক করুন যে, আমি এই হয়ে আমার দেশের মানুষের কল্যাণ করতে চাই, মঙ্গল করতে চাই বা এই জায়গায় পৌঁছে সমাজের কল্যাণ করতে চাই। সমাজও আপনার দ্বারা উপকৃত হবে, আপনিও ভালো থাকবেন।

দুই. ভাবনার বীজ বপন করতে হবে। ভাবনার বীজ হচ্ছে কাজ। এটা

নিয়ে একটা গল্প আছে। এক গ্রামে এক লোক ভাবল, তার অনেক টাকা হবে, খ্যাতি হবে, সুনাম হবে। অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু নতুন কিছুই তার জীবনে ঘটছে না। মন খারাপ হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত তার ধারণা হলো যে, আমার দ্বারা কিছু হবে না।

এর মধ্যে সেই গ্রামে এক সাধক এলেন। দূরদূরান্তে তার খ্যাতি ছিল। লোকটি সাধকের কাছে গেল। বলল, হুজুর, যখনই কোনো কাজ শুরু করতে যাই, আমার মনে ব্যর্থতার চিন্তা আসে। তাই কোনো কাজ শুরু করতে পারি নি। আমি কী করব যাতে সফল হতে পারি?

এর আগে লোকটি খালি ভেবেছে, কাজ করে নি। এখন কাজ করতে নিলেই তার মনে হয়, যদি ব্যর্থ হই, যদি না পারি!

সাধক পুরো ঘটনা শুনে বললেন, আজ তো হবে না। রাত হয়ে গেছে। কাল সূর্যোদয়ের সময় আমার কাছে আসবে। সূর্যোদয়ের সময় যখন লোকটি এলো, সাধক তাকে নিয়ে হাঁটতে বের হলেন। হাঁটতে হাঁটতে একটা ফসলি জমিতে নিয়ে গেলেন। মাঠ ভর্তি ফসল। সাধক বললেন, তুমি কি জানো কীভাবে এই জমিতে ফসল জন্মেছে? লোকটি বলল, জানি। ক্ষেতে নিশ্চয়ই প্রথম লাঙল চালানো হয়েছে, তারপর বীজ বপন করা হয়েছে, তারপর কেউ পানি দিয়েছে, অবশেষে ফসল জন্মেছে।

আরেকটু এগিয়ে গেলেন। একটা ফাঁকা জমিতে শুধু ঘাস। সাধক তাকে বললেন, তুমি কি বলতে পারো, ঘাস কীভাবে জন্মায়? লোকটা বলল, ঘাস তো এমনিতেই জন্মায়, এমনিতেই বেড়ে ওঠে। কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তখন সাধক তাকে বললেন, তোমার মনও ফাঁকা জমির মতো। যদি চিন্তার লাঙল, ভাবনার লাঙল, লক্ষ্যের লাঙল দিয়ে চাষ করো তাহলে এই মন, এই ব্রেন উর্বর হয়। যদি কাজ নামের বীজ বপন করো এবং মনোযোগ দাও, যত্ন নাও, তাহলে সুখ এবং সাফল্য আসবে। কিন্তু সেটাকে যদি ফাঁকা রাখো—ভাবনার লাঙল দিলে না, কাজের বীজ বপন করলে না, তাহলে কী হবে? আগাছা জন্মাবে। ঘাসের মতো নেতিবাচকতা এবং ব্যর্থতায় জমি ছেয়ে যাবে। নেতিবাচক চিন্তার জন্যে, ব্যর্থতার চিন্তার জন্যে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

তাহলে কী করতে হবে? লক্ষ্যটাকে সবসময় পরিষ্কার করতে হবে। আপনি ডাক্তার হতে চান, ইঞ্জিনিয়ার হতে চান, সমাজসেবক হতে চান, শিল্পপতি হতে চান, আপনার কী আছে এটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। শৈক্যর কি কিছু ছিল? সে তার ভাবনাটাকে শক্ত করেছিল। লক্ষ্যের বীজ বপন

করেছিল এবং সে এখন বুয়েটে পড়ছে।

যা হতে চান ভাবতে হবে যে, আপনি হয়ে গেছেন। ডাক্তার হতে চান, হয়ে গেছেন। ইঞ্জিনিয়ার হতে চান, হয়ে গেছেন। বিজ্ঞানী হতে চান, হয়ে গেছেন। এরপর আপনার চারপাশে কারা থাকবে—ডাক্তার থাকবে, ইঞ্জিনিয়ার থাকবে, বিসিএস ক্যাডার হতে চাইলে বিসিএস ক্যাডার থাকবে। বিচারপতি হতে চাইলে বিচারপতি থাকবে। দেখুন চারপাশে তারা আছে। কী বলছে তারা, অবলোকন করুন। কেমন অনুভূতি হয়েছে ডাক্তার হওয়ার পরে, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পরে, বিচারক হওয়ার পরে, শিল্পপতি হওয়ার পরে? লোকজন কী বলছে? কী শুনতে চান আপনি, অবলোকন করুন। কেমন অনুভূতি হচ্ছে চারপাশের বাতাসে? এখনকার বাতাস না, শিল্পপতি হলে, ইঞ্জিনিয়ার হলে, বড় এজলাসে বসলে যে-রকম বাতাস বইবে, সে-রকম বাতাসের ঘ্রাণ নিতে হবে। সেই শব্দগুলো শুনতে হবে।

ভালো মানুষের সাথে থাকতে হবে, সৎসঙ্ঘে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। আর আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি কী? মেডিটেশন। মেডিটেশনে যখন লক্ষ্য নিয়ে ভাববেন, সেটাই মনছবি। যেটা একেবারে গাইডেড মিসাইলের মতো লক্ষ্যভেদ করবে। যে চেয়ার আপনি কল্পনা করছেন, মনোজগতে ঐ চেয়ারে গিয়ে বসে পড়বেন। তাহলে ঐ চেয়ারে আপনি একদিন বসবেনই। যখনই সময় পান, মনে মনে বলবেন—আমি পারি, আমি করব।

একটা কাগজ নেবেন। যা হতে চান, লিখে রাখবেন—এই হতে চাই, আমার চারপাশে এরকম পরিবেশ দেখতে চাই। কাগজটা পকেটে রাখবেন। মাঝে মাঝে বের করে দেখবেন। ভাববেন যে, হয়ে গেছি! এবং ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবেন।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২২, কোয়ান্টামম

কোটা নয়
মেধায় বিশ্বাস রাখুন

নারীকে পেছনে রেখে কোনো জাতি কখনো এগোতে পারে না। একটা সময় ছিল যখন নারীদের কোটা নিয়ে আলোচনা হতো। এখন কোনো কোনো মহলে আলোচনা হচ্ছে পুরুষদের জন্যে কোটা দরকার কিনা! কারণ সব পর্যায়েই ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীরা লেখাপড়ায় ভালো করছে। অথচ আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, সত্তর আশি এমনকি নব্বইয়ের দশকেও পুরুষদের তুলনায় নারীরা অনেক পিছিয়ে ছিল।

স্বাধীনতার পর এদেশের গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক সম্পন্ন করা নারী শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল ২৬ ভাগ। অর্থাৎ ক্লাসে ১০০ শিক্ষার্থী থাকলে ৭৪ জন ছাত্র, ২৬ জন ছাত্রী এবং এই ২৬ জনের মধ্যে খুব হলে চার-পাঁচ জন ছাত্রী ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেত। সামাজিক কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অভাব-অনটনের কারণে অধিকাংশ মেয়েশিশু ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেত না। উচ্চশিক্ষা তো অনেক দূরের কথা!

দেশের অর্ধেক মানুষকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে কখনো এগোনো সম্ভব নয়। ইতিহাসে কোনো জাতি কখনো তা পারে নি। নব্বইয়ের দশক থেকে নারীশিক্ষার উন্নয়নে সরকারিভাবে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। সফলতায়ও নারীর

হার বেশি। মাদ্রাসাতেও ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর অংশগ্রহণ ১০ শতাংশ বেশি। উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায়ও নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমাবর্তনে স্বর্ণপদকজয়ী বা সর্বোচ্চ সিজিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই নারী। অর্থাৎ কোটা ছাড়াই নারীরা পুরুষের চেয়ে এগিয়ে গেছে। আমাদের স্বাধীনতার এ এক বিশাল অর্জন।

আমরা আনন্দিত কোথায়? ৩০ বছর আগে যখন আমরা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শুরু করেছিলাম, এখানে আমাদের মেয়েদের কোনো কোটা লাগে নি। একজন নারী যদি মেধা বিকাশের সুযোগ পায়, তাহলে মেধা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ফাউন্ডেশনে নারীরা এগিয়ে আছেন সবক্ষেত্রে। পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশেই অবদানে তারা পিছিয়ে নেই।

পৃথিবীতে নিজেকে বিকশিত করার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে একজন মানুষের মেধা, তার ব্রেন; কোটা নয়। যদি এই মেধাকে বিকশিত করার সুযোগ সে পায়, তাহলে তাকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। কোটা আসলে একজন মানুষকে হীনম্মন্য করে রাখে, ছোট করে রাখে। ও! সে-তো কোটা থেকে এসেছে! বুক ফুলিয়ে অন্যদের সামনে দাঁড়ানোর শক্তি তার কমে যায়। আমরা বিশ্বাস করি, মেধার কোনো জাত নাই, পাত নাই, ধর্ম নাই, বর্ণ নাই। সুযোগ পেলে যে-কেউ মেধা বিকাশ করতে পারে। কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটরা নিজেদের জীবনে সফলতা আনার মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল তা প্রমাণ করেছে। সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুরা যে সুযোগ পায়, আমরা শুধু তাদের সেই সুযোগ দিয়েছি লামার মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে বিদ্যুতের কোনো লাইন ছিল না। আমরা তাদের প্রত্যয় দিয়েছি—আজ তারা তাদের দক্ষতা নৈপুণ্য দেশবাসীর কাছে প্রদর্শন করছে।

খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় কিন্তু কোনো কোটা নেই, ওখানে কাজ করে শুধু মেধা। ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯—পর পর তিন বছর ক্রীড়ানৈপুণ্যে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল দেশের সেরা স্কুল হিসেবে মনোনীত হয়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত শিশু-কিশোর সমাবেশ ও কুচকাওয়াজে ২০১৫ থেকে ২০১৯, টানা পাঁচ বছর কোয়ান্টাম কসমো স্কুল প্রথম হয়েছে। সেটাও কোটা দিয়ে নয়, মেধায় মেহনতে পরিশ্রমে ও দক্ষতায়।

শুধু খেলাধুলায় নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রথম সারির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি মেডিকেল কলেজে তারা ভর্তি হচ্ছে কী দিয়ে? বিশ্বাস এবং মেধা! আমরা শুধু সুবিধাবঞ্চিত এই শিশুদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছি।

মেধা কখন বিকশিত হয়? যখন একজন মানুষ তার লক্ষ্যকে স্থির করতে পারে, লক্ষ্যে বিশ্বাস করতে পারে, ইতিবাচকভাবে ভাবতে পারে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মেহনত করতে পারে। কোনো মেহনতই তখন তার কাছে কষ্টকর মনে হয় না। আর যখন আপনি বড় কিছু পেতে চান, মেহনতটাও বড় করতে হবে। ৯টা ৬টা (সকাল থেকে সন্ধ্যা) কাজ করে কেউ কখনো বড় হয় নি। যারা বড় হয়েছেন, সফল হয়েছেন, খ্যাতিমান হয়েছেন, কীর্তিমান হয়েছেন, তারা কমসে কম ৬টা থেকে ৯টা (ভোর থেকে রাত) পর্যন্ত কাজ করেছেন, মেহনত করেছেন। আসলে কেউ যখন লক্ষ্য স্থির করে মনপ্রাণ দিয়ে কিছু চায় এবং সে পথে নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এগোতে শুরু করে, তখন লক্ষ্য তার দিকে এগিয়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে নেয়।

সুযোগ পেলে একজন মানুষ যে কতদূর যেতে পারে বাবা আম্বেদকর তার প্রমাণ। বাবা আম্বেদকর ছিলেন দলিত শ্রেণির। উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে অচ্ছুৎ। যখন স্কুলে ভর্তি হলেন, অন্য ছাত্রদের সাথে তাকে বেঞ্চে বসতে দেয়া হতো না। একটা চটের বস্তার ওপর বসতেন। স্কুল শেষে সেই বস্তা আবার বাড়ি নিয়ে যেতে হতো। কেন? অন্য কেউ ভুল করে ঐ বস্তা ছুঁয়ে ফেললে তার জাত চলে যেতে পারে!

পানির তৃষ্ণা পেলে কলসি থেকে পানি ঢেলে খাওয়ার অনুমতি আম্বেদকরের ছিল না। স্কুলের কেরানি কলসটা উপুড় করে ধরত, আজলা ভরে পানি পান করতেন আম্বেদকর। কোনো কারণে কেরানি উপস্থিত না থাকলে সেদিন যত তৃষ্ণাই লাগুক, পানি আর পান করা হতো না তার। কারণ দলিত শ্রেণির আম্বেদকর কলস ধরলে এই কলস থেকে উচ্চবর্ণের কেউ আর পানি পান করতে পারবে না! অশুচি হয়ে যাবে তাদের। একবার প্রচণ্ড তৃষ্ণায় স্কুলের কলস থেকে লুকিয়ে পানি পান করতে গিয়ে ধরা পড়েন। তাকে বেদম পেটায় শিক্ষকেরা। পরবর্তী জীবনে No peon, No water শিরোনামে একটি লেখায় মর্মস্পর্শী এই ঘটনাটি তিনি বর্ণনা করেন।

হাই স্কুলে সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে সংস্কৃত ভাষা পড়ানো হতো। ব্রাহ্মণ শিক্ষকরা তাকে পড়াতে রাজি হলেন না। তারা সাফ জানিয়ে দিলেন, নিচু জাতের আম্বেদকরকে পবিত্র বেদের ভাষা সংস্কৃত শেখালে তাদের পাপ হবে। বাধ্য হয়ে আম্বেদকর ফার্সি ভাষা শিখলেন। পদে পদে এরকম উপেক্ষা আর লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু তিনি দমে যান নি। তার সামনে লক্ষ্য ছিল। লক্ষ্যে অটল ছিলেন এবং লক্ষ্যের জন্যে যে-কোনো মেহনত, যে-কোনো প্রতিকূলতা হাসিমুখে সহ্য করার শপথ নিয়েছিলেন।

আম্বেদকর হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় যিনি লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকস ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়—দুই জায়গা থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে তিনিই ভারতের সংবিধান প্রণয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। বাবা আম্বেদকর কি কোটার জোরে ভারতের সংবিধান প্রণেতা হয়েছিলেন? যখন মানুষ মেধাকে ব্যবহার করে ও মেহনত করে, তখন যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, দক্ষতা সৃষ্টি হয়। এই যোগ্যতা এবং দক্ষতাই তাকে সফল করেছে।

২০১৫ সালে হার্ভার্ড ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ' রিপোর্ট তৈরি করে। সেই প্রতিবেদনে উঠে আসে—রাষ্ট্র ক্ষমতায় নারীর অবস্থান বিবেচনায় সবাইকে পেছনে ফেলে বিশ্বের এক নম্বর দেশ হলো বাংলাদেশ!

কেউ স্বপ্ন দেখেন, কেউ স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেন। শত বছর আগে বেগম রোকেয়া স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার লেখার নাম ছিল *সুলতানার স্বপ্ন*! সুলতানার স্বপ্ন এখন আর আকাশকুসুম কল্পনা নয়। আজ বাংলাদেশে সংসারের ভেতরে ও বাইরের কাজের মূল্য ধরা হলে জিডিপিতে নারীর অবদান ৪৮ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের অবদান বলা যায় সমানে সমান। ৩৯০ বছরের পুরনো গণতন্ত্র ব্রিটেনে। সেখানে নারী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আজও কোনো নারী রাষ্ট্রপ্রধান হন নি। আর বাংলাদেশের বয়স ৫০ বছর। এর মধ্যে ২৮ বছর সরকার প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন নারী!

কোটার চিন্তাটাই বৈষম্যকে দীর্ঘস্থায়ী করে। হয়তো বৈষম্য দীর্ঘস্থায়ী করতেই কোটা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। কোটায় সুযোগ পাওয়ার চিন্তা একজন মানুষের সম্ভাবনাকে সবসময় সীমিত করে ফেলে। একজন মানুষের বিকাশের জন্যে প্রয়োজন সমান সুযোগ। এই সুযোগকে তিনিই কাজে লাগাতে পারেন, যিনি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারেন। এই আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে, ইতিবাচক ভাবনার জন্যেই মেডিটেশন।

যখন একজন মানুষ নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করেন, তখন তার ভেতরে করতে পারার শক্তি জাগ্রত হয়। তার আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে। তার ভাবনায় দানা বাঁধতে থাকে—আমি পারি, আমি করব! যখন মনে এই ভাবনা দানা বাঁধে, ব্রেন সেই লক্ষ্যেই কাজ করতে শুরু করে। মেডিটেশন মূলত ব্রেনের বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করার একটা সুন্দর মাধ্যম।

মানুষের ব্রেনের কার্যক্ষমতা কত? ব্রেনে তথ্যের ধারণক্ষমতা কত? নিউরোসায়েন্টিস্টদের ভাষায় বলা যায়, সারা পৃথিবীর যত ডিজিটাল কন্টেন্ট আছে তা একজন মানুষের ব্রেনেই ধারণ করা সম্ভব! ব্রেনের তথ্য ধারণক্ষমতা হচ্ছে ২০০ এক্সাবাইট। ১০ লক্ষ টেরাবাইটে এক এক্সাবাইট। এরকম ২০০ এক্সাবাইট তথ্য ধারণ করতে পারে এই ব্রেন।

মেডিটেশন হচ্ছে এই ব্রেনেরই ব্যায়াম। নিউরোসায়েন্টিস্টরা বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন, দৌড়ালে যেমন মানুষের পায়ের পেশির শক্তি বাড়ে, দমচর্চা করলে ফুসফুসের শক্তি বাড়ে, সাঁতার কাটলে কাঁধ এবং হাতের শক্তি বাড়ে, একইভাবে নিয়মিত মেডিটেশন করলে ব্রেনের সিঙ্গুলেট কর্টেক্স-এ গ্রে ম্যাটার বাড়ে, যা একজন মানুষের গভীর মনোযোগ দেয়ার সামর্থ্য বাড়ায়। নিয়মিত মেডিটেশন চর্চায় ব্রেনের হিপোক্যাম্পাস বিস্তৃত হয়, যা স্মৃতিশক্তি সতেজ ও শাণিত করে। ব্রেনের ইনসুলার কর্টেক্স ও লেফট প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স-এ পরিবর্তন আসে, যা অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও আবেগের ভারসাম্য বজায় রাখে।

কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশনের ৩০ বছরের চর্চায় আমরা দেখেছি, মেডিটেশন দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি এবং নিরাময় ক্ষমতাকে সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় করে। মেডিটেশন একজন মানুষকে প্রশান্ত বিশ্বাসী সাহসী সমমর্মী করে তোলে। তাই নিজের মেধা বিকাশের জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করুন, পরিচিতদের মেডিটেশন চর্চায় উদ্বুদ্ধ করুন।

নিয়মিত সাদাকায়নে অংশ নিন এবং ইতিবাচক, বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী মানুষের সাথে যোগাযোগ বাড়ান। যত আপনি পরিশ্রমী মানুষের সাথে মিশবেন তত আপনার পরিশ্রম করার আগ্রহ বাড়বে। আপনার নিজের মেধার ওপরে, কর্মক্ষমতার ওপরে বিশ্বাস বাড়বে। তাহলেই আমাদের ভালো মানুষ, ভালো দেশের স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন থাকবে না, বাস্তবতায় রূপ নেবে।

৫ আগস্ট ২০২২, ঢাকা

তারুণ্যে জেগে উঠুক সমমর্মিতা

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তিতে পরম করুণাময়ের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সবটাই তাঁর দয়া, তাঁর করুণা। পৃথিবীর ইতিহাসে এত অল্প সময়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে কোনো জাতি স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে নি।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল শহিদ ও বীরদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তরুণদের ভূমিকা, তরুণদের সাহসিকতা আমাদের বীরত্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে সবসময় জ্বলজ্বল করবে। স্বাধীনতার জন্যে, একটি ফুলকে বাঁচানোর জন্যে তারা যুদ্ধে গিয়েছিল। দেশ ও মাতৃকার জন্যে অকাতরে প্রাণ দিয়েছিল। তারা প্রাণ দিয়েছিল বলেই স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা আমাদের অবস্থানকে সগৌরবে সংহত করতে পেরেছি। তাদের জীবনে লক্ষ্য একটিই ছিল—দেশকে, দেশের মানুষকে, দেশের সংস্কৃতিকে, মানবতাকে সমুন্নত রাখতে হবে। এই তরুণদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক কিশোরও অংশ নিয়েছিল। আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিলগ্নে সেই তরুণদের উত্তরসূরি কেউ কেউ যখন তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে বা অকারণ বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, তখন প্রতিটি সচেতন হৃদয় ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

এর মধ্যে সংবাদপত্রে একটি খবর দেখলাম। টাঙ্গাইলের সখিপুর। সকাল পৌনে ৯টায় এসএসসি পরীক্ষার্থী মেয়েকে নিয়ে সখিপুর পাইলট বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে যান সালমা বেগম। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানীয়রা দেখেন, তার একমাত্র ছেলের লাশ ঝুলছে! ছেলের নাম আশিক আহমেদ।

বয়স ১৩। সে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার বাবা মালয়েশিয়া প্রবাসী। সালমা বেগম দুই সন্তানকে নিয়ে গ্রামে থাকেন। তিনি জানান, আশিক বেশিরভাগ সময় তার মুঠোফোনে গেম খেলত। আজ সকালে মেয়েকে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় আশিক মায়ের মুঠোফোনটি বাসায় রেখে যাওয়ার জন্যে বায়না ধরে, কিন্তু তিনি ফোন নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে চলে আসেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আশিককে কান্না করতে দেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পর আশিকের দাদি পাশের রুমে গিয়ে দেখেন, গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় আশিকের লাশ ঝুলে আছে! পরে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। আশিকের স্বজনেরা ধারণা করছেন, মায়ের কাছে মুঠোফোন না পেয়ে আশিক ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্যে মুঠোফোন ও গেম একধরনের নেশা। মুঠোফোনের নেশায় আসক্ত হয়ে অনেক কিশোর-কিশোরী আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

তুচ্ছ কারণে গত ছয় মাসে ৭,৩৯১ জন আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যাকারীদের ২৫ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম। ১৮ বছর বয়সী জয়চন্দ্র দাস নামে এক কিশোর বাবার কাছে মোবাইল ফোন চায়। কিনে না দেয়ায় আত্মহত্যা করে জয়চন্দ্র! একইভাবে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়িতে মোবাইল ফোন কিনে না দেয়ায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে অটোভ্যান চালকের ছেলে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আপন মিয়া! বয়স ১০ বছর। মা বকা দেয়ায় রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে আত্মহত্যা করে মাদ্রাসা ছাত্র তরিকুল! বয়স ১৬। মোবাইল ফোন কিনে না দেয়ায় আত্মহত্যা করে কলেজ ছাত্রী ছাবেকুন নাহার জেবিন! বয়স ১৭। মেয়ের অতিরিক্ত মোবাইল আসক্তির কারণে মা বকা দেয়ায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে এসএসসি পরীক্ষার্থী ফাতেমা আক্তার!

মোবাইল কিনে না দেয়া, সামান্য বকাঝকা—এরকম তুচ্ছ কারণে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। শুধু কিশোর-কিশোরী নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মধ্যেও আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। গত আড়াই মাসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। এসব কিশোর-তরুণদের আত্মহত্যা ও সহিংসতা কারণগুলো একইরকম।

প্রথমত, পরিবার বিচ্ছিন্নতা। অনেক শিশুই এখন পরিবারের অংশ হিসেবে বেড়ে উঠছে না। পরিবারে বাবা অথবা মা, কারো কাছ থেকেই সে

প্রয়োজনীয় মনোযোগ পাচ্ছে না। সে দামি খেলনা, মোবাইল, বিলাসী পণ্য—যা চাচ্ছে অনেক সময় সবই পাচ্ছে। যা পাচ্ছে না তা হলো মা-বাবার প্রয়োজনীয় মনোযোগ। সন্তান কার সাথে মিশছে, অনেক মা-বাবাই সে খবর রাখেন না।

দ্বিতীয়ত, করোনাকালে সমাজে বড়সড় কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেক কিছু প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে গেছে। ফেসবুক টিকটক ইনস্টাগ্রাম জাতীয় প্ল্যাটফর্মে আপত্তিকর হয়রানিমূলক কমেন্ট কিশোর-কিশোরীদের বিষণ্ন কিংবা সহিংস করে তুলছে।

তৃতীয়ত, ভোগ-বিলাসিতা ও পণ্যাসক্তি বেড়ে গেছে। মা-বাবা অর্থ উপার্জনে যে-রকম ব্যস্ত, বিলাসীপণ্য সংগ্রহেও ব্যস্ত। সন্তানকে ভালো মানুষ নয়, বিত্তশালী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে তারা বেশি আগ্রহী এবং তারই চড়া খেসারত এখন সমাজ দিচ্ছে।

চতুর্থত, স্কুল-কলেজে বিনয় শুদ্ধাচার নৈতিক শিক্ষার ওপর এখন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ভালো গ্রেড কিংবা নাম্বারই শিক্ষার শেষ কথা।

পঞ্চমত, কিশোর-তরুণদের সামনে এমন কোনো মানুষ বা রোল মডেল নেই, যাকে সে অনুসরণ করবে, যার জীবনে একটা আদর্শ আছে, যে শুধু নিজের জন্যে কাজ করে না, অর্থ গ্ল্যামার ক্ষমতার জন্যে দিশেহারা নয়, বরং মানুষের কল্যাণের জন্যে, সমাজের কল্যাণের জন্যে, দেশের মঙ্গলের জন্যে কাজ করে। সর্বোপরি করোনার প্রভাবে দীর্ঘসময় ঘরবন্দি থাকায় নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে কিশোর ও তরুণেরা। যারা স্কুল-কলেজে পড়ছে, তারা অবসন্ন। কোনোকিছুতে আগ্রহ পাচ্ছে না। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে, তারা হতাশ শঙ্কিত। কেউ-বা বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক চাপ সইতে না পেরে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সত্যিকারভাবে মূল্যায়িত হতে না পেরে হতাশ হয়ে জীবন থেকে বিদায় নিচ্ছে চিরতরে।

এমনি এক তরুণ মাসুদ আল মাহাদী অপু। তার শিক্ষক লিখেছেন—সত্যিকার মেধাবী ছাত্র ছিল সে। রেজাল্টও ভালো করত। তবে গতানুগতিক ভালো রেজাল্টধারীদের মতো ক্লাসে সে নিয়মিত ছিল না। সে প্রশ্ন করত, প্রতিবাদ করত। অনার্সে সে থার্ড হয়েছিল। অনার্সের রেজাল্টের পর একদিন অপুকে বললাম, মাস্টার্সের একবছর বাড়তি একটু মনোযোগ দিলেই তুমি প্রথম হতে পারবে। সে বলল, আমি তো প্রথমই হতাম অনার্সে। হিসাব করে দেখেছি, মাত্র একজন শিক্ষক সেই প্রথম বর্ষ থেকে কম নম্বর দিয়ে আসছেন। ওনার কোর্সে এভারেজ নম্বর পেলেই প্রথম হতাম।

অপুর আত্মহত্যার পেছনে সিস্টেমের দায় নিয়ে তিনি আরো লিখেছেন, অপু আত্মহত্যা করেছে শুনছি। সিস্টেম কীভাবে প্রখর এক তরুণকে এদিকে ঠেলে দিতে পারে তার একটি উদাহরণ দিলাম। যে-সব শিক্ষার্থী প্রশ্ন করত, ঐ শিক্ষক সাধারণত তাদের অপছন্দ করেন এবং বেছে বেছে ভিক্টিমাইজ করেন। তিনি আবার সব ধরনের ভিসির প্রিয়পাত্র। ফলে তিনি এসব করে পারও পেয়ে যান। স্নাতকোত্তর শেষে অপু সরকারি চাকরির পরীক্ষায় প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে। বছরখানেকের অক্লান্ত প্রস্তুতির পর সফলতা না পেয়ে হতাশার কাছে হার স্বীকার করে নেয়। ২৭ সেপ্টেম্বর মাসুদ আল মাহাদী অপু ২৬ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে!

বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পরীক্ষা ছিল তার জীবনের শেষ চাকরি পরীক্ষা। ১৮ নভেম্বর বিএসইসির ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক খেয়াল করলেন, যে ছেলেটি এমসিকিউ ও রিটেন পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে সে ভাইভা দিতে আসে নি। তিনি সংশ্লিষ্টদের বললেন, ঐ নিয়োগপ্রার্থীকে ফোন দিতে। তারা জানায়, ছেলেটা গত মাসে মারা গেছে। তিনি তালিকার নামটা ভালোভাবে পড়ে দেখলেন। ছেলেটার নাম মাসুদ আল মাহাদী অপু, তার প্রিয় ছাত্রদের একজন! অপুর এক বন্ধু বলেন, অনেকগুলো চাকরির পরীক্ষায় প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ হলেও সেগুলো দীর্ঘসূত্রিতার কবলে পড়ে। পরিবারের অবস্থা, দেশের অবস্থা নিয়েও চিন্তিত থাকত অপু। এসব নিয়ে হতাশা তার আত্মহত্যায় ভূমিকা রাখতে পারে।

অপুর জন্যে সবার মন ব্যথিত হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে অপুকে যদি মানসিকভাবে আরেকটু শক্তিশালী করা যেত, তার সংগ্রামী চেতনার সাথে যদি আরেকটু ধৈর্যের সংযোগ ঘটানো যেত, তাকে যদি আরেকটু আশাবাদী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যেত বা সে যদি আশাবাদী মানুষের সংস্পর্শে থাকত, সে যদি সৎসঙ্ঘে একাত্ম থাকত, তাহলে হয়তো-বা সমাজ আরো সফল, আরো উজ্জ্বল, আরো বর্ণাঢ্য অপুকে পেয়ে উপকৃত হতো।

অপু তো তবুও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছে, কিন্তু আজকাল তুচ্ছ কারণে অভিমান করে কিশোর-কিশোরীদের আত্মহত্যার প্রবণতা—এজন্যে একটি বিষয়কে যদি দায়ী করা যায় সেটা হচ্ছে, ভুল প্যারেন্টিং। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের অভিমানী হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু যে হারে তারা আত্মঘাতী হচ্ছে, কোনোকালে এমনটা হয় নি। ভুল প্যারেন্টিংয়ের কারণে কিশোর-তরুণরা মানসিকভাবেই নাজুক হয়ে বেড়ে উঠছে। অল্প

চাপেই তারা ভেঙে পড়ছে। আসলে মা-বাবা এখন সাপ্লায়ার হয়ে গেছে। সন্তান রিকুইজিশন দিচ্ছে, মা-বাবা সেই জিনিস হাজির করছে।

চাওয়ামাত্র পেয়ে গেলে তার প্রতি মমত্ব বা দায়িত্ব কখনো জন্মায় না। জিনিসটা সংগ্রহ করতে যে মা-বাবার পরিশ্রম করতে হয়, সেই বোধই তার মধ্যে তৈরি হচ্ছে না। ফলে কোনো কারণে তার প্রত্যাশা পূরণ না হলেই সে তীব্র অভিমান করছে। কেউ কেউ আত্মঘাতী হচ্ছে। কারণ চাপ কীভাবে সামলাতে হবে তা সে পরিবার থেকে শেখে নি।

কোয়ান্টামে আমরা ৩০ বছর ধরেই অভিভাবকদের সতর্ক করে আসছি যে, সন্তানকে ননীর পুতুল বানাবেন না। সন্তানকে পরিবারের অংশ হিসেবে বড় করুন। পরিবারের সব কাজের সাথে তাকে সংযুক্ত রাখুন। আপনার কষ্ট, আপনার অভাব, আপনার প্রয়াস, আপনার সংগ্রামের কথা অকাতরে সন্তানকে বলুন। আপনার সাথে সাথে তাকেও কষ্ট করতে শেখান। যদি আপনি জীবিত অবস্থায় তাকে কষ্ট করতে না শেখান, তবে সে কষ্ট করবে আপনার মৃত্যুর পর। আর এখন অনেক ক্ষেত্রেই আপনার মৃত্যু পর্যন্ত সে অপেক্ষা করছে না। যে-কোনো না পাওয়ার মুখে ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য ও দৃঢ়তা কোনোটাই তার নেই। ফলে তার মনোবল খুব ঠুনকো হয়।

সন্তানের শারীরিক মানসিক সামাজিক আত্মিক ফিটনেস যেন যথাযথভাবে গড়ে ওঠে, সেজন্যে অভিভাবক ও সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তরুণরা যথাযথ দিক-নির্দেশনা পেলে তারা মানুষের হৃদয়কে কীভাবে জয় করতে পারে, একটি ঘটনা দিয়ে আমরা আমাদের আজকের আলোচনার উপসংহার টানব। একটি চিঠি। এক শিক্ষিকা তার স্যারকে লিখছেন—

'সাত সকালে কোয়ান্টাম থেকে ফোন এসেছে। আম্মুর কথা জিজ্ঞেস করল। বলল, আজকে ওনার মৃত্যুবার্ষিকী। ওনার ছেলেমেয়েরা সবাই কেমন আছে? ওদের অমায়িকতায় আমি মুগ্ধ! ঐ সময়টায় রোজ ২০-৩০টা করোনার লাশ ওরা দাফনের ব্যবস্থা করত। তা-ও ওরা মনে রেখেছে। নিশ্চয়ই সবাইকে ফোন দিচ্ছে। মানুষ অনেক কিছুই বলে কোয়ান্টাম নিয়ে, কিন্তু ওরা আমাদের যে কাইন্ডনেসটা দেখিয়েছে, আর কেউ দেখায় নি। কত আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী—যাদের সাথে আম্মুর ঘনিষ্ঠ ওঠাবসা ছিল, সেই দিন থেকে শুরু করে আর কোনোদিন খোঁজ নেয় নি।

ভর করোনার সময় আম্মুর ইন্তেকালের পর আধাঘণ্টায় কোয়ান্টাম উপস্থিত হয়েছিল হসপিটালে। যদিও ওরা আমার চাচির ভাইয়ের রেফারেন্সে এসেছিল, কিন্তু সাথে সাথেই তো এসেছিল। এত্তগুলো মেয়ে দৌড়ে দৌড়ে

আম্মুর গোসল কাফন সব চোখের পলকে শেষ করেছে।

একটা সুপারভাইজার ছেলে ছিল। কী সুন্দর করে আমাদের সাথে কথা বলছিল! বার বার আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। আমি বার বার এই প্রশ্ন সেই প্রশ্ন করছিলাম। সে ধৈর্য ধরে জবাব দিচ্ছিল। ঐ সময় মাথা কাজ করছিল না। তা-ও খেয়াল করেছিলাম—ছেলেটার জুতাটা ছেঁড়া। খুব মায়া লাগছিল। বাসায় এসে কয়েকদিন পর নাশিদকে বলছিলাম, ছেলেটার নাম্বার কই? ওকে একটা জুতা গিফট করতে চাই। এত অচেনা মানুষকে যে ভালবাসা দেয়, সে নিজেও তো কিছু ভালবাসা ডিজার্ভ করে। ওর নাম্বার আর পাই নি। বিপদের সময় কেউ নাম্বার রাখে নি। ছেলেটা হারিয়ে গিয়েছিল। হয়তো জুতার চেয়েও অনেক দামি জিনিস ও সবার কাছে পায়। সেটা হচ্ছে মানুষের দোয়া!'

দাফনসেবায় নিয়োজিত শত শত তরুণ-তরুণীর একজন এই তরুণ। মাকে হারানোর মুহূর্তেও এই শিক্ষিকা সেই তরুণের হৃদয়ের উষ্ণতা ও সমমর্মিতা ভুলতে পারেন নি। যারা ঐ সময়ে একইভাবে কাউকে পাশে পেয়েছে, কারো মমতা পেয়েছে তারা কেউই আসলে ভোলেন নি। তাদের দোয়া এই স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি সবসময়ই অম্লান। তাদের দোয়ার ফলেই আমরা আমাদের সেবামূলক কাজগুলো এত অনায়াসে করতে পারছি।

মানুষ মারা যায় কিন্তু কাজ বেঁচে থাকে, স্বপ্ন বেঁচে থাকে, বীর বেঁচে থাকে। সমমর্মিতা স্মৃতিতে সবসময় জ্বলজ্বল করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের একটি গান ছিল—'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি!' আসলে হাজার হাজার মানুষের সেবামূলক কাজের প্রস্ফুটিত রূপ হচ্ছে কোয়ান্টাম। ঐ তরুণের জুতাটা ছেঁড়া ছিল, কিন্তু তার সেবা তার সাথে সাথে কোয়ান্টামকে মানুষের অন্তরে নতুন উচ্চতায়, নতুন মর্যাদায় নিয়ে গেছে। আমাদের সেবামূলক কাজগুলোকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করে জাতিকে ইতিবাচকতার নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে চাই আমরা। এ প্রত্যয়েই বিজয়ের ৫০ তম বছর পূর্তি উদযাপন করতে চাই।

৩ ডিসেম্বর ২০২১, ঢাকা

সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব আপনার

একজন মায়ের একটি চিঠি পড়ে শোনাই। তিনি লিখেছেন—

"শ্রদ্ধেয় গুরুজী! আসসালামু আলাইকুম। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! বেশ ভালো আছি। শুধু মেয়ের শরীরটা কম ভালো যাচ্ছে। হালকা জ্বর। ওষুধ দেয়ার মতো নয়, কিন্তু মানসিকভাবে সে ভালো নেই। গত দু-দিন ধরে অদ্ভুত আচরণ করছে। সে নাকি স্বপ্নে দেখেছে—তার বাবাকে বাঘ খেয়ে ফেলছে। ঘুম থেকে জেগেই কান্না। বার বার শুধু বলে, 'মা! তোমাদের ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। তুমি দোয়া করো যেন আমরা সবাই একসাথে মারা যাই। মায়ের দোয়া তো আল্লাহ কবুল করেন।' এই মৃত্যুচিন্তা থেকেই ওর যত সমস্যা হচ্ছে। এর সাথে যোগ হয়েছে দুটো কার্টুন, যা কিছুটা ভয়ংকর।

গুরুজী, আমার বাসায় টিভি নেই, কিন্তু আম্মুর বাসায় দিনের বেলা দু-ঘণ্টা টিভি দেখে, যখন আমি থাকি না। এসময় আমি এসব কার্টুন দেখতে নিষেধ করলেও সে দেখেছে। পরিণতি হচ্ছে এখনকার ভয়। এখন আমাকে সে বলছে, 'মা, তুমি আমাকে মার দিয়ে হলেও এসব কার্টুনের আগ্রহ কমাতে পারতে।' বললাম, মারলে তোমার আগ্রহ কমত না। তারপর আবার কান্না যে, 'গুরুজীকে লিখে দাও যেন আমার ভয় চলে যায়।' আপনি দোয়া করবেন। আমার মেয়ে এখন নিজে থেকেই স্ক্রিন টাইম বাদ দিতে চাইছে।"

নিঃসন্দেহে মা হিসেবে আপনি ভাগ্যবান যে, আপনার সাড়ে ছ-বছরের মেয়ে নিজেই স্ক্রিন থেকে সরে আসতে চাচ্ছে। আমাদের দোয়া থাকছে, সে যেন স্ক্রিন থেকে সরে আসতে পারে। সব ধরনের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে সাহসী সৃজনশীল সফল মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয় সৃষ্টি করতে পারে। এই শিশুটি নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান যে, তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা, অস্থিরতার কথা,

সমস্যার কথা মাকে অবলীলায় বলতে পেরেছে। মায়ের প্রতি তার বিশ্বাস তাকে মানসিক অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু আমাদের দেশের হাজার হাজার শিশু-কিশোরের কী অবস্থা তা আঁচ করা যায় ২৫ অক্টোবর ২০২১ সালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে। রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে ৪২৪ জন কিশোরী নিখোঁজ হয়েছে। এদের একটি বড় অংশ মা-বাবার সঙ্গে অভিমান করে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরিচয় ও সম্পর্কের কারণে বন্ধুর সঙ্গে ঘর ছেড়েছে।

নিখোঁজ হওয়া কিশোরীদের বেশিরভাগই ষষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। এক মেয়ের বাবা সাংবাদিককে জানান, মেয়েকে সবসময় শাসনের মধ্যেই রেখেছি, কিন্তু পরিবর্তনটা এসেছে মেয়েকে স্মার্টফোন দেয়ার পর। অনলাইনে স্কুলের ক্লাস করার জন্যে তাকে ফোন দিতে হয়েছে।

সাংবাদিক সরেজমিনে ২০ জন অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলেছেন। অভিভাবকরা জানান, করোনা পরিস্থিতির কারণে গত দেড় বছর স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ ছিল। পরীক্ষা, পড়া, কোচিং-সহ সবই চলছে অনলাইনে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নির্দেশনার কারণে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের সবার হাতে মোবাইল ফোন দিতে হয়েছে। লেখাপড়ার ফাঁকে তারা বিভিন্ন গেমসের প্রতি যেমন ঝুঁকেছে, তেমনি সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকের মাধ্যমে চেনা-অচেনা বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে।

শিক্ষার্থীদের ওপর পরিচালিত এক গবেষণার ফলাফল হচ্ছে, করোনাকালে দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের ৮৪ শতাংশ মানসিক সমস্যায় ভুগেছেন। তাদের চার ভাগের তিন ভাগ শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। এসময়ে গ্রামে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি দেখা গেছে।

মানসিক সমস্যা বেশি হয়েছে নারী শিক্ষার্থীদের। সমস্যাগ্রস্ত এসব শিক্ষার্থীর একটা বড় অংশ নিয়মমতো ঘুমাতে যান না। তারা মুঠোফোন ল্যাপটপ ও কম্পিউটারের সামনে বেশি সময় কাটান। যারা দিনে সাত ঘণ্টার বেশি সময় পর্দার সামনে কাটিয়েছেন তাদের অধিকাংশই বিষণ্নতায় ভুগছেন। ডিজিটাল মাদকের আগ্রাসন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখন শুধু অস্থিরতা হতাশা বিষণ্নতাই নয়, আরেক মারাত্মক সমস্যা তরুণরা মোকাবেলা করেছেন—অনলাইন বুলিং।

এক জরিপে উঠে এসেছে, ৮৫ শতাংশ তরুণ বলছেন, তাদের জন্যে অনলাইন বুলিং মারাত্মক সমস্যা। এই তরুণরা সাধারণত অনলাইন বুলিংয়ের

শিকার হচ্ছেন তিন মাধ্যমে : সোশ্যাল মিডিয়া—ফেসবুক, মেসেজিং অ্যাপস, অনলাইন ও ভিডিও গেম স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম।

আমরা তো সমস্যার কথা শুনছি, কিন্তু এই সমস্যা থেকে বেরুনোর পথ শোষক বেনিয়ারা আপনাকে কখনো করে দেবে না। কারণ আপনাকে যত ডিজিটাল মাদকে আসক্ত রাখা যাবে, বেনিয়াদের মুনাফা তত বাড়বে। আপনি শোষণে শোষণে রোগেশোকে সর্বস্বান্ত হবেন। আর তারা মুনাফায় ফুলে-ফেঁপে উঠবে। এজন্যে প্রথম পদক্ষেপ আপনাকেই নিতে হবে। আর এই প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে—সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বের হয়ে আসা।

পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, ফেসবুক সাধারণ জনগণের জীবনের চেয়ে মুনাফাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। যেমন সিগারেট কোম্পানিগুলো গোপন করেছিল তামাকের ক্ষতির কথা, তেমনি ফেসবুকও গোপন করেছিল জীবনবিধ্বংসী ক্ষতিকর দিকগুলোর কথা।

সন্তানকে ভালো মানুষ বানাতে হলে ভালো মা-বাবা হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। সন্তানকে সম্মান করতে হবে। তাকে পাশে বসাতে হবে। মন খুলে কথা বলতে হবে। তাদের কথা শুনতে হবে। আপনি যখন আপনার কথা তার সাথে শেয়ার করবেন, সন্তানও তখন ভেতরে চেপে রাখা যন্ত্রণাগুলো ধীরে ধীরে বলতে চাইবে আপনাকে।

শুধু আদর নয়, সন্তানকে কীভাবে সম্মান করতে হয় সেই দৃষ্টান্ত নবীজী (স) আমাদের সামনে রেখে গেছেন। নবী-নন্দিনী ফাতিমা (রা) যখন নবীজীর (স) কাছে আসতেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সম্ভাষণ জানিয়েছেন, চুমু দিয়ে নিজের জায়গায় বসিয়েছেন!

প্রযুক্তি এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন প্রযুক্তিপণ্যের বেনিয়ারা। প্রযুক্তিপণ্যের শীর্ষ বেনিয়া বিল গেটস এবং স্টিভ জবস। সারাবিশ্বের মানুষের মাঝে প্রযুক্তিপণ্য ছড়িয়ে দিলেও নিজের পরিবারে তাদের ভূমিকা ছিল একেবারেই উল্টো। বিল গেটস তার মেয়ের কম্পিউটার ব্যবহারের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন দিনে মাত্র ৪৫ মিনিট! ১৪ বছর বয়সের আগে স্মার্টফোন শুধু নয়, মোবাইল ফোন ব্যবহারেও ছিল নিষেধাজ্ঞা। স্টিভ জবস তার সন্তানদের জন্যে আইপ্যাড ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাদের অবস্থা ছিল মাদকের ব্যাপারীদের মতোই। মাদক ব্যবসায়ীরা অন্যকে মাদক খাওয়ায়, কিন্তু নিজেরা খায় না।

অতএব আমরা নির্দ্বিধায় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে পারি। বিল গেটস, স্টিভ জবস তাদের সন্তানদের আইপ্যাড বা মোবাইল দেন নি,

সেখানে আমরা অনলাইন শিক্ষার নামে যেন স্কুলের কিশোর-কিশোরীদের হাতে স্মার্টফোন তুলে না দেই। এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ স্মার্টফোনের অপব্যবহার থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করবে।

মা-বাবা হিসেবে সন্তানকে যেভাবে আদর করবেন, যেভাবে সম্মান করবেন, একইভাবে তার সামনে বড় কিছু করার, মহৎ কিছু করার, সফল হওয়ার একটি লক্ষ্য তুলে ধরুন। আস্তে আস্তে তাকে সেই লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করুন। একবার যদি সন্তান লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়, বাকিটা সে নিজেই করবে।

আমরা জানি, রাইট ব্রাদার্স ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন বিমানের আবিষ্কারক হিসেবে। খুব সাধারণ ঘটনা থেকে অসাধারণ বিষয়ের সূত্রপাত হয়েছিল। তখন অরভিল রাইটের বয়স ছিল মাত্র সাত। আর উইলবার রাইটের বয়স ছিল ১১ বছর। তাদের বাবা তাদের একটি খেলনা এনে দিয়েছিলেন। খেলনাটি তারা ভেঙে ফেলে। তখন দুই ভাই মিলে সেটাকে আবার ঠিকঠাক করে ফেলে। প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ দেখে মা-বাবা তাদেরকে স্বপ্ন দিলেন যে, এমন বাহন বানাতে যা আকাশে উড়বে। বছরের পর বছর পার হয়েছে। যত দিন যায় দুই ভাইয়ের মাথায় সেই স্বপ্ন বড় হতে থাকে এবং গত শতাব্দীর শুরুতে তারা প্রথমবারের মতো বিমান নির্মাণ করেন।

ছোটবেলার সেই স্বপ্ন এমনভাবে তাদের ভেতর গেঁথে গিয়েছিল যে, সেই স্বপ্ন কখনো তাদের চোখের আড়াল হয় নি। ফলে বিমানের আবিষ্কারক হিসেবে ইতিহাসের পাতায় তারা তাদের নাম লিখে গেছেন। তাই সন্তানকে ছোট বয়সেই একটি লক্ষ্য দিন। সন্তান একবার যদি নিজের জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে, তাহলে সবকিছুই বদলাতে শুরু করবে ভেতর থেকে।

পক্ষাঘাতগ্রস্তদের অলিম্পিক গেমসকে বলা হয় প্যারালিম্পিকস। কানাডিয়ান প্যারালিম্পিয়ান ক্যাভিন রেমপেল ২০০৬ সালে দুর্ঘটনার শিকার হন। তার শরীরের নিচের অংশ অবশ হয়ে যায়। তখন তার বয়স ২৪ বছর। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজের দায়িত্ব নিজেকে নিতে হবে। অন্য ১০ জন পক্ষাঘাতগ্রস্তের চেয়ে তিনি জীবনকে দেখলেন ভিন্ন আঙ্গিকে।

২০০৮ সালে খেলোয়াড় হিসেবে মনোনিবেশ করলেন স্লেজ হকিতে। ২০১৩ সালে আইপিসি আইস স্লেজ হকি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ২০১৪ সালে রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত উইন্টার প্যারালিম্পিকসে দক্ষতার সাথে অংশ নিয়ে দেশকে উপহার দিলেন স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ পদক। রেমপেল তার ঘুরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে বলেন—দ্য হিরো মাইন্ডসেট। সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, 'আপনার জীবনে যা ঘটে সেজন্যে আপনি দায়ী না-ও হতে পারেন। কিন্তু এমন

পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আপনি কী ভাবছেন এবং কী করছেন তার জন্যে দায়ী আপনি নিজেই। কঠিন সময়ে নিজেকে কখনো পরিস্থিতির শিকার ভাববেন না।' নিজের জীবনের দায়িত্ব নেয়া প্রসঙ্গে রেমপেল আরো বলেন, 'আপনি যদি জানেন জীবনে কোন অবস্থানে আপনি যেতে চান, তাহলেই সবকিছু বদলাতে শুরু করবে।'

নিজের জন্যে যেমন মহৎ লক্ষ্য ঠিক করা প্রয়োজন, একইভাবে সন্তানকে মহৎ লক্ষ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্বও আপনার। যে সন্তানকে আপনি বোঝা ভাবছেন, সমস্যা ভাবছেন—আপনার একটু ধৈর্য, একটু মমতা, একটু কৌশল সেই সন্তানেরই জীবন বদলে দিতে পারে।

আপনি জানেন, কোয়ান্টাম মেথডের চার দিনের কোর্স জীবনের দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে সহায়ক একটি কার্যক্রম। নিজের শক্তি এবং সম্ভাবনাকে ছেড়ে না দিয়ে এর নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে গ্রহণ করার চমৎকার সুযোগ তৈরি করে এই কোর্স। অতএব চার দিনের কোর্স রিপিট করার চেষ্টা করবেন। কারণ শত শত ধ্যানী যখন চার দিন দীর্ঘসময় ধরে একসাথে থাকেন, একটা আলাদা ভাইব্রেশন সৃষ্টি হয়। যত কোর্স রিজুভিনেট করবেন, সাদাকায়নে নিয়মিত অংশ নেবেন, তত জীবনের লক্ষ্যপানে, সাফল্য ও সমৃদ্ধির পানে, সৃজনশীলতা ও তৃপ্তির পানে আপনার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

আপনার জীবন সুন্দর হোক, সফল হোক, স্মরণীয় ও বরণীয় হোক। পরম করুণাময়ের কাছে এটাই আমাদের প্রার্থনা।

সংক্ষিপ্ত : ৫ নভেম্বর ২০২১, ঢাকা

বিপন্ন সন্তানকে বাঁচান!

আপনারা যারা স্বজন-পরিজন-সুজনের সাথে ঈদ করেছেন, সবার সাথে মিশেছেন ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে, যারা কোরবানির গোশত বিতরণ করেছেন, অভাবী দরিদ্রদের অতিথির মর্যাদা দিয়েছেন, বন্যার্তদের মাঝে কোরবানির মাংস-সহ খাবার বিতরণ করেছেন, পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড় নির্বিশেষে যারা সবাইকে আগে সালাম দিয়েছেন, তারা নিঃসন্দেহে তাদের সোশ্যাল মাসল-কে মজবুত করেছেন। তারা সামাজিক ফিটনেসের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তাদেরকে বিশেষভাবে অভিনন্দন।

ঈদ বা নববর্ষ—প্রতিটি উৎসবে এই একাত্মতাই আমাদেরকে দেবে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি এবং নিরাপত্তা। তরুণ প্রজন্ম সামাজিক মমত্ব থেকেই পাবে নতুন আলোর দিশা। আমাদের এখন বেশি করে ভাবতে হবে কিশোর-তরুণ প্রজন্ম নিয়ে। দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, কিশোর-তরুণদের একটা অংশ নিদারুণভাবে অস্থির বিভ্রান্ত হতাশ আসক্ত। আমরা যদি সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাবলি দেখি, তাহলে এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

গত বছর বরিশালে নেশা করতে গিয়ে ১৬ বছরের এক কিশোর মারা যায়। গত মে মাসে চার ছেলে বন্ধুর সাথে কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়ে অতিরিক্ত মদ খেয়ে ১৯ বছরের এক তরুণী মারা যায়। তরুণীটির বাবা জানত, মেয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছে। গত মাসে মুন্সিগঞ্জে বিয়ের অনুষ্ঠানে মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর সময় ব্রিজ থেকে পড়ে ১০ম শ্রেণির দুই কিশোর মারা যায়। আর জুন মাসে বান্দরবানে প্রেমিকের সাথে বেড়াতে গিয়ে আরেক তরুণী অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত শ্বাসকষ্টে মারা যায়। এরকম ঘটনা এখন অহরহই সংবাদমাধ্যমে আসছে।

বাংলাদেশে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশু-কিশোরের সংখ্যা চার কোটি।

আমাদের পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের দায়িত্ব আগামীতে তাদের কাঁধেই উঠবে। এখন তারা যদি লক্ষ্যহীন আত্মকেন্দ্রিক বিষণ্ন লাগামহীন হয়ে বেড়ে ওঠে তাহলে বলতেই হবে, আমরা টাইম বোমার ওপর বসে আছি। শুধু আমাদের দেশে নয়, পাশের দেশেও মোটামুটি একইরকম অবস্থা। ২০১৬ সালে কলকাতার নামি স্কুলের এক ছাত্র জন্মদিনের পার্টি করতে গিয়ে মারা যায়। পরে জানা গেল, মদের ভাঙা বোতল শরীরে ঢুকে গিয়েছিল। অতিরিক্ত রক্তপাতে তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর তরুণ প্রজন্মের আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগমুখী আচরণ নিয়ে *দেশ* পত্রিকায় একটি প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধের কিছু কিছু পয়েন্ট ছ-বছর পরেও প্রাসঙ্গিক। নিবন্ধে বলা হয়—

'আমরা যারা ৯০ দশকের প্রথম ভাগে আমাদের কৈশোর কাটিয়েছি তারা প্রত্যক্ষভাবে জানি—কীভাবে কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের সমাজে অল্পবয়সীদের জীবনযাত্রা কেমন ও কতটা পাল্টে গেছে! আগে মাসে একটা চিকেন রোল পেলে আনন্দে আটখানা হয়ে যেত যে কিশোর, তার এখন সপ্তাহে দুদিন দামি ব্র্যান্ডের পিৎজা না হলে মন ভরে না। বিকাল ছটা অবধি আড্ডা ফুটবল ক্রিকেটের বন্ধুত্ব চুকিয়ে যে কিশোর একসময় বাড়িতে ঢুকে পড়াশোনা করত, এখন সেই কিশোরই মোবাইল আর ট্যাবের মধ্যে বন্ধু নিয়ে ঘোরে সারাক্ষণ। যৌথ পরিবারে বড় হওয়া আমাদের সময়কার কিশোর নিজের বলতে একটা টেবিল ও একটা কাঠের ড্রয়ার ছাড়া কিছু ভাবতে পারত না। সেখানে এখন তার আলাদা আলাদা ঘর একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার।

বাড়িতে কেউ ঘুরতে এলে সেই ঘরের অধিকারে ভাগ বসাতে পারে বলে আত্মীয়স্বজনরাও যেন ক্রমশ তাদের কাছে বিরক্তির কারণ। মা-বাবা আমার মোবাইল ধরতে পারবে না। আমার ঘরে ছড়িয়ে থাকা জিনিস গোছাতে পারবে না। রাত জেগে থাকা নিয়ে কিছু বলতে পারবে না। শুধু 'আমি' আর 'আমার'। এর বাইরে যেন কিছু নেই, কেউ নেই। ছোট থেকেই এত গোপনীয়তা কী করে জমা হয় এদের? সামান্য পান থেকে চুন খসলেই এত রাগ, এত অভিমান কেন? কোথা থেকে এলো এই রাগ বিরক্তি আর ঔদ্ধত্য?

বিভিন্ন সামাজিক কারণে ভেঙে পড়েছে যৌথ পরিবারের কাঠামো। বহু সন্তানের পরিবর্তে এক বা বড়জোর দুই সন্তানের ধারণা সমাজে প্রোথিত হয়েছে। তারই ফলস্বরূপ 'আমাদের' ব্যাপারটি সরে গিয়ে 'আমার' ব্যাপারটি প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। ছোট থেকে মা-বাবারাও সন্তানদের সুরক্ষিত ও সফল ভবিষ্যতের দিকে ঠেলতে গিয়ে এই 'আমি' ব্যাপারটিকেই চাপিয়ে দিচ্ছেন বেশি করে। সারাক্ষণ সফল হওয়ার স্ট্রেস নিতে নিতেই কি একসময়

ফেটে পড়ছে তারা?’

নিবন্ধে আরো বলা হয়, ‘এক শ্রেণির হাতে আচমকা এসে পড়েছে বিপুল অর্থ। তার সঙ্গে খরচ করার জায়গাও বেড়ে গেছে হু হু করে। আর এগুলো তাদেরকে মানবিক করার বদলে কেবল বস্তুগত ও ভোগবাদী জীবনের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৌরী সেনের কাজটা করে বাড়ির বড়রাই। সহজে সবকিছু পেয়ে যাওয়া কি এদের আরো বেপরোয়া করে দিচ্ছে না? সন্তানকে সময় দিতে না পেরে কি তার পরিপূরক হিসেবে তাদের হাতে বাড়তি টাকাপয়সা দিয়ে মা-বাবারা কিছুটা হলেও নিজেদের দোষ স্খলন করেন? মা-বাবারা নিজেদের জীবন নিয়ে এতটা ব্যস্ত বলেই কি আর সন্তানদের জন্যে সময় দিতে পারেন না? কম বয়সীদের সামনে নতুন করে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতো আইকন না থাকাও এদের এমন বখে যাওয়ার এক কারণ। এদের জীবনে ছোট পরিবার, ব্যস্ত মা-বাবা, নামে বন্ধু হলেও আসলে সবাই প্রতিযোগী—এমন সব মানুষ দিয়ে ঘেরা।

তাই কি এরা একাকিত্বে ভোগে? কষ্ট পায়? মন খারাপ ডুবিয়ে রাখতে চায় সুরাপাত্রের তরলে? রূঢ়তার পেছনে কি এরা লুকিয়ে ফেলতে চায় কষ্ট আর চোখের জল? এ এক অদ্ভুত সময়! তমসানিবিড়, আত্মসুখে মশগুল বেপরোয়া এক প্রজন্ম। আমার সাফল্য ও আনন্দই পৃথিবীর শেষ কথা ভেবে নেয়া প্রজন্ম। সচেতন না হলে আমাদের জন্যে আরো ভয়ংকর দিন অপেক্ষা করছে। অভিভাবক হিসেবে আমাদের সুচেতনা ও সচেতনতার প্রয়োজন। প্যারেন্টিং কোনো ক্যাবল টিভির মাসিক বিল মেটাবার মতো ব্যাপার নয়।’

এটি হচ্ছে *দেশ* পত্রিকার নিবন্ধ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশেও অনেক মা-বাবার প্যারেন্টিং দেখে মনে হয় তারা অভিভাবক নন, বরং সাপ্লায়ার। সন্তান রিকুইজেশন দেবে আর তারা সেটা জোগান দেবে।

সৌদি প্রবাসী এক ভদ্রলোকের ঘটনা। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান থাকে গ্রামে। স্কুলপড়ুয়া ছেলেটি মোটরসাইকেল কেনার জন্যে কান্নাকাটি শুরু করলে স্ত্রীর চাপে তিনি সেটি কেনার জন্যে টাকা পাঠান। কয়েকদিন পরে সেই মোটরসাইকেল নিয়ে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে মিলে ছিনতাই করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয় ছেলেটি। পুলিশ মোটরসাইকেল জব্দ করেছে। জামিন হলেও মামলা চলছে। ছেলেটির মা বলেন, ছেলে যখন যা চেয়েছে সব কিনে দিয়েছি। কোনো বায়না বাকি রাখি নি, কিন্তু সে যে এই কাজ করবে, কল্পনাও করি নি। অন্য খারাপ ছেলেদের পাল্লায় পড়ে সে নষ্ট হয়েছে।

আসলে সে যে বিপথে গেল এর দায় কি অন্য ছেলেদের? দোষটি এই

ছেলেটির মা-বাবারও। সন্তান যা চাইবে সেটিই কেন কিনে দেবেন? স্কুলপড়ুয়া একটি ছেলের মোটরসাইকেলের তো কোনো প্রয়োজন নেই। সে যখন যা বায়না করছে সেটা মেনে নেয়ার ফলেই আজ কপাল চাপড়াতে হচ্ছে। অনেকেরই ধারণা, যাদের অঢেল টাকাপয়সা তাদের সন্তানরা সাধারণত বেহিসাবি খরচে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এ ধারণা ঠিক নয়। সমস্যাটা অর্থবিত্তের নয়, সমস্যাটা জীবনদৃষ্টির। সমস্যাটা সন্তান লালনের প্রক্রিয়ায়।

আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি। আমাদের দেশের শীর্ষ ব্যবসায়িক গ্রুপগুলোর একটি পিএইচপি গ্রুপ। এর প্রতিষ্ঠাতা সুফি মিজানুর রহমান। তিনি সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই অতিরিক্ত কোনো বিলাসব্যসন দেন নি। সন্তানরা যখন ছোট ছিল তাদের হাতে টাকা দিতেন না। কাঁদলেও চাওয়ামাত্র কোনো জিনিস দিতেন না। প্রয়োজন বুঝে তারপরে দিতেন।

ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় তার বড় ছেলে একদিন ১০ টাকা চাইল। মিজান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ১০ টাকা কেন লাগবে? ছেলে জানাল, টিফিনের সময় সফট ড্রিংকস কিনে খাবে। মিজান সাহেব তখন বললেন, সেটার দাম ছয় টাকা। তুমি ১০ টাকা চাচ্ছ কেন? ছেলে কোনো উত্তর দিতে পারল না। তিনি বললেন, স্কুলে যাও। টাকা দেয়া হবে না, তবে আজকে স্কুলে টিফিনের সময় তোমাদের কাছে সফট ড্রিংকস পৌঁছে যাবে।

ঘটনাটা যখন আমাদের দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ ড. কায়কোবাদ স্যারের লেখা বইয়ে পড়ছিলাম, তখন খুব ভালো লাগছিল। ঘটনাটা ছোট হলেও আমাদের সমাজের সবার জন্যে শিক্ষণীয়। এর বিপরীতে আরেকটি ঘটনা আমরা উল্লেখ করতে পারি।

এখন থেকে প্রায় ১০ বছর আগে ঢাকার মালিবাগে কিশোরী কন্যার হাতে সস্ত্রীক খুন হন পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন ইন্সপেক্টর। কিশোরীর নাম ঐশী। ঐশীর এই ঘটনা সমাজকে নাড়া দিয়েছিল। প্যারেন্টিং নিয়ে, সমাজের অবক্ষয় নিয়ে তখন প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। তারপর যা হয়—আমরা সব ভুলে গেছি এবং ফিরে গেছি যে যার পুরনো রুটিনে।

ঐশীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়ার সময় রায়ের পর্যবেক্ষণে মহামান্য আদালত বলেন, ১৪ বছর বয়স থেকেই ঐশী রহমান সীসা, অ্যালকোহল, গাঁজা ও ইয়াবা সেবন করত। এ কারণে সে ছিল আশাহীন ও সাহায্যহীন। ঐশীর মা-বাবা দুজনেই ব্যস্ত থাকায় ছোটবেলা থেকেই সে মা-বাবার স্নেহ ও সুশাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং ক্রমেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

যে-কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ১৪ বছর বয়সে একটি ছেলে বা মেয়ে

মাদক কেনার পয়সা পায় কোথায়? মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা মানস-এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্তমানে বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের ৮০ শতাংশই কিশোর ও তরুণ। মনে করার কোনো কারণ নেই, এই কিশোর-তরুণ কেবল সমাজের ছিন্নমূল ও দারিদ্র্যপীড়িত অংশ থেকে এসেছে। ঐশীর ঘটনাই এর প্রমাণ। ঐশীর বাবা নাকি তাকে মাসে লক্ষাধিক টাকা হাতখরচ হিসেবে দিতেন। আসলে টাকা দিয়ে সন্তান মানুষ করা যায় না। তাকে যদি আদর স্নেহ মনোযোগ না দেন, মূল্যবোধ ও শুদ্ধাচার না শেখান, তাহলে সে আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হবে।

প্রিয় অভিভাবক! আপনি হচ্ছেন আপনার সন্তানের রোল মডেল! শিশুর হাতে যদি ভালো মানুষ কিংবা বড় মানুষের জীবনী, চিরায়ত গল্পের বই তুলে না দিয়ে দামি স্মার্টফোন আর ভিডিও গেম তুলে দেন, সন্তানকে সময় না দিয়ে নিজে টিভি সিরিয়াল বা ইউটিউবে ডুবে থাকেন তাহলে কয়েক বছর পরে সন্তান কেন কথা শোনে না, পড়ালেখা না করে সারাক্ষণ স্মার্টফোনে কেন বুঁদ হয়ে থাকে, এ জাতীয় আফসোস করে কোনো লাভ হবে না। শুধু জিপিএ-৫ আর কোচিংয়ের পেছনে ছুটলে সন্তান ভালো মানুষ হবে না। তাকে শুদ্ধাচার শিক্ষা দিতে হবে। শুদ্ধাচারের শিক্ষা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যে কারণে নবীজী (স) বলেছেন, 'শুদ্ধাচার শিক্ষাদান সন্তানের প্রতি পিতার সর্বোত্তম উপহার।' *[তিরমিজী, মেশকাত]*

পরিস্থিতির অন্ধকার দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরার কারণ একটাই। আমরা যেন সচেতন হয়ে উঠতে পারি। এখনো সময় আছে সন্তানকে, তরুণ প্রজন্মকে কল্যাণের দিকে ফিরিয়ে আনার। এজন্যে তার হাতে *শুদ্ধাচার* বইটি তুলে দিন। *শুদ্ধাচার* বই ঘরে এমন জায়গায় রাখুন যাতে আপনার শিশু হামাগুড়ি দিয়ে বইটির কাছে গিয়ে তা ধরতে পারে, নাড়াচাড়া করতে পারে। যখন সে পড়তে শিখবে, তখন যেন সে এই বইটি বানান করে পড়ে। এই বইটিকে যদি সে ভালবেসে ফেলে, তাহলে বইয়ের কথাগুলো নিজের জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করবে এবং নিঃসন্দেহে সে ভালো মানুষ হবে।

অভিভাবক হিসেবে কয়েকটি বিষয় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। সন্তানকে জীবনের একটি লক্ষ্য দিতে হবে। বড় হয়ে ভালো মানুষ হওয়ার পাশাপাশি সে কী করবে, এই ধারণা ছোটবেলা থেকেই তাকে দিতে হবে। যখন তাকে ঘুম পাড়াবেন, মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলবেন—তুমি বড় হলে ভালো মানুষ হবে, ভালো ইঞ্জিনিয়ার হবে, ভালো ডাক্তার বা ভালো প্রশাসক হবে। অর্থাৎ যা আপনি চান সেই বিষয়টি বার বার তাকে বলুন।

বয়ঃসন্ধিকালে সন্তানের চলাফেরা ও আচরণের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সময়মতো বাসায় ফিরছে কিনা, খাওয়াদাওয়া ঠিকভাবে করছে কিনা, সময়মতো ঘুমাচ্ছে কিনা খেয়াল করতে হবে। সন্তান কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, কাদের সঙ্গে মিশছে—এসব খবর রাখা খুবই জরুরি।

সন্তানকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাতখরচ দেয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। সে যেন ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের ভেতরে গুটিয়ে না থাকে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। তাকে মেহমান নয়, পরিবারের সদস্য হিসেবে বড় করতে হবে। সে যেন পরিবারের ভালো-মন্দ, অভাব-আনন্দ, সবকিছুরই অংশীদার হয়। আর সন্তান যখন বড় হবে, তার সাথে সম্পর্কটা হতে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ। তার আস্থার জায়গা হবেন আপনি। আপনাকে যদি সে বিশ্বাস করতে পারে, আপনি যদি তার রোল মডেল হতে পারেন, যদি সে আপনার মতো হতে চায়, তাহলে সন্তান খুব সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে।

ঢাকা শহরে খেলার মাঠ যেহেতু দিন দিন কমে যাচ্ছে, বিকল্প হিসেবে সন্তানকে যোগব্যায়ামে উদ্বুদ্ধ করুন। সন্তানকে সাথে নিয়ে যোগব্যায়াম করুন। এতে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা না করার ফলে তার স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর যে প্রভাব পড়ছে, সেই প্রভাব থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারবে। যারা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন সেখানে কমন স্পেসে শিশুদের জন্যে ছবি আঁকা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলার ব্যবস্থা করুন, যাতে অ্যাপার্টমেন্টের সব শিশুরা সেখানে জড়ো হতে পারে। এ কাজটি করতে এমন কাউকে উদ্বুদ্ধ করুন, যিনি সজ্জন ও নির্ভরযোগ্য।

প্রিয় অভিভাবক! সন্তানকে সাদাকায়নে নিয়ে আসুন। জোর করে নয়, উদ্বুদ্ধ করে নিয়ে আসুন। সৎসঙ্ঘের সেবামূলক কার্যক্রমে সন্তান যাতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী হয় সেজন্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করুন। তাহলে ছোটবেলা থেকেই সে সুস্থ প্রশান্ত আলোকিত জীবনের শিক্ষা পাবে। গড়ে উঠবে পরিবার ও সমাজের দায়িত্ববান একজন সদস্য হিসেবে। মনে রাখবেন, এ যুগে আপনার চেয়ে আপনার সন্তানের বিপদই বেশি! তাই তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও মমতা দিন।

১৫ জুলাই ২০২২, ঢাকা

একটি প্রজন্ম কি হারিয়ে যাবে?

গত মঙ্গলবার *বাংলাদেশ প্রতিদিনের* একটি খবরের শিরোনাম ছিল—এত নারী নিখোঁজের রহস্য কী? খবরে বলা হয়, চলতি বছরের ছয় মাসে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানায় ১৩৯ জন নারী নিখোঁজ হওয়ার তথ্য জানিয়ে সাধারণ ডায়েরি বা জিডি ও মামলা করেছেন অভিভাবকেরা। একইসময়ে জেলার মতলব উত্তর থানায় ৪৩ জন নারী ও শিশু নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে জিডি করা হয়েছে। চাঁদপুর সদর মডেল থানায় জিডি করা হয়েছে ৯৭ জন নারী ও কিশোরী নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে।

শুধু চাঁদপুরের থানাগুলোতে নয়, দেশের অন্যান্য থানাতেও নারী ও কিশোরী নিখোঁজ হওয়ার জিডি এবং মামলার সংখ্যা উদ্বেগজনক। খবরে বলা হয়, এর কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে নানা চমকপ্রদ তথ্য। সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলছেন, নিখোঁজ এসব নারীর মধ্যে রয়েছে স্কুল-কলেজের ছাত্রী আর একটি অংশ প্রবাসীর স্ত্রী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন অ্যাপস-এ তাদের ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে এবং প্রলোভনে পড়ে তারা ঘর ছেড়েছে। আবার ঘর ছেড়ে অনেকেই হচ্ছেন প্রতারিত ও পাচারের শিকার।

আমরা একটু চিন্তা করি, একটি জেলার তিনটি থানায় যদি এই সংখ্যক কিশোরী, ছাত্রী এবং প্রবাসীর স্ত্রীরা ঘর ছেড়ে প্রতারণা ও পাচারের শিকার হন, তাহলে সারাদেশে কতগুলো থানা রয়েছে? প্রত্যেক থানা থেকেই যদি নারী ও কিশোরী নিখোঁজ, প্রতারণা ও পাচারের শিকার হন, তাহলে নিখোঁজ নারীদের সংখ্যাটা কত বড় হতে পারে! কত আতঙ্কজনক হতে পারে!

একজন পুলিশ কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে বলেন, নিখোঁজ নারীদের বেশিরভাগই প্রবাসীদের স্ত্রী। সাধারণ মানুষের হাতে হাতে এখন স্মার্টফোন। তারা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম—ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ভাইবার হোয়াটসঅ্যাপ টিকটক ও বিগো লাইভ-সহ বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করেন। এসবের মাধ্যমে ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাদের। অনেকে বখাটে যুবকদের পাল্লায় পড়ে ঘর ছাড়ছে। তিনি আরো বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্কুল-কলেজে পড়া কিশোরীরা ঘর ছাড়ছে। তার মতে, অনেক অভিভাবক সন্তানদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দিয়ে মনে করেন তারা অনলাইনে ক্লাস করছে, কিন্তু সবার ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে না। প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক ছেলেমেয়ে নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। শুধু কি ছাত্রছাত্রীরাই আসক্তি ও অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে? এ-ক্ষেত্রে অনেক মা-বাবার অবস্থানটা কোথায়? সেটাও আমরা দেখতে পারি একজন লেখকের দৃষ্টিতে।

লেখক 'স্মার্টফোন আসক্তি ও একটি প্রজন্মের হারিয়ে যাওয়া' নিবন্ধে লিখেছেন, 'করোনার প্রথম ঢেউ অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক পড়ন্ত বিকেলে ছাদখোলা এক রেস্টুরেন্টে পরিবারসহ কফির আড্ডায় বসেছিলাম। লক্ষ করলাম, আমাদের খুব কাছাকাছি কয়েকজন ছবি তোলায় ব্যস্ত। তাদের প্রত্যেকের বয়স ৪২ থেকে ৪৫ এর মধ্যে। ছবি তুলতে তারা এতটাই মশগুল ছিলেন যে, স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান হারিয়েছেন যেন! করোনা পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দূরত্ব তো দূরের কথা, পারলে তারা যেন গায়ের ওপর উঠে ছবি তোলেন। যতক্ষণ রেস্টুরেন্টে ছিলাম, পুরো সময়ই তাদের ছবি তুলতে দেখেছি। স্থির হয়ে নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করারও যেন সময় নেই তাদের।

এদের মধ্যে আমি আমার একজন সাবেক সহকর্মীকেও খুঁজে পেলাম। পোশাকে আর কড়া মেকআপে তিনি যেন অনেকটাই অচেনা। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার পরও তার মধ্যে ভাবান্তর লক্ষ না করে নিজেই খানিকটা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলাম। সৌজন্য বিনিময়ের হাসিটুকু দ্রুত গুটিয়ে নিয়ে ভাবলাম, কোথাও আমার ভুল হচ্ছে না তো! তবে সেই রাতেই ফেসবুকের ওয়ালে সাবেক সহকর্মীর পোস্ট করা ছবি দেখে নিশ্চিত হই বিকেলে তাকে চিনতে আমার কোনো ভুল হয় নি।'

তিনি একটি নির্মম বাস্তব পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অসম্ভব জনপ্রিয়তা সম্ভবত বাস্তব জীবন আর স্ক্রিনবন্দি জীবনের মধ্যে সীমারেখা টেনে দিচ্ছে। সেখানকার একটি জীবন চেনে না আরেকটি জীবনকে। একই ব্যক্তির যেন দুটি সত্তা। একটি বাস্তবতার টানাপোড়েনে পরিপূর্ণ। অন্যটি স্ক্রিনে কৃত্রিম আলোর মতোই ঝলমলে আর

চোখ ধাঁধানো। দুটি জীবনের কুশীলবরা যেন অনেকটাই আলাদা।

আমরা সচরাচর শিশু-কিশোর, তরুণ প্রজন্মকে স্ক্রিনবন্দি জীবনে আসক্ত হিসেবে চিহ্নিত করি। কিন্তু আমরা যারা পরিণত প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছি, তারা কি সত্যিকার অর্থে এই আসক্তি থেকে দূরে আছি? শৈশব-কৈশোর এবং যৌবনের পরিক্রমায় আমরা যে ভালো অভ্যাসগুলো অর্জন করেছিলাম সেই অভ্যাসগুলো আমরা কি ধরে রাখতে পেরেছি? আমরা নিজেরা কি হারাতে বসি নি সামাজিকতা, মূল্যবোধ আর শিষ্টাচারের শিক্ষা?

শিশু-কিশোর তরুণদের প্রযুক্তিনির্ভরতা আর মোবাইলের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি নিয়ে আলোচনা হয় বিস্তর। সন্তানদের মোবাইল আসক্তি নিয়ে অভিযোগ প্রায় প্রতিটি মা-বাবার। এদিকে মা-বাবাই যে মোবাইল আসক্তিতে তলিয়ে যাচ্ছে সেই খবর কি আমরা রাখি?

কিছু চটকদার খবরের শিরোনাম, টিকটক, পরিচিতদের নিউজফিড, কিছু ভিডিও লিংক আর চ্যাটিংয়েই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি নিজেদের জীবন। শিশু-কিশোর-তরুণদের মোবাইল আসক্তি নিয়ে বিভিন্ন মহলে কথা হয়, আলোচনা হয়। কিন্তু পরিণত প্রজন্মটির বদলে যাওয়া অভ্যাস নিয়ে কেউ কথা বলে না। অথচ পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে আমাদের মতো পরিণত প্রজন্মের প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল আচরণ ও চর্চা খুব জরুরি। আমরা নিজেরাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে কাদের অনুসরণ করবে শিশু-কিশোর-তরুণরা?'

তিনি আরো লিখেছেন, 'আর ইওর প্যারেন্টস অ্যাডিক্টেড টু ফোনস? শিরোনামে *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন ২০১৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক একটি সংস্থা এক হাজার জন মা-বাবা ও তাদের সন্তানদের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এতে বলা হয়, যেখানে প্রতি ১০ জনে ছয় জন মা-বাবা মনে করেন তাদের সন্তান মোবাইলে আসক্ত, সেখানে প্রতি ১০ জনে চার জন সন্তান মনে করে তাদের মা-বাবা মোবাইলে আসক্ত। জরিপে অংশ নেয়া ৩৮ শতাংশ কিশোর মনে করে, তাদের মা-বাবা মোবাইলে আসক্ত। শুধু তা-ই নয়, তারা তাদের মা-বাবার মোবাইল আসক্তি থেকে মুক্তি কামনা করে।'

লেখক তার লেখায় এক নির্মম সত্যকে তুলে এনেছেন। আসলে ডিজিটাল আসক্ত মানুষের দুটি সত্তা। সত্তর এবং আশির দশকে রুপালি পর্দার নায়ক-নায়িকা ও কুশীলবদের আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে। মেশার সুযোগ হয়েছে। অধিকাংশেরই রুপালি পর্দার জীবন ও বাস্তব জীবনের

মধ্যে ছিল এক কঠিন দ্বন্দ্ব! খুব মায়া হতো। রুপালি পর্দায় তিনি নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করছেন, জীবনের বাস্তবতা তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই সময়ে খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি, পর্দার 'আমি' আর বাস্তবের 'আমি'—এই দুই আমি'র দ্বন্দ্ব শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, পারিবারিক জীবনকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। দেখেছি, অধিকাংশেরই পারিবারিক জীবনে অশান্তি।

পর্দার 'আমি' নিয়ে তো গল্প আছে। চার্লি চ্যাপলিন, হলিউডের হাসির রাজা। তিনি বিষণ্নতায় ভুগছেন। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছেন পরামর্শের জন্যে যে, আমি তো হাসতে পারি না! আমি বিষণ্নতায় ভুগছি। তিনি তার বিষণ্নতার কারণ জানালেন। সব শুনে সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, আপনি চার্লি চ্যাপলিনের মুভি দেখেন। তাহলে আপনি হাসতে পারবেন। চার্লি চ্যাপলিন আরো বিষণ্ন মুখ করে বললেন, আমিই তো চার্লি চ্যাপলিন!

আসলে পর্দার আমি আর বাস্তবের আমি, পর্দার জীবন আর বাস্তবের জীবন, স্ট্যাটাসের ছবি আর বাস্তব ছবির মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল, মিলের চেয়ে সংঘাত অনেক অনেক বেশি।

সামাজিক-পারিবারিক জীবন নিয়ে আমরা সবসময়ই সচেতন ছিলাম। আমরা ২০১৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে পারিবারিক ওয়ার্কশপ করেছিলাম। সেখানে আমরা বলেছিলাম, ইতিহাসের কোনো লগ্নে এখনকার মতো পরিবার প্রথা হুমকির সম্মুখীন হয় নি। আমরা প্রথম পারিবারিক ওয়ার্কশপ করি ১৯৯৭ সালে। তারপর থেকে ২৪ বছর ধরে কোয়ান্টাম বলে আসছে, পরিবার হুমকির মুখে পড়বে।

১৯৯৫ সালে ইংল্যান্ডের গবেষকদের এক জরিপে সবচেয়ে সুখী মানুষের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম উঠে এসেছিল। এর মূল কারণ ছিল আমাদের পারিবারিক বন্ধন। তখনই উপলব্ধি করেছিলাম, পরবর্তী আগ্রাসনটা হবে আমাদের পরিবারের ওপর। কেননা শোষকরা সবসময় গবেষণা ও অনুসন্ধান করে উদীয়মান জনপদের শক্তির জায়গাটা খুঁজে বের করে। তারপর সেটাকে ধ্বংস করে।

১৯৯৫ সালে আমাদের অভাব ছিল। আমরা বার্গার খেতে পারতাম না, কিন্তু আমাদের পরিবারে একধরনের শান্তি ছিল। তারপর কী হলো? একান্নবর্তী পরিবারকে আমরা যন্ত্রণা মনে করতে শুরু করলাম। হাম দো হামারা দো থেকে এখন আরো ছোট ফর্ম দাঁড়িয়েছে, হাম হাম তুম তুম। আমরা যাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা মনে করি সেটা আসলে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা। একজন মানুষ যখন সত্যিকারের স্বাধীন হয়, তখন সে নিজের ও

অন্যের কল্যাণ করে। এক ঘরে বাস করলেই পরিবার হয় না। যখন আমার সুখের চেয়ে আমার মা-বাবা, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রীর সুখ বড় হবে তখনই আমরা মানুষ হবো। তখনই সেটা পরিবার হবে।

অনেক অভিভাবক এখন অভিযোগ করছেন, সন্তান বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে! সন্তান তো বেয়াদব হবেই। কারণ সে ঘুরঘুর করছে আপনার পাশে। আপনি তাকে সময় না দিয়ে টিভি সিরিয়াল কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় ডুবে আছেন। ডিজিটাল আগ্রাসন এমন নীরব ঘাতক যে, খুন হওয়ার আগে আপনি বুঝতেই পারবেন না আপনি আক্রান্ত হয়েছেন।

এখন বাস্তবতা আরো বদলেছে। আপনি শুধু টিভি সিরিয়ালে আসক্তই নন, আপনি সিরিয়ালের নায়ক-নায়িকার মতো ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ট্যাটাস দিতেও আসক্ত হয়ে গেছেন। একটু আগেই আমরা একজন লেখকের লেখায় দেখলাম, ৪০-৪৫ বছর বয়সীরাও আসক্ত। এখন আমাদের প্রত্যেকেরই দুটি সত্তা—পর্দার আমি, বাস্তবের আমি। যেই স্ট্যাটাস আমি দেই সেই আমির সাথে বাস্তব আমির যে অমিল, দ্বৈতসত্তার যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বই আমাদেরকে অস্থির করছে, অসহিষ্ণু করছে। আমি যদি অস্থির অসহিষ্ণু ও মমতাহীন হই, দুর্ব্যবহারকারী হই, আমার সন্তান স্থির প্রশান্ত সমমর্মী হবে—এই আশাটা দুরাশারই নামান্তর।

আমরা এতক্ষণ আমাদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলাম। প্রতিকার কী? এই প্রতিকারের পথেই আমাদেরকে এখন পা বাড়াতে হবে। প্রতিকারের পথে যাওয়ার আগে আমরা সুফিদের একটা গল্প উল্লেখ করতে পারি।

নির্জন নদীর পাড় দিয়ে আপন মনে হেঁটে যাচ্ছেন একজন। বাঁক ঘুরতেই তিনি আওয়াজ পেলেন। তাকিয়ে দেখলেন, নদীর পাড়ে দুজন মানুষ খুব কাছাকাছি। দুই হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে, কিন্তু গলা ফাটিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। আপন মনে যিনি হাঁটছিলেন, ভাবলেন, ব্যাপারটা কী? এত কাছাকাছি দুই জন, এত জোরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে কেন? তাদের কেউ তো বধির নয়। দুজনের উত্তেজনা এবং চিৎকারে তিনি কোনোকিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেলেন না। গ্রামে ফিরে এলেন।

সেই গ্রামের সবচেয়ে বুজুর্গ বা জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! আমি দেখলাম দুজন মানুষ দুই হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। মনে হচ্ছে, দুই জন যেন নদীর দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, কিন্তু তারা তো খুব কাছেই ছিল। আমি বুঝতে পারলাম না—আস্তে কথা না বলে তারা এত জোরে চিৎকার করছিল কেন?

বুজুর্গ হাসলেন। বললেন, আসলে কাছে থেকেও তারা দূরে ছিল। অর্থাৎ তাদের দুজনের মন ও আত্মার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। এই মানসিক দূরত্বের কারণেই তারা কাছে থেকেও একজনের কথা আরেকজনের কানে ঢোকানোর জন্যে এত চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল।

আজ থেকে ঘরে প্রথম পদক্ষেপ হোক—চিৎকার-চেঁচামেচি, ধমকাধমকি বন্ধ। ঘরে আপনারা তো খুব কাছেই থাকেন। শুধু দৈহিকভাবে কাছে নয়, মনের দিক থেকেও কাছে চলে আসুন। আপনি যে-রকম মনোযোগ পেলে খুশি হন, আপনার স্ত্রী স্বামী সন্তান মা বাবা আত্মীয়—তারাও মনোযোগ পেলে খুশি হন। অতএব মনোযোগ দিন। শুধু নিজেই বলতে চাইবেন না। অন্যদের কথা শুনতে শুরু করুন। হয়তো তার ভেতরে অনেক অস্থিরতা অসহিষ্ণুতা বিষণ্নতা আছে। হয়তো ইতোমধ্যেই তার ভেতরে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে হবে। আপনাকেই উদ্যোগী হয়ে তার কাছে যেতে হবে। হৃদয়কে উজাড় করে দিতে হবে। তাহলেই আপনি আজ হোক, কাল হোক, তাদের অন্তরকে জয় করতে পারবেন। আপনার পরিবার টিকে যাবে।

যত অসুবিধা হোক, আপনি অন্তর খুলে শ্রদ্ধা মমতা ভালবাসা দিন। তাকে কাছে টানুন। অনুভব করুন—এ আমার মা, এ আমার বাবা, এ আমার সন্তান, এ আমার মেয়ে, এ আমার ছেলে, এ আমার স্ত্রী, এ আমার স্বামী। যখনই মেডিটেশনে বসবেন, মনের বাড়িতে তাকে এনে বোঝান যে, তাকে আপনি কত ভালবাসেন, কত স্নেহ করেন, মমতা করেন, শ্রদ্ধা করেন। প্রেম-ভালবাসা-মমতা-শ্রদ্ধা একই জিনিসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন নাম, কিন্তু মূল স্পন্দন একই।

সন্তানের ব্যাপারে আপনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে আপনার মনোযোগ। সন্তানের কথা শুনুন। তাদেরকে বলতে উদ্বুদ্ধ করুন। তাদের সময় দিন। গত ডিসেম্বরে জার্মানির হামবুর্গে একদল শিশু মা-বাবার মোবাইল আসক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল। আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা সাত বছর বয়সী এমিল আহ্বান জানায়, 'তোমরা আমাদের সঙ্গে খেলো, স্মার্টফোনের সঙ্গে নয়।'

আসলে প্রত্যেক শিশুই মা-বাবার মনোযোগ চায়। ক্লাস করার জন্যে সন্তানকে বাধ্য হয়ে স্মার্টফোন কিনে দেয়ার পর সন্তান যদি তাতে আসক্ত হয়ে গিয়ে থাকে, ধৈর্য হারাবেন না। পড়াশোনার বাইরে স্মার্টফোন নিয়ে কিছু করছে কিনা, এটা আপনি তখনই বুঝতে পারবেন যখন আপনি সন্তানের প্রতি মনোযোগী হবেন। সন্তান আসক্ত হয়ে থাকলে প্রথম প্রথম আপনার সাথে

বিরূপ আচরণ করবে। কিন্তু আপনার মনোযোগ, ধৈর্য, মমতা দিয়ে আপনি তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আমরা গত ২৫ বছর ধরে বলে এসেছি, সন্তানের প্রতি মা-বাবার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে তাকে জীবনের লক্ষ্য দেয়া। যদি লক্ষ্য দেয়া যায় সন্তান শিশুবয়সেও কত কিছু করতে পারে, দাবার সবচেয়ে ছোট গ্র্যান্ডমাস্টার অভিমন্যু মিশ্র এর উদাহরণ।

অভিমন্যু মিশ্র জন্মগ্রহণ করেছে আমেরিকায়। তার বাবা হেমন্ত মিশ্র। যখন তার বয়স আড়াই বছর তখন তার বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ট্যাব বা আইফোনে সন্তান যাতে আসক্ত না হয় সেজন্যে তাকে দাবা খেলা শেখাবেন। দাবার গুটি তার হাতে তুলে দিলেন। এই শুরু। আস্তে আস্তে তাকে খেলা শেখালেন। তাকে লক্ষ্য দিলেন যে, তোমাকে খেলায় চ্যাম্পিয়ন হতে হবে।

অভিমন্যু মাত্র ১২ বছর বয়সে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন দাবায়। অভিমন্যু বলেন, গত দেড় বছর লকডাউনে আইসোলেশনে থাকাকালে সময় নষ্ট না করে দাবায় দক্ষ হওয়ার জন্যে আমি দৈনিক গড়ে ১২ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি।

শিশুবয়স থেকে সন্তানকে সময় দেয়া, তাকে আদর করতে করতে জীবনের একটা লক্ষ্য দেয়া—এটাই মা-বাবার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যদি একবার লক্ষ্য দিতে পারেন, তাহলে সন্তান বাকি কাজগুলো নিজেই করবে। তারপরও সবসময় খেয়াল রাখতে হবে—সে কী করছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে, শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করছে।

নিজে সব ধরনের ডিজিটাল আসক্তি থেকে মুক্ত হোন। ডিজিটাল জগৎ আপনাকে কোথাও নিয়ে যাবে না। আজকে যদি ডিজিটাল আগ্রাসনের হাতছানিতে আপনার পরিবারকে আপনি ধ্বংস হতে দেন, আপনার বিপদের সময়, আপনার শেষ সময় কোনো ভার্চুয়াল বন্ধু আপনার পাশে থাকবে না। তখন আপনি খুব একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন।

অতএব পর্দার যে সত্তা, ছবির যে সত্তা, স্ট্যাটাসের যে সত্তা, কৃত্রিম আলোর চোখ ধাঁধানো বায়বীয় এই সত্তার পরিবর্তে বাস্তব সত্তাকে সম্মান করুন, শ্রদ্ধা করুন। আপনি জীবন ফিরে পাবেন। আজ থেকে সূচনা হোক ডিজিটাল আগ্রাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করার সংগ্রাম। আপনি মুক্ত হলে আপনার পরের প্রজন্ম আপনাকেই অনুসরণ করবে। আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও। আপনি নিজে সিগারেট খেয়ে যদি সন্তানকে বলেন, তুই সিগারেট

খাবি না, সিগারেট ক্ষতিকর! সন্তান কোনোদিন শুনবে না। সন্তান আপনাকেই অনুসরণ করবে। যা আপনি বলবেন তা আগে নিজের জীবনে পালন করুন। আপনার সন্তান আত্মীয় বা বন্ধুকে বলাটা সহজ হবে। আপনার কথাকে তারা গুরুত্বের সাথে নেবে।

আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আপনি অনুসরণীয় হয়ে থাকবেন, এই প্রত্যাশা আমাদের সবার। পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন।

৯ জুলাই ২০২১, ঢাকা

ডিজিটাল মাদক থেকে সন্তানকে দূরে রাখুন

আমরা সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইন জুয়া, অনলাইন গেম ও অনলাইন প্রতারণার তাণ্ডব ও ধ্বংসলীলার ওপর কিছুটা আলোকপাত করে এবং কিছু সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করে এ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলাম।

ভিডিও গেমের সাথে সহিংসতা খুন নৃশংসতার যে যোগসূত্র—এটা নতুন কিছু নয়। ২০১১ সালে নরওয়েতে প্রথম বড় ধরনের নৃশংস ঘটনা ঘটে। অ্যান্ডার্স ব্রেইভিক চরম মুসলিম ও নারী বিদ্বেষী এক নরওয়েজিয়ান। ইউরোপে যে শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদীদের উত্থান ঘটছে, ব্রেইভিক তার একটি উদাহরণ। তার লক্ষ্য ছিল ইউরোপের মাটি থেকে সমস্ত মুসলমানকে বিতাড়িত করা। ২০১১ সালের ২২ জুলাই একটি সামার ক্যাম্পে নির্বিচার গুলি চালিয়ে সে ৭৭ জন নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে। মানুষ মারার প্রস্তুতি সম্পর্কে আদালতে খুব সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয় এই সন্ত্রাসী।

কল অব ডিউটি নামে একটি কম্পিউটার গেম খেলে সে হাত পাকায়। *ওয়ার্ল্ড অব ওয়ারক্রাফট* নামে আরেকটি ভিডিও গেম সে দিনে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত খেলত। ভিডিও গেমে আসক্ত এই উগ্রবাদী ব্রেইভিক বলে, শুধু তুমি না, তোমার বৃদ্ধ দাদিও যদি এ গেমে বুঁদ হয়ে থাকে, তাহলে সে-ও সুপার মার্কসম্যানে (দক্ষ শ্যুটার) রূপান্তরিত হবে।

২০১৫ সালে আমেরিকার সাউথ ক্যারোলিনাতে ২১ বছর বয়সী এক শ্বেতাঙ্গ তরুণ কৃষ্ণাঙ্গদের চার্চে ঢুকে নয় জনকে গুলি করে হত্যা করে। তদন্তে বেরিয়ে আসে—শৈশব থেকে সে-ও ভায়োলেন্ট ভিডিও গেমে আসক্ত ছিল।

২০১৬ সাল। জার্মানির মিউনিখে শপিং মলে হামলা চালিয়ে ১০ জনকে হত্যা করে ১৮ বছরের তরুণ আলি ডেভিড সনবোলি। আহত করে ৩৬ জনকে। পরে নিজে আত্মহত্যা করে। ডেভিড সনবোলি তার সহপাঠীদের হাতে দীর্ঘ সাত বছর বুলিং অর্থাৎ মানসিক উৎপীড়নের স্বীকার হয়। তাদের সাথে সে মিশতে পারত না। একসময় সে ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশ করে এবং ভিডিও গেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। গেম খেলতে খেলতে তার ভেতরে প্রতিশোধস্পৃহা সৃষ্টি হয় এবং খুনের টার্গেট হিসেবে বেছে নেয় তার সমবয়সী টিনএজারদের। তার মডেল ছিল খুনি অ্যান্ডার্স ব্রেইভিক।

জার্মানির এ দুঃখজনক ঘটনার পরে অনেক মানসিক বিশেষজ্ঞ বুলিং অর্থাৎ সহপাঠীদের হাতে মানসিক উৎপীড়নের যে মারাত্মক প্রভাব শিশু-কিশোরদের ওপর পড়তে পারে, এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। এই করুণ ঘটনার পর পরই আমরা অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম যে, শুধু সহপাঠীদের মানসিক নিপীড়ন, মানসিক উৎপীড়ন এজন্যে একমাত্র দায়ী নয়, সন্তানকে কীভাবে বড় করছেন, তাকে কী শিক্ষা দিচ্ছেন, সেটাই মূল বিষয়। সন্তান অবসর সময় কীভাবে কাটাচ্ছে, সে ব্যাপারে অভিভাবকেরা অসচেতন থাকলে সন্তানের চরম সর্বনাশ হতে পারে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কি ইন্দোনেশিয়াতে এবং তারপর আমেরিকায় দিনের পর দিন সহপাঠীদের হাতে মানসিক নিপীড়নের, মানসিক উৎপীড়নের শিকার হন নি? হয়েছেন। কিন্তু তার মা তাকে ছোটবেলাতেই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, কখনো রি-এক্ট করবে না। বুলিং সবসময় ইতিবাচকভাবে নেবে। সমস্ত টিটকারি, উপেক্ষার জবাব দেবে নিজের বিকাশের মধ্য দিয়ে। সেই ছোটবেলায় বারাক ওবামা লক্ষ্য স্থির করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার। তিনি কোনো বুলিং-এ রি-এক্ট করেন নি। বিষণ্নতায়ও ভোগেন নি, হতাশায়ও ভোগেন নি। বরং সব তিরস্কার টিটকারিকে উপেক্ষা করে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেছেন।

আসলে অনলাইন গেম বা ভিডিও গেম যে শুধু নরওয়ে, জার্মানি, আমেরিকায় সহিংসতার জন্যে দায়ী তা নয়। ২০১৯ সালে ১৫ মার্চ অস্ট্রেলিয়ান তরুণ ব্রেন্টন টারান্ট নিউজিল্যান্ডে দুটি মসজিদে গুলি চালিয়ে ৫১ জন মুসল্লিকে হত্যা করে। তারও রোল মডেল ছিল নরওয়ের ব্রেইভিক। টারান্ট খুন করার দৃশ্য ফেসবুকে লাইভে প্রচার করে ও রেকর্ড করে। গ্রেফতার হওয়ার পর টারান্টকে জিজ্ঞেস করা হয়, ভায়োলেন্স ও টেরোরিজম সে কীভাবে শিখল? তার উত্তর ছিল, ভিডিও গেম আমাকে উগ্র জাতীয়তাবাদে

উদ্বুদ্ধ করে। *ফোর্টনাইট* গেমটি আমাকে কিলার হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়। *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, ১৯ মার্চ ২০১৯-এর রিপোর্ট।

এই ঘটনাগুলো মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। ২০১১ সালের রেডিওলজিক্যাল সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার বার্ষিক সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের একদল বিজ্ঞানী গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। রিপোর্টে তারা বলেন, ভিডিও গেম খুব একটা খেলে না এমন ২৮ জন তরুণের ওপর পরীক্ষা করে আমরা দেখেছি, মাত্র এক সপ্তাহ ভায়োলেন্ট ভিডিও গেম খেলার পরই তাদের ব্রেনের বুদ্ধিমত্তা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণকারী অংশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৯৮ সালে গবেষকরা শনাক্ত করেন যে, ভিডিও গেম মস্তিষ্কে ডোপামিন লেভেল ১০০ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়! গত ২৩ বছরে যে-সব গেম বেরিয়েছে সেগুলো আরো আরো আসক্তিকর।

এখনকার ভিডিও গেমগুলো কত আসক্তিকর তা বোঝাতে আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের পরিচালক ড. নিকোলাস বলেন, ১৫ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ভিডিও গেম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তদের চেয়ে হেরোইন ও ক্রিস্টাল মেথ আইসে আসক্তদের সুস্থ করে তোলা অনেক সহজ। আর পেন্টাগনের অ্যাডিকশন রিসার্চ বিভাগের প্রধান ড. এন্ড্রু-র মন্তব্য হলো, ভিডিও গেম ও স্ক্রিন আসক্তি হচ্ছে ডিজিটাল মাদক।

আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি, এই সহিংস ভিডিও গেমের উদ্যোক্তা কারা, তাহলে আমরা দেখব যে, যুদ্ধবাজ ও অস্ত্র বেনিয়াচক্র এই গেম প্রসারের মূল উদ্যোক্তা। *ওয়ার প্লে : ভিডিও গেমস এন্ড দ্য ফিউচার অব আর্মড কনফ্লিক্ট* বইতে নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কোরি মিড পুরো ব্যাপারটা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

১৯৬০ এর দশক থেকে শুরু। পেন্টাগন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনী গেমগুলো ব্যবহার করে সৈন্য নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের কাজে। বিশ্বজুড়ে মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রয়োজন অনুযায়ী গেম কোম্পানিগুলো নতুন নতুন কম্পিউটার গেম বানিয়েছে এবং এই গেমগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সম্ভাবনাময় তরুণদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে। যুদ্ধবাজ এবং অস্ত্র বেনিয়াদের দৌলতে এই ভিডিও গেম-এর বাজার যে কত বড়, তা আমরা একটি রিপোর্ট থেকে বুঝতে পারি।

মার্কেটওয়াচ, ২ জানুয়ারি ২০২১ সালের রিপোর্ট হচ্ছে, হলিউড বলিউড-সহ পৃথিবীর যত ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আছে, সবার ব্যবসার পরিমাণ যোগ করলে ১০০ বিলিয়ন ডলার হবে। আর ভিডিও গেম ব্যাপারীদের ব্যবসার

পরিমাণ হচ্ছে ১৮০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির চেয়েও প্রায় দ্বিগুণ! এটা ২০১৯ সালের হিসাব।

যে খেলোয়াড় গেম-এ যত মানুষ মারতে পারবে সে তত পয়েন্ট পাবে। যে গেম তরুণদের অসহিষ্ণু হিংস্র খুনি দাঙ্গাবাজ যুদ্ধবাজ করে তোলে, সেই গেমের নির্মাতা ও বেনিয়াদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের আওতায় আনা উচিত। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন আপনি কী করবেন? সন্তানকে সুস্থ রাখার জন্যে, ভালো রাখার জন্যে গেমরূপী বা সোশ্যাল মিডিয়ারূপী ডিজিটাল মাদক থেকে রক্ষা করার জন্যে আপনি কী করতে পারেন?

এ-ক্ষেত্রে চীন যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে, আমরা তা উল্লেখ করতে পারি। চীনে প্রায় আড়াই কোটি তরুণ-তরুণী স্ক্রিনে আসক্ত এবং ৫০ শতাংশ শিশু-কিশোর মায়োপিয়ায় আক্রান্ত। শঙ্কিত চীন সরকার তাই ২০০৮ সালে স্ক্রিন আসক্তিকে মানসিক ব্যাধি হিসেবে ঘোষণা করে। চীনে ভিডিও গেমকে ডিজিটাল আফিম বলা হচ্ছে। চীন সরকার গেমিং কোম্পানিগুলোকে সে দেশে ব্যবসা করার জন্যে কিছু নিয়ম করে দিয়েছে।

১. ১৮ বছরের কম বয়সী কোনো গেমার রাত ১০টা থেকে পরদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত ভিডিও গেম খেলতে পারবে না।

২. ১৮ বছরের কম বয়সীরা ছুটির দিনে সর্বোচ্চ তিন ঘণ্টা এবং সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে দেড় ঘণ্টা ভিডিও গেম খেলতে পারবে।

৩. শিশু-কিশোররা গেমিং একাউন্টে প্রতি মাসে ২০০ ইউয়ান বা দুই হাজার ৪০০ টাকার বেশি রাখতে পারবে না।

আমাদের দেশেও যদি এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয় তা নিঃসন্দেহে অভিভাবকদের জন্যে স্বস্তির কারণ হবে। কর্তৃপক্ষ যখন সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন আমরা অবশ্যই স্বাগত জানাব, কিন্তু তার আগে মা-বাবা হিসেবে সন্তানের ব্যাপারে আপনারও করণীয় রয়েছে।

দৃঢ় হতে হবে শুরু থেকেই। দৃঢ় হবেন কিন্তু রূঢ় নয়। সন্তান রূঢ়তা অপছন্দ করে, কিন্তু দৃঢ়তাকে শ্রদ্ধা করে। সময় বেঁধে দিন। রাত ১১টার পর ইন্টারনেট বন্ধ। সন্তানের জন্যে, নিজের জন্যেও। ডিজিটাল আফিম থেকে বাঁচাতে সন্তানকে মনোযোগ ও সময় দুই-ই দিতে হবে।

৩০ জুলাই ২০২১, ঢাকা

ই-কমার্স ॥
আপনি প্রতারিত হচ্ছেন না তো?

সম্প্রতি মিডিয়ায় আলোচনার একটা প্রধান বিষয় ছিল ই-কমার্সের নামে প্রতারণা। হাজার হাজার মানুষ কীভাবে প্রতারিত হয়েছে তার বিচিত্র কাহিনী উঠে এসেছে মিডিয়ার পাতায়। আমরা বার বার সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছি। ডিজিটাল প্রতারণা যে কত বহুরূপী হতে পারে, চোখ কান খোলা না রাখলে আপনি নিজেও এর নির্মম শিকার হতে পারেন। অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম ইভ্যালি নিয়ে এখন অনেকেই সরব।

আসলে এ নিয়ে তদন্ত হতে হতে, শোকজ নোটিশ পাঠাতে পাঠাতে, এক মন্ত্রণালয় থেকে আরেক মন্ত্রণালয়ে চিঠি যেতে যেতে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে করতে বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে। অবশ্য প্রতারণা করে মানুষের টাকা লোপাট করার যুগ শুধু যে এই ডিজিটাল যুগের সূচনাতেই হয়েছে তা নয়, সবসময়ই কিছু প্রতারক নানান ছলেবলে কৌশলে প্রতারণা করে এসেছে।

এই শতকের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতারণা শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। জিজিএন নামে একটি প্রতিষ্ঠান মানুষকে এমএলএম-এর (মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং) নামে প্রতারিত করতে শুরু করে। সেই সময়ই আমরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের এমএলএম সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম। জিজিএনের পরে এলো আইটিসিএল (ইসলামিক ট্রেড এন্ড কমার্স লিমিটেড)। তারা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুরাগকে ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। তারপর যুবক, ডেসটিনি, ইউনিপেটুইউ এবং এর সাথে ২৬৬টি সমবায় সমিতি লক্ষ লক্ষ মানুষের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে।

ডেসটিনির যখন রমরমা অবস্থা, সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আনুকূল্য পেয়ে যখন তারা তরতর করে মানুষের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, তখনো আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে তাদের প্রতারণার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলাম। ইউনিপেটুইউ-এর ব্যাপারেও আমাদের একই বক্তব্য ছিল। এরপরে শুরু হলো সাম্প্রতিক ই-কমার্স যুগ। গত পাঁচ বছরে ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ, ধামাকা শপিং-সহ আরো কত নামে কত কিছু! আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সতর্ক করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে।

পরম করুণাময় যে জ্ঞান, যে মস্তিষ্ক আমাদের দিয়েছেন, যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে এই মস্তিষ্ককে কাজে লাগাতে হবে। বিচার-বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। আমাদের কোয়ান্টাম সূত্র কিন্তু খুব সহজ—প্রতারণা করা নিঃসন্দেহে অপরাধ, কিন্তু প্রতারিত হওয়া অসম্মানের। যখনই আপনি প্রতারিত হচ্ছেন তখনই বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি আপনার সহজাত বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করেন নি। আপনি প্রলুব্ধ হয়েছেন এবং দ্রুত বড়লোক হওয়ার জন্যে দৌড় দিয়েছেন। দ্রুত পাওয়ার আশায় এ দৌড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিৎপটাং হওয়াটাই ভাগ্যে জোটে। কত রকম ঘটনা যে বেরিয়ে এসেছে ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ-এর মতো ই-কমার্স সাইট নিয়ে!

সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পেনশনের টাকা থেকে ২৫ লক্ষ লাখ টাকা তুলে ইভ্যালির সাইক্লোন অফারে ২০টি বাইক অর্ডার করেছিলেন। গত জুলাইয়ে এই অফারটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দুই মাস পেরিয়ে গেলেও বাইকগুলো বুঝে পান নি এই কর্মকর্তা। তারপর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ইনভয়েস-এর কাগজপত্র জমা দিয়ে অনুরোধ করেছেন বাইকের দরকার নেই, তাকে যেন আসল টাকাটা তুলে দেয়া হয়। এই কর্মকর্তা ব্যবসা বোঝেন না। মায়া লাগে। আহারে বেচারা! কর্মজীবনে হয়তো তিনি ফাইল চালাচালিতেই অভ্যস্ত ছিলেন কিন্তু এখন চাকরি নাই। মন্ত্রণালয়ে ইনভয়েস-এর কাগজপত্র দিয়ে যে আসল টাকাটা তুলে আনা সম্ভব নয়, এটা তিনি বোঝেন নি।

যখন ইভ্যালির সাইক্লোন অফার চলছিল, একটি বাইকে ৪০/৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেয়া হচ্ছিল। কর্মকর্তার ভাবনা ছিল, অফারের বাইকগুলো নিয়ে বাইরে বিক্রি করে কিছু বাড়তি আয় করবেন। সরকারি কর্মকর্তা মাস শেষে বেতন পেয়ে অভ্যস্ত। ব্যবসার রহস্য বোঝাটা তার হয়তো দক্ষতার বাইরে, কিন্তু একজন ব্যবসায়ী কীভাবে এই ভুল করতে পারেন!

পুরনো ঢাকার একজন ব্যবসায়ী বড় ছাড়ে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পণ্য কিনে আবার বিক্রি করতেন। এই রি-সেলিং বা পুনর্বিক্রি ব্যবসায়

সর্বশেষ বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছিল দুই কোটি টাকা, যা এখন আর ফেরত পাচ্ছেন না। তিনি পাঁচটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য কিনতে টাকা জমা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে দুটির মালিক প্রতারণার মামলায় কারাগারে, একটির মালিক বিদেশে পালিয়ে গেছে। দুটি প্রতিষ্ঠান টাকা ফেরত দিচ্ছে না। তিনি সাংবাদিককে বলেন, আমি এখন নিঃস্ব। টাকা ফেরত না পেলে আমার পরিবারের কী হবে সেই দুশ্চিন্তায় দু-মাস ধরে রাতে ঘুমাতে পারি না।

এই ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো যাদের কাছ থেকে পণ্য কেনে, তাদের কাছ থেকে ব্যবসায়ীরাও পণ্য কিনে আবার বিক্রি করেন। প্রত্যেক ব্যবসায়ী জানেন যে, কোন পণ্য কতটা কিনলে কত পার্সেন্টেজ পাওয়া যায়। একটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান কীভাবে বড় ছাড়ে ঐ পণ্য বিক্রি করে—ব্যবসায়ী হওয়ার পরে এই চিন্তা তার মাথায় যদি না আসে তো এই দোষ কি কপালের? ভাগ্যের? না এই দোষ হচ্ছে নিজের বুদ্ধিটা ব্যবহার না করা?

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতারণার বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে সাংবাদিকদের সামনে নিজের প্রতারিত হওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন এক মন্ত্রী। তিনি সাংবাদিকদের জানালেন যে, গতবছর ঈদে অনলাইনে গরু দেখে অর্ডার দেয়ার পরও কাঙ্ক্ষিত গরুটি তিনি বুঝে পান নি। পরে অবশ্য অপেক্ষাকৃত কম দামের একটি গরু বুঝিয়ে দেয়া হয়। সঙ্গে দেয়া হয় একটি ছাগল! তিনি বলেন, কোরবানির গরু ডিজিটাল হাটে বিক্রি করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী হিসেবে আমাকেও রাখা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে আমাকে একটা গরু দেখানো হলো। দাম বলা হলো এক লাখ টাকা। ভাবলাম, একটা গরু কিনি। ছয়-সাত দিন পর তারা আমাকে জানাল, সেই গরু আর নেই। তারপর অপেক্ষাকৃত কম দামের একটি গরু বুঝিয়ে দেয়া হয়, সঙ্গে দেয়া হয় একটি ছাগল। তিনি সাংবাদিকদের সামনে প্রশ্ন রাখেন, আমি মন্ত্রী। আমারই যদি গরু না থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে?

ডিজিটাল প্রতারণার জগতে একজন মন্ত্রীই যখন তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস পান না, তখন অনলাইন কেনাকাটায় আপনার কতটুকু সতর্ক থাকা দরকার—এটা বোঝানোর জন্যে আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি?

ই-কমার্সের নামে ডিজিটাল প্রতারণার ক্ষেত্রে শুধু **১১**টি প্রতিষ্ঠানই নয়, এমএলএম পদ্ধতি যারাই ব্যবহার করছে তাদের ব্যাপারেও যথাযথ তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এর মধ্যে রিং আইডি, গো ফাউন্ডার, অন প্যাসিভ-সহ আরো যত প্রতিষ্ঠান আছে, প্রতিটিরই এমএলএম তৎপরতা নিয়ে যথাযথ তদন্ত এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

প্রতারণার ক্ষেত্রে প্রতারক কোম্পানিগুলো যে-রকম দায়ী, একইভাবে যাদের কথা শুনে বা যাদের বক্তব্য দেখে মানুষ প্রলুব্ধ হয়, তাদের কি কোনো দায় নেই? যারা এ ধরনের কোম্পানির পক্ষে শুভেচ্ছা দূত হন, যারা তাদের বিজ্ঞাপনে অংশ নেন, তাদেরকে কি দায়মুক্ত ভাবা যায়?

২০১৬ সালে একটি নুডলস কোম্পানির বিজ্ঞাপন করার জন্যে ভারতের তিন জন খ্যাতনামা অভিনয়শিল্পী—অমিতাভ বচ্চন, প্রীতি জিনতা ও মাধুরী দীক্ষিত ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন। এই নুডলসে ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছিল বলে ভারতজুড়ে হইচই পড়ে যায়। ভারতের তদানীন্তন আইনমন্ত্রী তখন ক্ষতিকর পণ্য বা সেবার বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন বা ভুয়া তথ্য প্রচারের জন্যে তারকাদের ব্যক্তিগত দায় নির্ধারণ ও শাস্তির বিধান করে আইন প্রস্তাব করেন। সেই একই সময়ে চীনে আইন ছিল, কোনো তারকা কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন করতে চাইলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে সেই পণ্য ব্যবহার করে এর গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

ভারত ও বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন রয়েছে। এতে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন দেখে ভোক্তার ক্ষতি হলে জেল জরিমানার বিধান রয়েছে। কিন্তু এই আইনে বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ ও পণ্য বা সেবা অনুমোদন অথবা সুপারিশের জন্যে তারকাদের ব্যক্তিগত দায় নির্ধারণ করা নেই। সম্ভবত এ কারণেই তারকারা কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই এই পণ্য বা কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতে রাজি হয়ে যান। এভাবে নিজেদেরও যে ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে সেটা তারা আমলে নেন না।

তারকাদের ওপর তাদের ভক্তদের একধরনের আস্থা আছে। অসচেতনতার জন্যে আস্থার অপব্যবহার হয়ে গেলে তাদের অবশ্যই সেজন্যে ভুল স্বীকার করা এবং ক্ষমা চাওয়া উচিত। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানও যদি এ ধরনের প্রতারণামূলক ব্যবসায়িক উদ্যোগে ব্যবহৃত হয়, তবে সেই প্রতিষ্ঠানের দায়ও কিন্তু কম নয়। শুধু তারকা বা জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়, প্রতারক প্রতিষ্ঠানের প্রচারণার ক্ষেত্রে কোনো আলেম যাতে ব্যবহৃত না হন, সে ব্যাপারে তাদেরও সচেতন থাকা প্রয়োজন।

সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এহসান গ্রুপ নামে যে এমএলএম কোম্পানি গ্রাহকদের প্রতারিত করেছেন, তাদের পক্ষে একজন জনপ্রিয় আলেম নাকি দীর্ঘদিন ধরে প্রচারণা চালিয়েছেন। তিনি নাকি বলেছেন, এহসান গ্রুপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। যদি সন্দেহ করো, তাহলে তুমি মুনাফেক। এহসান গ্রুপ নাকি বাংলাদেশ নয়, গোটা জগতের জন্যে

রহমতস্বরূপ। আসলে তিনি হয়তো নিজেও বোঝেন নি যে, তিনি একটি প্রতারক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইনফ্লুয়েন্সার বা প্রলুব্ধকারক হিসেবে কাজ করছেন।

সাধারণ মানুষ আলেম সমাজকে সবসময়ই সম্মানের চোখে দেখে। সাধারণ মানুষ প্রত্যাশা করে, তাদের যে-কেউ যে-কোনো কোম্পানি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে-কোনো বক্তব্য দেয়ার আগে পুরো বিষয়টি আরো গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তারপরে মতামত ব্যক্ত করবেন।

প্রতারক তো প্রতারকই। প্রলুব্ধকারক বা ইনফ্লুয়েন্সার—সে তারকা হোন বা কোনো প্রতিষ্ঠান, তাদের দায় যেমন কম নয়, একইভাবে যিনি লোভে পড়ে প্রতারিত হয়েছেন, তার দায় কি কোনো অংশে কম? এমএলএম কোম্পানি—সেটা এনালগ হোক বা ডিজিটাল, ই-কমার্স হোক বা ধর্মের নামে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান—এদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। তারা যে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করতে পেরেছে, এর কারণ কী? আমাদের চারপাশের মানুষের দ্রুত বড়লোক হতে চাওয়ার প্রবণতা। খুব অনায়াসে, পরিশ্রম না করে পেতে চাওয়ার এক সর্বগ্রাসী সামাজিক প্রবণতা।

যারা স্বল্পমূল্যে পণ্য কেনার জন্যে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে আগাম টাকা দিচ্ছেন, তারা আসলে লোভের বশবর্তী হয়েই কাজটি করছেন। তারা শর্টকাটে পয়সাওয়ালা হতে চায়। পরিশ্রম করে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চেয়ে রাতারাতি যে-কোনো উপায়ে পাওয়ার প্রবণতা এদের অত্যন্ত প্রবল। তা বৈধ হোক বা অবৈধ, নৈতিক হোক বা অনৈতিক, যে পথেই হোক না কেন, বড়লোক হতে চাই। বড়লোক হতে গিয়ে কেউ প্রথমেই সব হারায়, কেউ-বা পেয়ে হারায়। যা আপনি শর্টকাটে পাবেন, সেটা শর্টকাটেই চলে যাবে। তা কখনো স্থায়ী সুখ, স্থায়ী সম্পদে রূপান্তরিত হবে না। পরকালের কথা বাদ দেন, তা ইহকালীন জীবনেও শান্তি-সুখের কারক হবে না।

আমরা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান যে, আমরা সত্যকে বুঝি, সত্যকে উপলব্ধি করি। আমরা যত প্রলুব্ধ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারব তত স্থায়ী সুখ-শান্তির পথে এগিয়ে যেতে পারব।

যেখানেই থাকুন নিয়মিত মেডিটেশন করুন। যেখানেই থাকুন সবসময় সঙ্ঘের সাথে, সত্যের সাথে, বিশ্বাসের সাথে একাত্ম থাকুন।

১ অক্টোবর ২০২১, ঢাকা

আগামীর মহামারি ॥ নিঃসঙ্গতা

দেশের এক বিশাল অঞ্চল এখন বন্যায় প্লাবিত। সিলেটের যে উঁচু অঞ্চলে কখনো বন্যার পানি ওঠে নি, সে অঞ্চলও প্রবল বর্ষণে পাহাড়ি ঢলে ডুবে গেছে। রাতে ঘুমোনোর সময় সব ঠিক ছিল। অনেকের ঘুম ভেঙেছে বিছানায় পানি ওঠার পর। অকস্মাৎ বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো আমাদের শত শত সদস্যও আক্রান্ত হয়েছেন। তারা পরিবারকে নিরাপদে সরিয়ে সাথে সাথে নেমে পড়েছেন বিপন্নদের নিরাপদ স্থানে সরতে সহায়তা করার জন্যে।

শুধু আমাদের কর্মীরা নয়, বহু মানুষ বিপন্নদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আসলে বিপন্নের পাশে দাঁড়ানো, এটাই আমাদের জাতিসত্তার সবচেয়ে বড় গুণ। আমাদের জাতিসত্তার সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে হৃদয়ভরা টান। হৃদয়ভরা টান পরিবারের জন্যে, পাড়া-প্রতিবেশীর জন্যে, গ্রামবাসীর জন্যে, দেশবাসীর জন্যে এবং এই হৃদয়ভরা টানের ফলে আমরা যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় পৃথিবীর সবচেয়ে সফল জাতি।

বন্যার্তদের কথা আমাদের বিশেষভাবে ভাবতে হবে। এখন তো অনেকেই বন্যার্তদের সাহায্য করতে নেমেছেন। অনেক দান আসবে, কিন্তু আসল কাজ শুরু হবে বন্যার পানি পুরোপুরি নেমে যাওয়ার পর। পুনর্বাসনের মূল কাজটা শুরু হবে তখনই। বরাবরের মতো আমরাও যাতে এই পুনর্বাসন কাজে ভালোভাবে অংশ নিতে পারি, সেজন্যে এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে। তাই ঈদের খরচ কমিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত বন্যার্তদের পুনর্বাসনে রিলিফ ফান্ডে সেই অর্থ দান করা। অন্যান্য বারের মতো আমরা ইনশাআল্লাহ এই পুনর্বাসন কাজে সাধ্যমতো অগ্রগামী থাকব।

শুধু বন্যা নয়, যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় বাঙালি সবচেয়ে সক্ষম জাতি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জ্বরাব্যাধি, সংক্রামক রোগ, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি মোকাবেলা করে আমরা আমাদের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছি হাজার বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে। অতএব আমরা অনায়াসেই দুর্যোগ মোকাবেলা করতে পারব। কিন্তু আমাদের সামনে যে মহামারি আসতে যাচ্ছে সেটার মোকাবেলায় এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ এই মহামারি মোকাবেলার কোনো অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। আমাদের আগাম সতর্কতাই এ থেকে রক্ষা পেতে প্রধান কারক হিসেবে কাজ করবে। এই মহামারি হচ্ছে একাকিত্বের মহামারি, নিঃসঙ্গতার মহামারি।

সাম্প্রতিক একটি ঘটনা নিয়ে আমরা আমাদের আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি। ঢাকায় একটি বহুতল ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এক তরুণী। সে ঐ ভবনেই তার বাবা-মা ও ছোট ভাইয়ের সাথে থাকত। তরুণীটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তার বাবা একজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। আত্মহত্যার দিন বিকেলে সে ছাদে ওঠে। বৃষ্টির মধ্যে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে। তারপর পলিথিনে মোবাইল ফোন ও একটি চিরকুট ঢুকিয়ে ১৬ তলার ওপর থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে এবং সেখানেই মারা যায়।

তার সুইসাইড নোটে লেখা ছিল, 'আমার জীবন একটা ব্যর্থ জীবন। না পারলাম বাবা-মাকে খুশি করতে, না পারলাম অন্য কাউকে খুশি করতে। একটা ঘটনা জানার পরও যখন কেউ চুপ করে থাকে, তখন সত্যিই সবকিছু অর্থহীন মনে হয়। আমি গেলে কিছু আসবে যাবে না, আমি জানি। Because every person is replaceable. আমি কাদেরকে ভালবাসি তারা সেটা জানে। কে বেশি কষ্ট পাবে সেটাও জানি। But nothing makes sense anymore.' তার সহপাঠীরা বলছে, সে প্রায়ই একা থাকত ও হতাশাগ্রস্ত ছিল। এই একাকিত্ব থেকে তৈরি মানসিক চাপ সইতে না পেরে তরুণীটি আত্মহননের পথ বেছে নেয় এবং সম্ভাবনাময় একটি জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত সমাপ্তি ঘটে। এটি দেশের একটি ঘটনা।

ঘটনাটির এক সপ্তাহ আগে পৃথিবীর অপর প্রান্তে টেক্সাসে হৃদয়বিদারক আরেকটি ঘটনা ঘটে। অটোম্যাটিক রাইফেল হাতে স্কুলে ঢুকে এক বন্দুকধারী ১৯ জন শিশু ও একজন শিক্ষিকাকে গুলি করে হত্যা করে। নিহত শিশুদের সবাই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত। হত্যাকারী রামোসের বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। এই হত্যাকাণ্ডের আগে তার নামে অপরাধের কোনো

রেকর্ড ছিল না। বয়স ১৮ হওয়ার পর প্রথম যে কাজটি সে করেছিল তা হলো, বৈধভাবে অস্ত্র ও প্রচুর বুলেট কেনা। আমাদের দেশে দোকান থেকে বিস্কিট কেনা যেমন সহজ, আমেরিকায় অস্ত্র কেনা ততটাই সহজ। যে কারণে ২০২০ সালে সেখানে ৪৫,২২২ জন মানুষ বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে!

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, ১৮ বছরের তরুণ রামোস কেন নির্বিচারে শিশুদের হত্যা করল? এই প্রতিহিংসার উৎস কোথায়? জন্মগতভাবে তো কেউ খুনি হয় না, অপরাধী হয় না। তাহলে এমন কেন ঘটল? *ওয়াশিংটন পোস্টের* প্রতিবেদন বলছে, শৈশব থেকে রামোস তোতলা ছিল। স্কুলে তার সহপাঠীরা এটা নিয়ে তাকে ক্ষ্যাপাত। রামোসের এক সহপাঠী জানায়, সে ছিল খুব লাজুক প্রকৃতির ছেলে। যখন সহপাঠীদের হাতে চরম বুলিংয়ের শিকার হলো, সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করল। স্কুলে যেতে চাইত না। কারো সাথে মিশত না। এক পর্যায়ে সে সোশ্যাল মিডিয়ার আশ্রয় নিল। অনলাইনে বন্ধু খুঁজতে থাকল। অনলাইনেও সে বুলিংয়ের শিকার হলো এবং তখন নিজেও অনলাইনে অন্যদের বুলিং করত। হুমকি দিত।

তার মা-বাবার মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না। তার মা ছিল মাদকাসক্ত। এটা নিয়েও সে ডিপ্রেসড থাকত। পারিবারিক সমস্যা ও বুলিং তাকে নিঃসঙ্গ বেপরোয়া ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। আর এর খেসারত দিল কোমলমতি ১৯টি শিশু, একজন শিক্ষিকা এবং তাদের পরিবার!

দুটি ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হতে পারে, কিন্তু যদি ঘটনার গভীরে ডুবে যান, দেখবেন যোগসূত্রটা খুব স্পষ্ট। একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা ঢাকার তরুণীটিকে ঠেলে দিয়েছে বিষণ্নতা ও আত্মহননের দিকে। আবার এই একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতাই মার্কিন তরুণটিকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলেছে।

একসময় ধারণা করা হতো, নিঃসঙ্গতা বৃদ্ধ বয়সের সমস্যা। পেশাগত বা গৃহস্থালি কাজ থেকে অবসর নেয়ার পর বৃদ্ধ বয়সে মানুষ নিঃসঙ্গতায় ভোগে। অনেক সমাজে একটা বয়সের পরে প্রবীণরা নিজের পরিবার থেকে দূরে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন। তারা ধর্মকর্ম বা ধর্মীয় আচার, ধ্যান বা মোরাকাবার মধ্যে ডুবে যেতেন। এর মধ্যেই তারা জীবনের একটা অন্য অর্থ, আনন্দ খুঁজে পেতেন। নির্জনবাস করলেও তারা আপনজনের মায়া-মমতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। আসলে একা থাকলেও তারা নিঃসঙ্গ ছিলেন না, কিন্তু এখন পরিবারের মাঝে থেকেও কিশোর-কিশোরী, যুবা, মাঝবয়সীরা নিঃসঙ্গতায় ভোগেন, একাকিত্বে ভোগেন, হতাশায় ভোগেন। এর কারণ কী?

গত কয়েক দশকে পৃথিবীজুড়ে সমাজ ও অর্থনীতির এক আমূল

পরিবর্তন ঘটে গেছে। সমাজ ও পরিবারের বুননটাও বদলে গেছে। বিলাসীপণ্য এখন অনেক তরুণ-তরুণীর কাছে প্রেমের চেয়েও বেশি কাঙ্ক্ষিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকার যে কথা বেনিয়ারা বলছে, আসলে তা অন্তরের সংযুক্তি সৃষ্টি করতে পারছে না। যে-কোনো কালের চেয়ে এখন মানুষ নিঃসঙ্গ বোধ করে সবচেয়ে বেশি। কারণ বায়বীয় সংযোগ কখনো মমতার স্পর্শ দিতে পারে না। প্রিয়জনের হাতের একটু স্পর্শ, আঙুলের একটু স্পর্শ, মা-বাবার আদরের স্পর্শ—মুহূর্তে একটা সংযোগ সৃষ্টি করে, একটা তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তা বায়বীয় মাধ্যম কখনোই পারে না। যে কারণে একাকিত্বকে নিঃসঙ্গতাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন আধুনিক মহামারি!

যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা সার্জন জেনারেল ড. বিবেক মূর্তি *হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ* পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। নিবন্ধে তিনি বলেন, 'Lonliness is a growing health epidemic.' অর্থাৎ একাকিত্ব ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যগত মহামারি।

'৪০ শতাংশের বেশি মার্কিন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক একাকিত্বে ভুগছে। সুখ-দুঃখের আলাপ করার জন্যে নিকটজন আছে, এটা বলার মতো লোকের সংখ্যা দিন দিন কমছে। সার্জন জেনারেল হিসেবে কাছ থেকে দেখেছি, একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে কিশোর-কিশোরীরা কীভাবে সহিংসতা, ড্রাগ ও গ্যাং কালচারে ঝুঁকে পড়ছে।' তিনি আরো বলেন, 'হৃদরোগ বা ডায়াবেটিস রোগের মূল উৎস একাকিত্ব। এ-ছাড়া অনেক রোগ দেখেছি, একাকিত্ব প্রায়শই এই রোগগুলোর মূল কারণ। এটা যে-রকম মানুষকে অসুস্থ করছে, তেমনি রোগীর রোগ নিরাময়কেও কঠিন করে তুলছে।'

তিনি গভীর দুঃখের সাথে বলেন, 'Loneliness and weak social connections are associated with a reduction in lifespan similar to that caused by smoking 15 cigarettes a day and even greater than that associated with obesity.' একাকিত্ব ও দুর্বল সামাজিক যোগাযোগ মানুষের আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে। দিনে ১৫টি সিগারেটে যে পরিমাণ আয়ু কমে, একাকিত্ব ও দুর্বল সামাজিক যোগাযোগ সেই পরিমাণ আয়ু কমিয়ে দেয়। এমনকি স্থূলতায় আক্রান্ত হলে যতটা আয়ু কমে তার চেয়েও বেশি আয়ু কমায় একাকিত্ব ও দুর্বল সামাজিক যোগাযোগ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ বা স্থূলতা কমাতে আমরা যতটা সোচ্চার, মানুষে মানুষে সামাজিক বন্ধন জোরদার করতে আমরা তেমন মনোযোগী নই। অথচ

হৃদরোগ ডিমেনশিয়া বিষণ্নতা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সাথে একাকিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর কর্মস্থলে একাকিত্ব কমিয়ে দেয় সৃজনশীলতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনী দেশগুলোর প্রেক্ষিতে ড. বিবেক মূর্তি যে কথাগুলো বলেছেন, আমাদের জন্যেও কথাগুলো প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, আমাদের সমাজের কিছু মানুষ পাশ্চাত্যের সামাজিক ব্যাধিগুলো অসচেতনভাবে রপ্ত করছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে আমরাও নিঃসঙ্গতার মহামারিতে আক্রান্ত হবো। তাই এখনই সময় বিষয়টা নিয়ে সামাজিকভাবে পদক্ষেপ নেয়ার।

মানুষ এখন একা কেন? একটা সময় ছিল অধিকাংশ মানুষ গোটা জীবন কাটিয়ে দিত জন্মস্থান বা পৈতৃক ভিটার আশেপাশে। কাজের প্রয়োজনে, বেশি উপার্জনের আশায়, নাগরিক জীবনের জৌলুসে মোহিত হয়ে মানুষ পরিবার বাসস্থান বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে অন্য শহরে বাস করতে শুরু করল। গ্রামে বা মফস্বল শহরে সবাই সবাইকে চেনে, খোঁজখবর রাখে। কিন্তু বড় শহরে কেউ কারো খোঁজ নেয়ারই সময় পায় না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাটাই ধীরে ধীরে মানুষকে নিঃসঙ্গ, একা করে তোলে।

একাকিত্বের আরেকটি কারণ হচ্ছে, দিনের বড় অংশ মানুষ কাটায় অফিসে। পরিবারের চেয়ে বেশি সময় কাটে সহকর্মীদের সাথে। সেখানে কত জনের সাথে তার মমতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে? কর্মস্থলে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি ডেস্ক, যে যার কাজে নিমগ্ন। ফ্রি সময় পেলেই স্মার্টফোনে বায়বীয় সঙ্গীর সাথে আলাপ। সহকর্মী, প্রতিবেশী কারো দিকে মন নেই। শুধু নিজের স্বার্থ। স্বার্থপর জীবনের মাশুল দিচ্ছে এখন সবাই।

মানুষ নিঃসঙ্গ জীব নয়। শুধু নিজেকে নিয়ে বাঁচা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে তার আনন্দের অংশীদার চায়, দুঃসময়ে কাউকে পাশে চায়। কষ্টের কথা শোনার জন্যে, দুঃখের কথা শোনার জন্যে মানুষ যদি নির্ভরযোগ্য কাউকে না পায়, তখন এই কষ্টটা আরো বেড়ে যায়। সে আরো একা হয়ে যায়। যখন একা হয়ে যায়, তখন সে হাঁপিয়ে ওঠে। জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

আমরা যদি আমাদের বিবর্তনের ইতিহাস দেখি তাহলে আমরা দেখব, আমাদের মমতা এবং অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষমতা, সহযোগিতা করার ক্ষমতাই আমাদের অতিকায় বা হিংস্র প্রাণী থেকে সুরক্ষা দিয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে এই সামাজিক যোগাযোগের গুরুত্ব আমাদের নার্ভাস সিস্টেমে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তাই যখন সামাজিক যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে

যায়, তখন তা আমাদের দেহ-মনে স্ট্রেস বা চাপ সৃষ্টি করে, যা আমাদের শরীরে স্ট্রেস-হরমোন কর্টিসলের প্রবাহ বাড়িয়ে দেয়। কর্টিসল শরীরে একধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করে; যা হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, গিঁটে গিঁটে ব্যথা, বিষণ্নতা, স্থূলতা এবং অকালমৃত্যুর কারণ হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে আপনি প্রশ্ন করবেন, তাহলে করণীয় কী?

মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রথম করণীয়—বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ বাড়ান। ২০১৭ সালে আমেরিকান জার্নাল অব এপিডেমিওলজিতে প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়, একজন মানুষ ফেসবুকে যত সময় কাটাবে, তার মানসিক প্রশান্তি তত কমবে। বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ শুধু মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে নয়, রোগ থেকে সেরে উঠতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্তন ক্যান্সার থেকে সেরে ওঠা নারী যদি সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে, তার আবার ক্যান্সারে বা অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এজন্যেই নবীজী (স) রোগীকে দেখতে যাওয়ার ওপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন। যখনই একজন রোগী দেখে যে, তাকে কেউ দেখতে এসেছে, তার প্রতি কারো মমতা রয়েছে, তখন তার বেঁচে থাকার আকুতিটা বেড়ে যায়, যা তার সুস্থতার জন্যে অত্যন্ত সহায়ক। অতএব অসুস্থদের দেখতে যাবেন। রোগী উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি আপনি যে সুস্থ আছেন, স্রষ্টা যে আপনাকে ভালো রেখেছেন এই সত্যটি আপনাকে কৃতজ্ঞ করবে। আসলে হাঁটা বা দৌড়ানোর অভ্যাস যে-রকম শারীরিক সুস্থতার জন্যে উপকারী, তেমনি সচেতনভাবে বাস্তব সামাজিক যোগাযোগ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী।

দ্বিতীয় করণীয়—পরিচিত ও অপরিচিত নির্বিশেষে সালাম দিন। একাকিত্বের প্রতিষেধক হিসেবে কথাটি শুনে আপনি মুচকি হাসতে পারেন, কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, একাকিত্বের মহামারি থেকে নাগরিকদের বাঁচাতে ধনী দেশগুলো কোটি কোটি ডলার খরচ করে অভিনব সব পদক্ষেপ নিচ্ছে।

ইংল্যান্ড নিয়োগ করেছে মিনিস্টার ফর লোনলিনেস। মার্কিন সেনাবাহিনী ফিজিক্যাল ফিটনেসের পাশাপাশি সৈনিকদের সোশ্যাল ফিটনেস বাড়াতে ওয়ার্কশপ করাচ্ছে। আমেরিকায় একটি মিডিয়া ক্যাম্পেইন সম্প্রতি জনপ্রিয় হয়েছে। ক্যাম্পেইনটি হলো—Just say hello. কী সেটা? বন্ধু-অপরিচিত যার সাথেই দেখা হয় তাকে 'হ্যালো' বলো।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর কগনিটিভ এন্ড নিউরোসায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক জন ক্যাসিওপ্পো ২০ বছর ধরে নিঃসঙ্গতা নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বলেছেন, 'পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে হ্যালো

বলার অভ্যাস সোশ্যাল মাসল বাড়াবে।' এই সামাজিক মাসল বা পেশি আমাদের সবচেয়ে বড় বিবর্তিত গুণ। তিনি বলেন, 'হাজার বছর ধরে অন্যান্য প্রাণীর ওপর আমাদের বিজয়ের কারণ হচ্ছে আমরা যুক্তি দিতে পারি, যোগাযোগ করতে পারি, একসাথে কাজ করতে পারি ও একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারি, যা নিঃসঙ্গতার বিপরীত।'

আসলে মানবীয় প্রকৃতির বিপরীত হচ্ছে একা থাকা, নিঃসঙ্গ থাকা। আমরা সামাজিক প্রাণী। আমাদের সামাজিক পেশি রয়েছে। যত এই সামাজিক পেশি বাড়াবেন তত আমরা সুস্থ থাকব। আমেরিকান মনোবিজ্ঞানীর কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হলে হাজার হাজার ডলার কনসালটেন্সি দিতে হবে এবং স্বাভাবিকভাবে তার পরামর্শটা বৈজ্ঞানিক। অথচ এখন থেকে ১৪শ বছর আগে নবীজী (স) বলে গেছেন, 'সর্বত্র সালামের প্রচলন করো (প্রথম সুযোগেই আগে সালাম দাও)। তোমরা লাভ করবে শান্তি ও নিরাপত্তা।' *[বারা ইবনে আজিব (রা); আহমদ, মুফরাদ]*

'ইসলামে সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে, পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সবাইকে আগে সালাম দেয়া ('আসসালামু আলাইকুম' বলা) এবং অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানো।' *[আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ]*

সালাম কেন সর্বোত্তম কাজ? কারণ সালামের চর্চা সমাজে শান্তি আনে। তাই একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার অনাগত মহামারি থেকে নিজেকে, নিজের পরিবারকে, প্রিয়জনকে বাঁচানোর জন্যে আজ থেকেই সালামের চর্চা করুন। যার সাথেই দেখা হোক, আগে সালাম দিন। বলুন, আসসালামু আলাইকুম। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। সন্তানকে আগে সালাম দিন। স্ত্রী বা স্বামীকে আগে সালাম দিন। বোন বা ভাইকে আগে সালাম দিন। প্রতিবেশীকে আগে সালাম দিন। বয়স্ককে আগে সালাম দিন। শিশুকে আগে সালাম দিন। অর্থাৎ সালাম দেয়ার ক্ষেত্রে যত আপনি অগ্রগামী হবেন, সোশ্যাল ফিটনেস তত বাড়বে। আমরা 'জাস্ট সে হ্যালো' বাক্যটির মাঝে নবীজীর (স) এ হাদীসের শিক্ষারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

সামনে ঈদুল আজহা। আপনি প্রিয়জনের সাথে, পরিবারের সাথে সময় কাটানোর চমৎকার সুযোগ পাবেন। আমরা প্রত্যাশা করছি, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যত বেশি সম্ভব মানুষের সাথে দেখা করে, খোঁজখবর নিয়ে, পরিচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে মজবুত হবে আপনার সোশ্যাল ফিটনেস।

১ জুলাই ২০২২, ঢাকা

ঈদ আনন্দে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করুন

ঈদুল আজহার মূল বৈশিষ্ট্য হলো হজ এবং কোরবানি। সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের জন্যেই জীবনে একবার হজ পালন ফরজ। আর অধিকাংশ সামর্থ্যবান মুসলমান প্রতিবছর গবাদি পশু কোরবানি দিয়ে থাকেন। কোরবানির সূচনা হয়েছিল মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসেবে। আমরা জানি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ইব্রাহিম (আ) নিজের সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকে কোরবানি দিতে উদ্যত হন এবং দয়াময় সন্তুষ্ট হয়ে প্রিয় সন্তানের স্থলে একটি দুম্বা কোরবানি করার ব্যবস্থা করে দেন। সেই থেকেই কোরবানির শুরু।

ঈদুল আজহা সবসময়ই স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য এবং স্রষ্টার যে-কোনো নির্দেশ কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করার মানসিকতাকে প্রকাশ করে। পাশাপাশি একজন মানুষের মমতা, সোশ্যাল মাসল-কে দৃঢ় করা, ফিট করার একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে কোরবানির ঈদ। শুধু ঈদ নয়, প্রতিটি সামাজিক উৎসবে আন্তরিক অংশগ্রহণ একজন মানুষের সামাজিক ফিটনেসকে সুদৃঢ় করে।

আমরা যদি ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদের তাৎপর্য অনুসন্ধান করি তাহলে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই, সূরা হজের ৩৪ ও ৩৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে কোরবানিকে ইবাদতের অংশ করেছি। যাতে জীবনোপকরণ হিসেবে যে গবাদি পশু তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে আর (সবসময় যেন মনে রাখে) একমাত্র আল্লাহই তাদের উপাস্য। অতএব তাঁর কাছেই পুরোপুরি সমর্পিত হও।'

সূরা হজের ৩৬ নম্বর আয়াত : '... কোরবানির পশু যখন জমিনে লুটিয়ে

পড়ে, তখন তা থেকে তোমরা খাও এবং কেউ চাক না চাক সবাইকে খাওয়াও। এভাবেই আমি গবাদি পশুগুলোকে তোমাদের প্রয়োজনের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।'

কোরবানি দেয়া পশুর গোশত অভাবী সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে বিতরণ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা সমমর্মিতাকে লালন করার শিক্ষা দেয়। সূরা হজের ২৮ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, '... তা (জবাই করা পশু) থেকে তোমরা খাও এবং অভাবী দরিদ্রদের খাওয়াও।' এখানে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অভাবী মানুষের কথা বলা হয়েছে। অভাবী মানুষ যে ধর্মের, যে বর্ণের, যে গোত্রেরই হোক না কেন, তার হক আছে এই গোশতে। নবীজীও (স) এই উদার শিক্ষা দিয়েছেন।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চার জন মুহাদ্দিসের একজন ইমাম আবু বকর ইবনে আবু শায়বাহ। তার স্বনামধন্য ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ। ইমাম ইবনে আবু শায়বাহ কত বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস ছিলেন তা আমরা এ থেকেই আঁচ করতে পারি। ইমাম ইবনে আবু শায়বাহর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ *মুসাননাফ ইবনে আবু শায়বাহ* নামে পরিচিত। এই কিতাবের একটি হাদীস হলো, নবীজী (স) বলেন, Donate in charity to people of all faiths.

সকল ধর্মের সকল বিশ্বাসের অভাবী মানুষকে তুমি দান করো। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অভাবী মানুষকে দান করা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, নবীজীর (স) এই হাদীস থেকে আমরা সুস্পষ্ট বুঝতে পারি।

আল্লাহ তায়ালা কোরবানিকে ইবাদতের অংশ করেছেন, যাতে একজন মানুষ রাগ ঘৃণা ঈর্ষা হিংস্রতা অহংকার পরশ্রীকাতরতা—সমস্ত নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হয়ে মানবিকতার গুণ অর্জন করতে পারে, পরিশুদ্ধ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। অর্থাৎ নিজের ভেতরের পশু-প্রবৃত্তিকে কোরবানি দেয়ার উদ্দেশ্যেই ঈদুল আজহার সকল আয়োজন। কিন্তু বেনিয়ারা সবসময়ই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো তাদের মুনাফার বাহনে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। এখন বিশ্বজুড়ে পণ্যদাসত্বের ও বাণিজ্যিকীকরণের যে জোয়ার, তার প্রভাব কোরবানির ওপরেও এসে পড়েছে। কোরবানি অধিকাংশের জন্যেই ধর্মীয় আচার এবং অনুষঙ্গ। কিন্তু ভুল জীবনদৃষ্টির কারণে একশ্রেণির মানুষ কোরবানিকে ব্যবসা, লোক-দেখানো আড়ম্বর আর নিজের সামর্থ্য প্রদর্শন করে বাহবা কুড়ানোর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে।

অনেক মিডিয়াতে চমকপ্রদ অভিনব সব শিরোনাম—হাট কাঁপাবে এবার

মানিক চান, বিগ বস, রাজাবাবু, চিতা বাঘ, হোয়াইট টাইগার, বাংলার বস! এগুলো সবই গরুর নাম। বড় করে গরুর ছবি আর দাম উল্লেখ করে চলছে প্রচার। কারণ কোরবানি এলেই প্রতিবেশী সহকর্মী বা আত্মীয়ের চেয়ে বড় আকারের গরু কোরবানি দিতে পারাটাকেই মর্যাদার বিষয় বলে মনে করেন অনেকে। লোক-দেখানো ইবাদতের মধ্যে কি কোনো কল্যাণ থাকে? কোরবানির পশুকে আমরা অনেকে স্রেফ পণ্য বানিয়ে ফেলি এবং ভুলে যাই কোরবানির পশু কোনো পণ্য নয়, কোরবানির পশু মহান স্রষ্টার নির্দেশ পালনের এক অনুষঙ্গ।

আমরা যারা সচেতন, আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা এই আড়ম্বরের প্রতিযোগিতায় নিজের অজান্তে জড়িয়ে না পড়ি। আমরা কোরবানি দেয়ার ক্ষেত্রেও শুদ্ধাচারী থাকতে চাই। *শুদ্ধাচার* বইয়ের কোরবানির শুদ্ধাচার অধ্যায়ের কয়েকটি পয়েন্ট আমরা আবার স্মরণ করতে পারি :

১. কারো কাছে কোরবানির পশুর দাম জিজ্ঞেস করবেন না। কোরবানির পশুর কোনো দাম হয় না। কারণ কোরবানির পশু কোনো পণ্য নয়। এটি পরম করুণাময়ের নির্দেশ পালনের অনুষঙ্গ মাত্র।
২. কেউ পশুর দাম জানতে চাইলে বলুন, 'আল্লাহ যা সামর্থ্য দিয়েছেন তার মধ্যেই কেনার চেষ্টা করেছি।'
৩. কোরবানির পশুর দাম ও আকার নিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা করা থেকে বিরত থাকুন।
৪. কোরবানির গোশতের পরিমাণ ও ওজন নিয়ে কারো সাথে আলাপ করা থেকে দূরে থাকুন।
৫. কোরবানির পশু কেনার পরে বাজারদর যাচাই করে অহেতুক আলাপে যাবেন না। 'দামে ঠকে গেছি' এ ধরনের আফসোস করবেন না।
৬. কোরবানির গোশত যথাযথভাবে বিতরণ করুন। তিন দিনের বেশি সংরক্ষণ না করাই উত্তম। নিজের জন্যে সেই পরিমাণ গোশত রাখবেন, যা তিন দিনে আপনারা খেতে পারবেন।

কোরবানির গোশত সংরক্ষণ করতে হবে শুধু এই উদ্দেশ্যে ফ্রিজ কিনবেন না। কোরবানি এলেই ফ্রিজ কেনার হিড়িক পড়ে যায়। ঋণ করে বা কিস্তিতে ফ্রিজ কিনবেন না। যখন ঋণ এবং কিস্তিতে আপনি ফ্রিজ কিনছেন, আপনি কোরবানির গোশতের সাথে সুদকেও জড়িয়ে ফেলছেন।

৭. কয়দিন পর কোরবানি করব, এমনটা ভেবে পশুর অযত্ন করবেন না।
৮. জবাই করার সময় পশুকে অহেতুক কষ্ট দেবেন না।

নবীজী (স) কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, জবাই করার সময় পশুকে যেন অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া না হয়। জবাইয়ের দা-ছুরি যাতে ভোঁতা না থাকে। *মুসলিম শরীফের* হাদীস হচ্ছে, রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'প্রত্যেক বস্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা আল্লাহ আবশ্যক করেছেন। তাই কোনো জন্তু জবাই করতে হলে উত্তমভাবে জবাই করো।' অর্থাৎ ছুরি-চাকু ভালোভাবে ধার দিয়ে নিলে জবাই করা সহজ হবে।

নবীজীর (স) জীবনের একটি ঘটনা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত : 'এক লোক একটা ভেড়া জবাই করার জন্যে মাটিতে শোয়ায়। এরপর সে চাকুতে ধার দিতে শুরু করে। নবীজী (স) যখন দেখলেন, তাকে বললেন, তুমি কি ভেড়াটাকে কয়েকবার মারতে চাও? শোয়ানোর আগে কেন চাকু ধারালে না?'

পশু জবাইয়ের পর পশুর শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বের হয়ে যাওয়ার জন্যে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে এবং প্রাণস্পন্দন একেবারে থেমে যাওয়ার পর চামড়া ছাড়ানো শুরু করতে হবে। প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার আগেই অনেকে তাড়াহুড়া করে চামড়া ছাড়াতে শুরু করেন। এটা অত্যন্ত অনুচিত।

৯. কোরবানির পশুর সাথে সেলফি তুলবেন না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ সম্পর্কিত প্রচার থেকে পুরোপুরি বিরত থাকবেন।

১০. খাদ্য উৎসবে মেতে উঠবেন না। ঈদ ও ঈদ পরবর্তী সময় পরিমিত আহার করুন। অতিভোজন করবেন না।

ঈদ পরবর্তী সময় প্রতিদিন গোশত খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অতিরিক্ত রেড মিট খাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম, যা রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। আর উচ্চ রক্তচাপ থেকে হৃদরোগ স্ট্রোক ও কিডনি জটিলতা দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত গরুর গোশত খাওয়ার ফলে কোলেস্টেরল হার্টের ধমনীতে জমে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত করে। ফলে হার্টে পর্যাপ্ত রক্ত চলাচল করতে পারে না এবং অক্সিজেনের অভাব হয়। এ কারণে হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকগুণ বেড়ে যায়।

ইন্টারন্যাশনাল আর্কাইভ অব মেডিসিন-এর এক গবেষণায় বলা হয়েছে, যারা গরুর গোশত বেশি খান তাদের ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক বেশি। এ-ছাড়া গরুর গোশত বেশি খেলে টাইপ টু ডায়াবেটিস, স্থূলতা, আর্থ্রাইটিস, কোষ্ঠকাঠিন্য, ত্বকের সমস্যাসহ নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাহলে কতটুকু গোশত খাবেন? পরিমিত খাবেন। কোরবানির তিন দিন পরিমিত

পরিমাণ গোশত খাবেন। প্রতিবেলায় দু-চার টুকরার বেশি না খাওয়াই ভালো। কোরবানির ছুটিতে প্রতিবেলা সবুজ সালাদ, শাকসবজি আর প্রচুর পানি পান করবেন। আপনি শারীরিকভাবে অনেক ভালো থাকবেন।

ঈদের ছুটির পুরোটাই নিজের সামাজিক পরিমণ্ডলে কাটান। সবার সাথে যোগাযোগ করুন। সবাইকে আগে সালাম দিন। এসময় মা-বাবা বা বয়স্ক আত্মীয়দের রেখে শুধু সন্তানকে নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণে যাবেন না। তাহলে এই সন্তান বড় হয়ে সে-ও পরিবারবিমুখ হতে পারে এবং আপনাকে একইভাবে ঘরে ফেলে রেখে নিজের সন্তানকে নিয়ে ঈদ করতে প্রমোদ ভ্রমণে যাবে।

ঈদের আনন্দ বহুগুণে বেড়ে যাক আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অভাবীদের মধ্যে কোরবানির গোশত বিতরণের মধ্য দিয়ে। আপনার কোরবানি যথার্থই নিজের পশুত্বের বিনাশ এবং মানবিকতা বিকাশের অনুষঙ্গ হোক। পরম করুণাময়ের কাছে এটাই আমাদের প্রার্থনা। আপনি ভালো থাকুন। পরিবারের সাথে থাকুন, প্রিয়জনের সাথে থাকুন, স্বজনের সাথে থাকুন।

নবীজী (স) খুব সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘স্বজন-পরিজন-সুজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারীর আয়ু যেমন বাড়ে, তেমনি প্রবৃদ্ধি ঘটে উপার্জনে।’ *[আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী]*

আপনি দীর্ঘায়ু হোন, আপনার উপার্জনে প্রবৃদ্ধি ঘটুক।

৮ জুলাই ২০২২, ঢাকা

সঙ্ঘে একাত্মতা জীবনে আনে গতি

সঙ্ঘে একাত্মতা জীবনে আনে ইতিবাচক পরিবর্তন। এটার সাথে আমি যুক্ত করতে চাই—শুধু জীবনে না, মরণেও আনে ইতিবাচক অর্জন। কারণ যিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তার ইতিবাচক অর্জন শুধু একটাই—দোয়া।

সঙ্ঘে একাত্মতা জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে, এটার প্রমাণ তো আমরা নিজেরাই। গতবছর আমাদের বার্ষিক রিপোর্টে লেখা ছিল—একা হলে ব্যক্তি, সঙ্ঘে এলে শক্তি। ২০২০ সালে করোনাভাইরাস আমাদেরকে দারুণ একটা উপলব্ধি দিয়েছে। সেটা হলো, একা হলে ব্যক্তিও না, একা হলে নিঃস্ব। যখন কেউ একা হয়ে যায় তখন সে নিঃস্ব। সঙ্ঘে এলে সে হয় শক্তি। এজন্যেই মহামানবেরা সঙ্ঘকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন। যদি একা হলে শক্তি হতো, একা হলে ইতিবাচক থাকা যেত, একা থাকার মধ্যে কল্যাণ থাকত, তাহলে মহামানবেরা কখনো সঙ্ঘ করতেন না, সঙ্ঘের নেতৃত্ব দিতেন না।

একা ইবাদত করলে কী অবস্থা হয় সেটা আমরা হাদীসে দেখি। এক শহরে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা পাঠালেন এবং বললেন, এই শহরের অধিবাসীরা খুব জালেম হয়ে গেছে। এটাকে উল্টে দাও। ফেরেশতারা এসে রিপোর্ট করল, হে আল্লাহ! ওখানে তো একজন আবেদ বাস করেন, যিনি নির্জনে নীরবে সারাক্ষণ আপনার নাম জপছেন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, শহরটাকে উল্টে তার মাথার ওপরে ফেলো! [কারণ তিনি একাই শুধু ভালো থাকতে চেয়েছেন। মানুষের কাছে ভালো থাকার জ্ঞান পৌঁছে দেন নি।]

একা হলে মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়, সঙ্ঘে এলে সে-ই হয় শক্তি। আমাদের বাংলার মহামানব মহামতি বুদ্ধ। তার তিনটি মন্ত্রের একটি মন্ত্র হচ্ছে, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—সঙ্ঘের পথে চলতে হবে। সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি ২৭শ বছর

আগে তিনি অনুভব করেছেন এবং তিনি সঙ্ঘ গড়েছেন।

একইভাবে বেদবাণী হচ্ছে, 'হে মানবজাতি! তোমরা সম্মিলিতভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হও। পারস্পরিক মমতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে একত্রে পরিশ্রম করো। জীবনের আনন্দে সম-অংশীদার হও।' *[অথর্ববেদ : ৩.৩০.৭]*

সাইকেলে চড়েছেন অনেকে। সাইকেলের চাকার শিকগুলো কেন্দ্রে গিয়ে মিলিত হয়। পুরো ভারটা কিন্তু এই শিকের ওপর থাকে এবং তাতে গতির সঞ্চার হয়। এই শিকগুলো যদি এক জায়গায় গিয়ে মিলিত না হতো, তাহলে গতির সঞ্চার হতো না। সেজন্যে বলা হয়েছে, তোমরা একত্র থাকো।

বাইবেলে একইভাবে বলা হয়েছে, 'ভালোকে আঁকড়ে ধরো। ভ্রাতৃসম মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হও।' *[রোমীয় : ১২:৯-১৩]*

নবীদের প্রার্থনা কী ছিল? 'আমাকে সমর্পিত ও সৎকর্মশীলদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ হিসেবে মৃত্যুদান করো।' *[সূরা ইউসুফ : ১০১]*

রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সঙ্ঘ থেকে এক বিঘত দূরে সরে গেল (এক বিঘত মানে নয় ইঞ্চি), সে তার বিশ্বাসের মালা গলা থেকে নিজেই খুলে ফেলল।' *[আবু যর গিফারী (রা); আবু দাউদ]*

অর্থাৎ সঙ্ঘ থেকে দূরে গেলে বিশ্বাস থাকে না। সঙ্ঘের সাথে আল্লাহর রহমত থাকে। সঙ্ঘ থেকে যে বিচ্যুত হয়, সঙ্ঘ থেকে যে দূরে সরে যায়, সে আসলে অনন্ত অশান্তির আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়।

আমরা জাহান্নামের যন্ত্রণার কথা বলি। করোনাকালে যারা বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং এখনো যারা বিচ্ছিন্ন আছেন, যাদের সঙ্ঘ নাই, তাদের জীবনের আতঙ্ক জাহান্নামের যন্ত্রণার চেয়ে কোনো অংশে কি কম? কোনো অংশে কম নয়। তাই যে সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। যে কারণে আমরা দেখি, যুগে যুগে কালে কালে যারাই বিশ্বাসের পথে ডাক দিয়েছেন, যারা কল্যাণের পথে মানুষকে আহ্বান করেছেন, তারা সবসময় সঙ্ঘ গড়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দেখুন। তিনি 'রামকৃষ্ণ মিশন' করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন সত্যের সন্ধান পেলেন, সত্যকে উপলব্ধি করলেন, তখন তিনি হারিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ সাধনার এই জগৎ থেকে তিনি বের হতে চান নি। বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'তোকে তো আমি একটা বিশাল বটবৃক্ষ ভেবেছিলাম। তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ, হীন কথা।'

এরপর স্বামী বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ মিশন' করলেন এবং তিনি তার

উপলব্ধিজাত সত্যকে প্রকাশ করলেন। সে সত্যটা কী? 'জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর!'

ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। তিনি অবশ্য খুব রসিকতা করে বলতেন, 'নাম আমার অনুকূল হলে কী হবে, কোনো প্রতিকূলতা আমাকে ছাড়ে নি।'

কতটা প্রতিকূলতা? যখন দেশভাগ হলো তখন তিনি বিহারে ছিলেন। দেশে আসতে চাইলেন, কিন্তু তখনকার সরকার তাকে এ দেশে আসতে দেয় নি। তার ওপর সরকারের রোষ এতটাই ছিল যে, হেমায়েতপুরে তার যে জায়গা-জমি ছিল, সেখানে মানসিক রোগের হাসপাতাল করল। যেটা ঠাকুর অনুকূলের সৎসঙ্ঘের জায়গা হিসেবে বিখ্যাত হতে পারত, সেটা হয়ে গেল মানসিক রোগের হাসপাতাল! এখন হেমায়েতপুর মানেই মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের চিকিৎসাকেন্দ্র। কিন্তু তার সঙ্ঘ কি বিলীন হয়ে গেছে? তার সঙ্ঘ বিলীন হয় নি। তার সঙ্ঘ এখনো আছে। বিভিন্ন জায়গায় তার সঙ্ঘের শাখা রয়েছে।

আমাদের দায়িত্বশীল কর্মী ছিলেন সালেহ সাহেব। তিনি তার পীর সাহেবের কাছে শোকরগোজারি শিখেছিলেন। তার পীর সাহেব দেহত্যাগ করার আগে তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি ওখানে যাও!' সালেহ সাহেব সৎপথে ছিলেন বলে তাকে আরেকটা সঙ্ঘে দিয়ে গেলেন।

তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একইভাবে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন সঙ্ঘের প্রতি। আমার এখনো মনে আছে—তিনি আমাদের পারচেইজ টিমের প্রধান ছিলেন। প্রত্যেক মাসে একটা-দুটো মিটিং হতো। কোনো মিটিং তিনি মিস করেন নি। তখন তার ডায়ালাইসিস হচ্ছিল। তিনি ডায়ালাইসিসের যন্ত্রপাতি সাথে নিয়ে মিটিংয়ে আসতেন। আমি বললাম, ওনার তো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অসুবিধা হয়, মিটিং নিচ তলায় করেন। সালেহ সাহেব বললেন, না, মিটিং নির্ধারিত রুমেই হবে।

তিনি যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, তার স্ত্রী পাশেই ছিলেন। তিনিও কিছু বুঝতে পারেন নি। রাত্রিবেলা তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো? উত্তর : ভালো আছি। তিনি ছিলেন ডেথবেড-এ। তখনো বলছেন, ভালো আছি! এটা হলো শোকরগোজারি। মনে হচ্ছিল, শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় যে-রকম একটা পুলক অনুভব হয়, সে-রকম তৃপ্তির সাথে তিনি কথা বলেছেন হাসপাতালের ডেথবেড থেকে।

সেদিন ছিল ভরা পূর্ণিমা। রাত্রিবেলা যখন তাকে লামার জাবলে

রাজিউনে কবরে নামানো হচ্ছে, মনে হচ্ছিল পূর্ণিমা আলো দিচ্ছে তার কবরে। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। যে-কোনো পরিবারের যে-কেউ মারা গেলে জানাজা, দাফন, কাফন নিয়ে কত ঝামেলা পোহাতে হয়, কিন্তু তার পরিবারের এসব কিছুরই সম্মুখীন হতে হয় নি। কারণ সব জায়গায় সঙ্ঘের উপস্থিতি ছিল।

আরো বহু মানুষ মারা গেছেন গত একবছরে। তাদেরকে কত জন স্মরণ করছে? আর যারা সঙ্ঘে ছিলেন তাদেরকে কত জন স্মরণ করছে? কত জন দোয়া করছে? এটা দেখলেই বোঝা যায় যে, সঙ্ঘ শুধু জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে না—সঙ্ঘে থাকলে তার ইহকাল-পরকাল, দুই কালই ইতিবাচকতার মাঝে বিলীন হয়ে যায়।

২৯ জানুয়ারি ২০২১, ঢাকা

ধ্যানঘর ॥
ভালো মানুষ, ভালো দেশ

ধ্যানঘর সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা ক্রিস্টালের মতো স্বচ্ছ হওয়া উচিত। ধ্যানঘর কী, ধ্যানঘর কেন—এ নিয়ে আলোচনা করার আগে ধ্যান কী, এই উত্তরটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া উচিত।

আমরা জানি, এককথায় ধ্যান হচ্ছে পরমসত্তার সাথে যোগাযোগের প্রক্রিয়া। নবীজী (স) ধ্যানকে কত গুরুত্ব দিয়েছেন তা বোঝা যায় আল্লামা ওসমান নুরীর Contemplation in Islam বইয়ে *বায়হাকি শরীফের* একটি হাদীসের উদ্ধৃতি থেকে। তিনি বলেছেন, There is no worship like contemplation. অর্থাৎ গভীর ধ্যানের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোনো ইবাদত নেই। আসলে স্রষ্টার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া সবচেয়ে বড় ইবাদত।

কেন প্রত্যেকটা ধর্ম ধ্যানকে এত গুরুত্ব দিয়েছে? কেন আল্লাহর রসুল (স) ধ্যানকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন? কারণ ধ্যান মানুষকে পরম সত্য উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যায়। সত্যটা তখন নিজের হয়, সত্যটা তখন আপন হয়। অন্তরে যে সুপ্ত শক্তির ভাণ্ডার রয়েছে, তা উন্মোচন করে ধ্যান। জীবনকে আশাবাদে, শুকরিয়ায় ভরিয়ে দেয়। আমরা কোয়ান্টামে বলি, field of pure potentialities বা বিশুদ্ধ সম্ভাবনা ক্ষেত্রের সাথে ধ্যান মানুষের সত্তাকে সংযুক্ত করে। তখন তিনি অবলীলায় বিশ্বাস করেন—স্রষ্টা চাইলে সবকিছুই সম্ভব। বিশুদ্ধ সম্ভাবনা ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত হতে পারাটাই সমস্ত অর্জন বা সাফল্য। এই অর্জন ইহকালীন এবং পরকালীন সাফল্যের পথকে সহজ করে।

নিউরোসায়েন্টিস্টরা গত ২৫ বছর গবেষণা করে এখন বলছেন যে, ধ্যান হচ্ছে ব্রেনের ব্যায়াম। ধ্যান ব্রেনের কর্মকাঠামোকে সুবিন্যস্ত সুসংহত গতিময়

ও প্রাণবন্ত করে। ব্রেনকে বেশি পরিমাণে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করার সামর্থ্য বাড়ায় এবং একজন মানুষের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করে। শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আত্মিক ফিটনেসের পথ উন্মোচন করে। মনকে প্রশান্ত করে, অস্থিরতা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও হতাশা থেকে মুক্ত করে। অসহিষ্ণুতা রূঢ়তা ও অমানবিকতার পরিবর্তে আচরণে আনে বিনয় এবং সমমর্মিতা। ইহকালীন এবং পরকালীন সাফল্যের জন্যে, টোটাল ফিটনেসের জন্যে ধ্যানের ভূমিকা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য।

ধ্যানঘরটা কী? ধ্যান বলেন, উপাসনা বা ইবাদত বলেন—এর জন্যে প্রয়োজন একটা অনুকূল পরিবেশ। মহামতি বুদ্ধ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে লোকালয় থেকে অনেক দূরে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন ধ্যানের জন্যে। নবীজী (স) কাবাঘর থাকা সত্ত্বেও কোথায় গিয়েছিলেন? হেরাগুহায়। কেন? যেন তার আত্মনিমগ্নতা বাধাগ্রস্ত না হয়। ওখান থেকে কাবাঘর দেখা যেত। জায়গাটা খুব দুর্গম ছিল সেই সময়ে। মানুষজন ওখানে যেত না। হাজার হাজার বছর ধরে যারাই ধ্যানে নিমগ্ন হতে চেয়েছেন, তারা নির্জনে নির্বিঘ্নে আত্মমগ্ন হতে একটা অনুকূল জায়গা খুঁজেছেন, যেটা লোকালয় থেকে দূরে।

আমরা ধ্যানকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিলাম ১৯৮৩ সালে যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র করার মধ্য দিয়ে। ১৯৯৩ সালে আমাদের ধ্যানের প্রক্রিয়া 'কোয়ান্টাম মেথড' নামে একটা সহজ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তর ঘটল। আমরা শুরু করলাম। তখন আমাদের নিজস্ব কোনো পরিমণ্ডল ছিল না, যেখানে আমরা ধ্যানের গভীরে নিমগ্ন হতে পারি। আমরা লোকালয়ের মধ্যেই যতটুকু সম্ভব ধ্যান করছিলাম।

১৯৯৮ সালে হজে গেলাম। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কিছু উপলব্ধি অনুভূতি হলো। এটা পরম প্রভুর দয়া, তাঁর করুণা। দেশে ফিরেই পার্বত্য চট্টগ্রামে গেলাম। তখন এটা দুর্গম এলাকা ছিল। বর্তমানে যেখানে ধ্যানঘর, সেখানে পা রেখেই অনুভব করলাম—এই তো সেই জায়গা, যা মন খুঁজছিল। একটা তরঙ্গ বয়ে গেল শরীরে যে, ধ্যানের তীর্থ হবে এখানেই!

যদি field of pure potentialities বা বিশুদ্ধ সম্ভাবনা ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত হওয়া হয় ধ্যানের লক্ষ্য; তাহলে ধ্যানঘর হচ্ছে sphere of pure potentialities. বিশুদ্ধ সম্ভাবনার বলয়, বিশুদ্ধ সম্ভাবনার আকর বা বিশুদ্ধ সম্ভাবনার কেন্দ্র, যেখান থেকে কল্যাণ ছড়াবে চারপাশে। একটা হীরক খণ্ড অন্ধকারেও দ্যুতি ছড়ায়। ধ্যানঘর হচ্ছে ধ্যানীদের কালেক্টিভ কনশাসনেস (যৌথ চেতনা)। ১৯৯৮ সালে অনুভব করেছিলাম, এখান থেকেই বিশ্বাস

ইতিবাচকতা কল্যাণ শান্তি চারপাশে বিকিরণ করবে। সব ধর্মের মানুষ এখানে নিমগ্ন হবে একাগ্র প্রার্থনায়। এখান থেকে তারা খুঁজে পাবে আত্মশুদ্ধির পথ এবং মানুষের আত্মজাগরণ ঘটবে।

কোয়ান্টামমে আমরা জায়গা কিনলাম। ১৯৯৯ সালে প্রথম ধ্যানঘর তৈরি হলো ছন আর বাঁশ দিয়ে। ঘরটি আমাদের সবার। তখন আমরা সংখ্যায় ছিলাম খুবই কম। জায়গাটি ছিল দুর্গম। দিনে গিয়ে দিনে ওখান থেকে ফেরত আসার কোনো সুযোগ ছিল না। একরাত হলেও সেখানে থাকতে হতো। পরদিন ফেরতযাত্রা। ২৪ বছর আগে কী অবস্থা ছিল ধ্যানঘরের চারপাশের?

সন্ধ্যার পর জোনাকির আলো ছাড়া চারপাশে কোনো আলো ছিল না। আমিরাবাদ থেকে কেয়াজুপাড়া বাজার হয়ে যেতে হতো। বাজার বসত সপ্তাহে দুদিন। দোকান মানে টং ঘর। পাওয়া যেত শুধু চা আর গুলগুল্লা। ঐ এলাকা থেকে অনেক লোকজন চলে গিয়েছিল জায়গা-জমি বিক্রি করে যে, এখানে কিচ্ছু হবে না!

আমরা কিছু মানুষ নিয়মিত যাওয়া-আসা শুরু করলাম। পাঁচ জন, সাত জন, ১০ জন, ১৫ জন, বড়জোর ২০ জন। ধ্যান উৎসবে হতো ৬০-৭০ জন। বছর এগোতে থাকল। ধ্যানীদের সংখ্যা, যাওয়া-আসা বাড়তে থাকল। চারপাশে বিশ্বাস আস্থা শুকরিয়া সালাম শান্তি কল্যাণ ইতিবাচকতার বাণী ছড়াতে লাগল। আস্তে আস্তে চারদিক বদলে যেতে শুরু করল।

আমরা যখন ২৪ বছর আগে সেখানে গিয়েছিলাম, তখন চারপাশে ছন আর বাঁশের বেড়ার ঘর। ২৪ বছরের মাথায় কেয়াজুপাড়ায় রাস্তার চারপাশে বিল্ডিং। কয়েক তলা মার্কেট। নিদেনপক্ষে একতলা বাড়ি—ইটের দেয়ালের ওপর টিনের চাল। নিয়ন আলোর বাতিতে রাত ঝলমল করে। রাতে যে-কোনো সময় আপনি যে-কোনো উপাদেয় খাবার পাবেন সেখানে। সোনার দোকানও কয়েকটা। কোয়ান্টামম থেকে আমিরাবাদ আসতে মাত্র ৪৫ মিনিট লাগে। ট্রাফিক জ্যাম হলে বড়জোর একঘণ্টা। দিনে একবার না, আপনি যতবার খুশি আমিরাবাদ আসা-যাওয়া করতে পারেন।

এই বিশুদ্ধ সম্ভাবনার স্বপ্ন আমরা শুধু কোয়ান্টামম নিয়ে দেখি নি, শুধু আমাদের জীবন নিয়ে দেখি নি—আমাদের দেশ নিয়ে, জাতি নিয়ে আমরা ভেবেছি। প্রথম ধ্যানঘর এবং বর্তমান ধ্যানঘর, যা নতুন মাত্রায় নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে—এই দুই শুরুর প্রেক্ষাপটের মধ্যে তফাৎ কোথায়?

১৯৯৮ পর্যন্ত আমরা ছিলাম বিশ্বের অবহেলিত হতাশাপীড়িত

আত্মবিশ্বাসহীন এক জাতি। পরনির্ভরতা আমাদের পেয়ে বসেছিল। আমরা মনছবি দেখা শুরু করলাম। ইতিবাচক ভাবতে শুরু করলাম। বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে, বিশ্বের সেরা ১০ জাতির এক জাতি হবে আমাদের দেশ। পরনির্ভরতা না, হতাশা না, আশাবাদী মানুষের দেশ, স্বাবলম্বী মানুষের দেশ, আত্মনির্ভরশীল মানুষের দেশ হবে বাংলাদেশ।

আজ আমরা ইলিশ উৎপাদনে প্রথম। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয়। কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়। পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়। পাট রপ্তানিতে প্রথম। সবজি উৎপাদনে তৃতীয়। পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয়। চাল উৎপাদনে চতুর্থ। ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ। মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে চতুর্থ। আলু উৎপাদনে ষষ্ঠ। আম উৎপাদনে সপ্তম। আউটসোর্সিংয়ে অষ্টম। পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম। জুতা উৎপাদনে অষ্টম। বাইসাইকেল রপ্তারিতে অষ্টম। মৌসুমি ফল উৎপাদনে দশম। অর্থাৎ কত বহুমুখী ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে গেছি! এই আশাবাদ ও বিশ্বাসের বিচ্ছুরণভূমি আমাদের এই ধ্যানঘর।

আমরা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে আশাবাদী মানুষের দেশ হিসেবে পরিচিত। করোনাকালে সারাবিশ্বে কোয়ান্টাম ছিল একমাত্র সজ্ঘ, যা আশাবাদের পতাকা সমুন্নত রেখেছে এবং আমাদের জাতি সবচেয়ে সফলভাবে করোনা অতিমারির মোকাবেলা করেছে। করোনা নিয়ে আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেটাকে ব্যর্থ করে করোনা মোকাবেলায় বিশ্বের সবচেয়ে সক্ষম জাতির তালিকায় বাংলাদেশ তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে।

সাধারণ মানুষের কৌতূহল এখন ধ্যানের প্রতি, কোয়ান্টামের প্রতি, মেডিটেশনের প্রতি। মেডিটেশন এবং কোয়ান্টাম এখন আমাদের দেশের মানুষের কাছে সমার্থক। মেডিটেশন বলতেই মানুষ কোয়ান্টাম বোঝে। যে-রকম একসময় মোটরসাইকেল মানেই লোকে বুঝত হোন্ডা। একইভাবে ধ্যান এবং কোয়ান্টাম একাকার হয়েছে।

আমরা নিঃসন্দেহে একটা ভাগ্যবান প্রজন্ম, যারা নতুন ধ্যানঘর নির্মাণে অর্থ সময় শ্রম বিনিয়োগ করতে পারছি। আমাদের আগে যারা ছিলেন তারাও এই কাজে শরিক হতে পারেন নাই। আমাদের পরে যারা আসবেন তাদেরও এই কাজে শরিক হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। ইনশাআল্লাহ! আমাদের পরের প্রজন্ম আমাদের কাজের সুফল ভোগ করবে। কিন্তু এই কাজের নির্মাতা হিসেবে, কারিগর হিসেবে, শ্রমিক হিসেবে, দাতা হিসেবে তারা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না। এজন্যে আমরা সবাই এই সুযোগটাকে গ্রহণ করব এবং

আন্তরিকভাবে আমাদের সর্বোত্তমটা নিজের নামে, প্রিয়জনের নামে, আপনজনের মধ্যে যারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তাদের নামে দান করব।

নতুন ধ্যানঘর যখন নির্মিত হবে, তখন আত্মিক ফিটনেসের নতুন এক অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব। আজ অগণিত মানুষের কৌতূহল কোয়ান্টাম নিয়ে যে, ধ্যান কী, মেডিটেশন কী, কোয়ান্টাম কী—এই কৌতূহলকে যুগান্তকারী ইতিবাচক শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্যেই নতুন আঙ্গিকের নতুন ধ্যানঘর। ধ্যানঘরে যারা আসবে তারা প্রত্যেকেই যেন কিছু নীরব মুহূর্ত, কিছু স্মৃতি, কিছু উপলব্ধি এখানে এসে পায়, যা সারাজীবন তারা লালন করতে পারবে। সেই পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্যেই ধ্যানঘরের নতুন আয়োজন।

'ধ্যানঘর' খুব ছোট্ট একটা শব্দ। ধ্যানঘর নামে আর কোনো ঘর আমার জানামতে পৃথিবীতে কোথাও নাই। মেডিটেশন সেন্টার আছে, কিন্তু ধ্যানঘর নাই। যেখানে ছন এবং কাঠ-বাঁশের সাথে সমস্ত আধুনিক উপকরণ থাকবে। মানুষের বিশুদ্ধ সম্ভাবনা বিকাশের এক পবিত্রভূমিতে রূপান্তরিত করার জন্যেই আমাদের পুরো আয়োজন। আমরা এই ধ্যানঘর থেকে নিজেরা যে-রকম আত্মশুদ্ধি, আত্ম-আবিষ্কার, আত্মশক্তির বিকাশে সক্রিয় হয়ে উঠব, সেইসাথে আমাদের দেশের জন্যে নতুন মনছবি দেখব। আমাদের নতুন মনছবি—

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি নৈতিক মানবিক আত্মিক পুনর্জাগরণ হয়েছে। জরাব্যাধি-জয়ী বাংলাদেশ। নিরাপত্তা এবং সুখের চারণভূমি বাংলাদেশ, যেখানে রাত ২টা-৩টা-৪টায় একজন কিশোরী নির্ভয়ে দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে যাবে, যে-কোনো স্থানে সে বিচরণ করবে কোনো ভয়ভীতি আশঙ্কা ছাড়া। এককথায় আমরা এ স্বপ্নকে বলতে পারি—ভালো মানুষ, ভালো দেশ, স্বর্গভূমি বাংলাদেশ!

এ লক্ষ্যে আমাদের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে, ধ্যানঘর নির্মাণের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো। আমরা সর্বোত্তমটা যেন দিতে পারি ধ্যানঘরের জন্যে। এই দান সদকায়ে জারিয়া হিসেবে হাজার বছর চলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ! আমরা প্রার্থনা করি, প্রতিটি ধ্যানী সেখানে গিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারবে। নিজেকে আবিষ্কার ও নিজের শক্তিকে অনুভব করতে পারবে। দুঃখকে দূর করতে পারবে। নিজের পাপমোচনের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারবে কায়মনোবাক্যে।

১৮ মার্চ ২০২২, ঢাকা

জনসংখ্যাই শক্তি

বাংলাদেশ বিশ্বের ৯৮টি দেশের মধ্যে শিশুদের বুকের দুধ পান করানোয় মায়েদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো করেছে। ওয়ার্ল্ড ব্রেস্টফিডিং ট্রেন্ডস ইনিশিয়েটিভ গত ২৩ আগস্ট একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবং সেই প্রতিবেদনে ৯৮টি দেশের মধ্যে ৯১.৫ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশ তালিকায় প্রথম হয়েছে। বাংলাদেশের পরেই ৯১ স্কোর নিয়ে শ্রীলংকা আছে দ্বিতীয় অবস্থানে। ওয়ার্ল্ড ব্রেস্টফিডিং ট্রেন্ডস ইনিশিয়েটিভের সমন্বয়ক বলেছেন, বাংলাদেশের এই অর্জন মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির প্রতি সরকারের উচ্চমাত্রার অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

নবজাতক ও ছোট শিশুর খাবার বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ৯১.৫ স্কোর অর্জন করেছে। ২০১৫ সালে এই স্কোর ছিল ৮৬।

জন্মের পর পর বুকের দুধ খাওয়ানোয় বাংলাদেশের স্কোর ৬৯ এবং একাধারে প্রথম ছয় মাস বুকের দুধ খাওয়ানোয় বাংলাদেশের স্কোর ৬৫। প্রতিবেশী দেশ ভারতের স্কোর ৪৫ এবং তাদের অবস্থান ৭৯ তম। এ-ছাড়া ৪০.৫ স্কোর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ৮৬ তম। ৫০.৫ স্কোর নিয়ে যুক্তরাজ্যের অবস্থান ৬৫ তম। ৩৩.৫ স্কোর নিয়ে জার্মানির অবস্থান ৯৫ তম। জার্মানির পরেই ২৫.৫ স্কোর নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান ৯৬ তম।

নবজাতককে জন্মের পর পর বুকের দুধ পান করানো সন্তানের প্রতি মায়ের মমতারই প্রকাশ। জন্মের পর ছ-মাস পর্যন্ত বুকের দুধ ছাড়া শিশুর আর কোনো খাবারেরই প্রয়োজন হয় না। দু-বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধের পাশাপাশি ফর্মুলা ফুড নয়, প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যসম্মত খাবার শিশুর রোগ প্রতিরোধ

ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে যত রকম এন্টিবডি প্রয়োজন, তা মায়ের বুকের দুধের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিশুর দেহে প্রবেশ করে।

বুকের দুধ শিশুর সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাতৃদুগ্ধে লালিত শিশু ইন্টেলিজেন্স টেস্টে সবসময় ভালো করে। তাদের স্থূলতা বা মেদে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। আর শেষ বয়সে ডায়াবেটিসের আশঙ্কা থেকেও তারা অনেকটা মুক্ত থাকে। যে কারণে ডব্লিউএইচও এবং ইউনিসেফ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম ঘণ্টার মধ্যেই শিশুকে মাতৃদুগ্ধ প্রদান এবং ছ-মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মাতৃদুগ্ধ পান করানোর ওপরে গুরুত্ব দিয়েছে। যখনই শিশু চায়, দিনে বা রাতে দুগ্ধ পান করানো প্রয়োজন। কোনো বোতল বা চুষনি ব্যবহার না করানোই ভালো।

আসলে জন্মগ্রহণ করার পরে শিশুর প্রথম অধিকার হচ্ছে মায়ের বুকের দুধ। স্বাস্থ্যগত কারণ ছাড়া কোনো মা কখনো শিশুকে বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করবেন না। কারণ মনোবিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণা করে দেখেছেন, যে শিশু জন্মের পরে মায়ের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যত শক্তিমান হোক, যত বিত্তবান হোক, যত বলবান হোক, যত ক্ষমতাবান হোক—বড় হওয়ার পরও সবসময়ই সে একধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কারণ শিশুর মস্তিষ্কে নিরাপত্তার স্মৃতি তৈরি হয় মায়ের বুকের দুধ খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ার স্মৃতি থেকে। যে শিশু বুকের দুধ পায় নি, এই স্মৃতি থেকে সে বঞ্চিত।

বুকের দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতা গত একযুগে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্যে আমরা সচেতন মায়েদের অভিনন্দন জানাই। ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম ঘণ্টায় সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে বুকের দুধ খাওয়ানো বাঙালির অসাধারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, দুর্যোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম অনুঘটক।

আমাদের দেশে শুধু নয়, সারাবিশ্বের যে মায়েরা জন্মের প্রথম ঘণ্টায়ই শিশুকে বুকের দুধ দিয়েছেন, ছ-মাস বুকের দুধ ছাড়া আর কিছু খাওয়ান নি, কোনো ফর্মুলা ফুডের দিকে যান নি, তাদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি যারা চার সন্তানের মা এবং বাবা তাদেরও বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা ৬০ বছর ধরে শুনে এসেছি একটা কথা—'দুই সন্তানের বেশি নয়, একটা হলে ভালো হয়।' অবশ্য গত ১০ বছর ধরে আমাদের দেশে 'একটি হলে ভালো হয়'-এর পরিবর্তে বলা হচ্ছে 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট'। এই যে 'একটি হলে ভালো হয়'—এই গজব থেকে যে

আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি, এজন্যে আমরা আবারো কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা কিন্তু ৩০ বছর ধরে বলে এসেছি, 'চারের কম নয়, তার বেশি যত হয়।' বাস্তবতা কী বলে? আমাদের দেশে যারা এক সন্তান নীতি চালু করার চেষ্টা করেছিল এবং এজন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল, তাদের কী অবস্থা? এ-ক্ষেত্রে তারা যা বলছে তারা কিন্তু তা অনুসরণ করে নি, বরং আমরা যা বলেছি ৩০ বছর ধরে, তা-ই তারা অনুসরণ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন-এর দুই ছেলে, দুই মেয়ে; চার সন্তান। এশিয়া ও আফ্রিকায় জনসংখ্যা কমানোর জন্যে যার শাসনামলে সবচেয়ে জোরালো কর্মসূচি চালু হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সেই প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। তার চার সন্তান। ইংল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন স্পষ্ট করে জানান নি যে, তার কয়টি সন্তান। তবে এখন পর্যন্ত ছয় সন্তানের খোঁজ পাওয়া গেছে। তার পূর্বসূরি দুই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং ডেভিড ক্যামেরন। প্রত্যেকের চার সন্তান।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ। তার আগে ছিলেন নিকোলাস সারকোজি। ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ এবং নিকোলাস সারকোজি, দুজনেরই চারটি করে সন্তান। তাদের বেলায় চারটা আর আমাদের বেলায় একটা। কী সুন্দর নিয়ম!

ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ এবং গেটস ফাউন্ডেশন তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা কমানোর ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। অথচ ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক সভায় ইমানুয়েল মাখোঁ বক্তব্য দিয়েছিলেন, 'প্লিজ, এমন একজন শিক্ষিত মহিলাকে উপস্থাপন করুন, যিনি চাইবেন সাত-আট-নয় সন্তান।'

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বক্তব্যের পর পরই ইউরোপিয়ান কমিশনে যিনি প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন, তিনি জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। বোঝাই যায়, তিনি ডাকসাইটে মহিলা। তার নাম উরসুলা ভন ডার লিয়েন। তিনি একজন চিকিৎসক এবং মেডিকেল কলেজে পড়াতেন। জনস্বাস্থ্যে তার উচ্চতর ডিগ্রি আছে। তার স্বামী স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। উরসুলা লিয়েনের সন্তান সংখ্যা মাত্র সাত জন! সাত সন্তানের মা হয়ে তিনি যদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী হতে পারেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, তাহলে কী বুঝতে হবে? সন্তান আপনি নেবেন কী নেবেন না, কয়টা নেবেন—এ পরিকল্পনা আপনি করতে পারেন কিন্তু সন্তান আপনার সাফল্যের পথে, অর্জনের পথে কখনো অন্তরায় নয়।

বিল গেটস, যিনি জনসংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে এত উদ্যোগী, তার তিন সন্তান। ওয়ারেন বাফেট। তিন সন্তান। বেজোস-এর চার সন্তান।

আমরা ৩০ বছর ধরে বলছি, চারের কম নয়, তার বেশি যত হয়। কারণ আমাদের জনসংখ্যা আমাদের শক্তি। বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কর্মক্ষম তরুণ জনগোষ্ঠীই হবে সবচেয়ে বড় শক্তি। কিন্তু গত অর্ধ শতাব্দী জনসংখ্যা হ্রাসের প্রচারণার ফলে আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তের জনসংখ্যা যে হারে বাড়া উচিত ছিল সে হারে বাড়ছে না। অতএব মধ্যবিত্তকে উদ্যোগী হতে হবে। আমরা অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগোচ্ছি। তরুণ জনশক্তির জোগান দিতে আমাদের জনসংখ্যার হার বৃদ্ধির জন্যে আরো কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার সময় এসেছে এখন।

সংক্ষিপ্ত : ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১, ঢাকা

রক্ত দিন ॥
অন্তত বাঁচুক একটি জীবন

দিতে পারাটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ সবসময়ই ছিল। আমাদের জাতিসত্তার বিশেষত্বই হচ্ছে দেয়া। আমরা দিতে পারি। যে কারণে সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, মানবতার জন্যে দেয়ার ক্ষেত্রে আমরা কখনো পিছিয়ে ছিলাম না। দেয়ার ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে ব্যতিক্রমী যে দেয়া, সেটা আমরাই দিয়েছি। মায়ের ভাষার জন্যে কোনো জাতির তরুণেরা যে রক্ত দিতে পারে, পৃথিবীর ইতিহাসে আমরাই প্রথমবারের মতো এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। ২১শে ফেব্রুয়ারি, এখন থেকে ৭০ বছর আগে আমরা স্থাপন করেছি মায়ের ভাষার জন্যে অকাতরে জীবন দেয়ার দৃষ্টান্ত।

সেই দিন মায়ের ভাষার জন্যে রাজপথ রঞ্জিত করতে পেরেছিলাম বলেই একাত্তরে আমরা রক্ত দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততর সময়ে, মাত্র নয় মাসে আমাদের দেশকে মুক্ত করতে পেরেছিলাম। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলাম। আমাদের ভাষা শহিদ বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার এবং যুগে যুগে কালে কালে আমাদের অধিকার রক্ষার জন্যে যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের সবার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

দিতে কারা পারে? যাদের অন্তরে দয়া আছে, মায়া আছে, মমতা আছে। এককথায় যাদের হৃদয়ে টান আছে মানুষের প্রতি, সৃষ্টির প্রতি। এখন যে রক্তদান নিয়ে আমরা কথা বলব, এই রক্তদান বিশেষ রক্তদান। আমরা ভাষার জন্যে রক্ত দিয়েছি, দেশের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে, অধিকারের জন্যে রক্ত দিয়েছি, কিন্তু এই রক্তদান একজন মুমূর্ষু প্রাণকে বাঁচানোর জন্যে। রক্তদানের শারীরিক-মানসিক গুরুত্ব আপনারা অনেকেই জানেন। আজকে সমাজের

প্রতি, জাতির প্রতি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কাজের মধ্যে একটি বড় কাজ হচ্ছে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম।

আমরা কীভাবে রক্তদানের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম?

একজন তরুণ চিকিৎসক ছিল। ডা. অপি। সে তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার। আমাদের পায়োনিয়ার ব্যাচের গ্রাজুয়েট। একবার সে খুব করুণ একটি ঘটনা বলেছিল।

ভাই এবং বোন। দুজনই থ্যালাসেমিয়ার রোগী। বোন বড়, ভাই ছোট। দুজনকে নিয়মিত রক্ত দিতে হতো এবং তারা একসাথেই রক্ত নিত। মা-বাবারও দুজনকে একসাথে নিয়ে গেলে একসাথেই কাজ হয়ে যায়। একই গ্রুপের দুই ব্যাগ রক্ত লাগত তাদের।

একদিন দুজনকে রক্ত দিতে হবে। রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। একদিন, দুই দিন। পাওয়া যাচ্ছে না। ডোনার নাই। রক্তের অভাবে দুজনের অবস্থাই করুণ হতে শুরু করল। যে ওয়ার্ডে তারা ছিল, ডা. অপি সেখানে তাদের দেখতে গেল। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অপির রক্তের গ্রুপের সাথে তাদের রক্তের গ্রুপ মিলে গেল। সে তাৎক্ষণিক রক্ত দিল। এক ব্যাগ হলো। পাশাপাশি দুই বেড। এক বেডে ভাই, এক বেডে বোন। এখন রক্ত প্রথমে কাকে দেবে?

বোনের অবস্থা বেশি খারাপ। তাই বোনকে রক্ত দিতে গেছে, বোন বলছে, না! আমার ভাইকে আগে দাও। ভাইকে না দিয়ে আমি নেব না। বোন যখন জেদ করল, ভাইকে দেয়া হলো। রক্ত পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই ভাইটির মধ্যে প্রাণ ফিরে এলো, কিন্তু বোনের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করল। আর রক্ত পাওয়া গেল না। বোনটি মারা গেল। অপি ঘটনাটা বলতে বলতে কেঁদেই ফেলল। সে বলছিল, আরো একজন রক্তদাতা যদি পেতাম, তাহলে এই দাতা বোনটিকে বাঁচানো যেত!

মানুষের এই মমতা কিন্তু আল্লাহর বিশেষ দান। আল্লাহ দয়াময়। তাঁর নামই হচ্ছে রহমান। দয়ামায়া, মমতা—এটাই আসলে সংস্কৃতিকে, সভ্যতাকে, মানুষকে এত দূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

এই ঘটনাটা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটল। ১৯৯৫ সালে আমরা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু করলাম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে যারা ধ্যানচর্চা শুরু করলেন এবং সঙ্ঘবদ্ধ হলেন, তাদের নিয়ে আমরা ২০০০ সালে শুরু করলাম রক্তদান কার্যক্রম। প্রথমদিকে আমাদের ডোনাররা হাসপাতালে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসত। তখন দেশে সন্ধানী এবং রেড ক্রিসেন্ট

সোসাইটি—দুটি সংগঠন ছিল। তারা রক্তদান নিয়ে কাজ করত। তাদের সাথে আমরা ক্যাম্প করতাম। ধীরে ধীরে অনুভব করলাম, এ কাজে একটা সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস প্রয়োজন। ডোনার এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে সংযোগ সাধন করতে হবে। রেড ক্রিসেন্টের ব্যবস্থাপনা খুব ভালো ছিল। তাদের যন্ত্রপাতি খুব চমৎকার, কিন্তু তাদের ডোনারপুল ছিল না। সন্ধানীর অনেক ডোনার রয়েছে, কিন্তু তখন তাদের কোনো ল্যাব ছিল না।

অনুভব করলাম, আমাদের ডোনার আছে এবং ল্যাব করার সামর্থ্যও আমরা অর্জন করতে পারি। আমরা ল্যাব এবং ডোনার—এই দুই শক্তিকে একত্র করলাম। স্বাভাবিকভাবে ২০০০ সালে আমাদের ল্যাবের সেই গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। যে-কোনো কিছুর গ্রহণযোগ্যতা হয় দেখাশোনার পরে। আপনি একজন মানুষকে বন্ধু বলবেন, না শত্রু, সেটা তার সাথে মেলামেশা করে বুঝেশুনে তারপর ঠিক করবেন।

আমরা ২০০০ সালে যখন ল্যাব করলাম, সারাবছর আমাদের সংগ্রহের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫শ ব্যাগ! মাসে না, পুরো বছরে। সেটাও আমরা গ্রহীতার অভাবে দিতে পারি নি। যেহেতু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে রক্ত আর দেয়া যায় না। তাই এর অধিকাংশই ফেলে দিতে হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে কয়েকটা জিনিস আমরা আমাদের রক্তদান কার্যক্রমে নিশ্চিত করলাম।

এক. ডব্লিউএইচও রক্তকে যে পাঁচটি জীবাণু থেকে মুক্ত থাকার কথা বলে, সেভাবে পরীক্ষা করে রক্ত জীবাণুমুক্ত কিনা নিশ্চিত করা। এটাকে ফাইভ টিটিআই টেস্ট বলে, যা রক্তে এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, ম্যালেরিয়া, সিফিলিস জীবাণুর উপস্থিতি শনাক্ত করে। অর্থাৎ রক্তবাহিত কোনো রোগের জীবাণু রক্তে থাকতে পারবে না। যে রক্ত কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে যাবে, এই রক্ত হবে বিশুদ্ধ নিরাপদ। আমরা প্রথম থেকেই এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করলাম। যখন এটা প্রতিষ্ঠিত হলো তখন ডাক্তারদের আস্থা বাড়তে শুরু করল। ১০ বছরের মাথায় রক্তের প্রয়োজনে ডাক্তারদের প্রথম পছন্দ হলো—কোয়ান্টাম। আজ রোগীকে বলা হয়, আগে কোয়ান্টামে যান। ওখানে যদি রক্ত পেয়ে যান, আপনার চিন্তার আর কোনো কারণ নেই। কেন? নিরাপদ রক্তের নিশ্চয়তা।

দুই. আমাদের প্রসেসিং খরচ খুব কম। রক্তটা টেস্ট করতে যতটুকু খরচ হয়, সেটুকুই আমরা নিই। অন্যান্য জায়গায় আমাদের তুলনায় প্রসেসিং খরচ চার গুণ, পাঁচ গুণ, ছয় গুণ।

আপনাদের শুনলে ভালো লাগবে, ২০২০ সালে করোনার সেই ভয়াবহ

দাপটের সময়ও আমাদের ল্যাব এক মিনিটের জন্যেও বন্ধ ছিল না। রক্তের প্রয়োজনে যারা এসেছে তাদেরকে আমরা ২৪ ঘণ্টাই সেবা দিতে পেরেছি।

আমাদের সাড়ে চার লক্ষ রক্তদাতার ডোনারপুল তৈরি হয়েছে। ২০২১ সালে আমাদের রক্ত সরবরাহের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ ছয় হাজার ইউনিট। প্রথম বছর ১৫শ ব্যাগ রক্ত আমরা দিতে পারি নি। আর ২০ বছরের মাথায় বছরে এক লক্ষ ছয় হাজার ইউনিট রক্ত আমরা দিতে পেরেছি। দেশে রক্তের চাহিদার এক-পঞ্চমাংশ এখন আমরা আমাদের ল্যাব থেকে সরবরাহ করতে পারি। সবটাই সম্ভব হয়েছে আমাদের তরুণ-তরুণীদের জন্যে। যারা নিয়মিত রক্তদান করেন তাদের জন্যে।

রক্তদান অত্যন্ত পুণ্যের কাজ, অত্যন্ত মানবিক কাজ। রক্তদান নিজের শরীরের জন্যে উপকারী, মানসিক দিক থেকে তৃপ্তির, ধর্মীয় দিক থেকে অত্যন্ত পুণ্যের। বছরে আমরা লক্ষাধিক ব্যাগ রক্ত সরবরাহ করলেও আমাদের কাছে রক্তের জন্যে এখনো যারা আসেন, তাদের প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষকে আমরা দিতে পারি না। কেন? যে হারে ল্যাবে এসে আমাদের রক্ত দেয়া উচিত, সেই হারে রক্ত পাচ্ছি না। তবে এখন পরিস্থিতি অনেক উন্নত হয়েছে। আগে দেশের সর্বত্র ৭০ শতাংশ রক্ত আসত পেশাদার রক্তদাতাদের কাছ থেকে, যার অধিকাংশ ছিল দূষিত। এখন চিত্রটা উল্টে গেছে। ৭০ শতাংশ স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের রক্ত। কিন্তু ২৫-৩০ শতাংশ এখনো পেশাদার রক্তদাতাদের রক্ত, যারা অধিকাংশই হয়তো মাদকসেবী বা নানারকম রোগব্যাধিতে আক্রান্ত।

আমরা জানি, দুর্যোগ বা সংকট মোকাবেলায় আমাদের মতো দক্ষ জাতি পৃথিবীতে আর নাই। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা যখন ধসে পড়ল, অনেক মানুষ আহত হলো। রক্তের প্রয়োজন। আমাদের ল্যাবের সামনে লাইন পড়ে গেল। অনেকে ছয়-সাত ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে রক্ত দিয়েছেন। এত রক্ত হলো যে, আমরা সবাইকে অনুরোধ করতে বাধ্য হলাম, আর রক্ত দেয়ার প্রয়োজন নেই। তারা বলল, রক্ত দিতে এসেছি, দেবো। রক্ত না দিয়ে যাব না। শেষ পর্যন্ত অধিকাংশকেই বলতে হলো, নম্বর দিয়ে যান। রক্তের প্রয়োজন হলে আপনাদেরকে ফোন করে নিয়ে আসব।

দুর্যোগে দুর্বিপাকে আমাদের মমতার প্রকাশ ঘটে খুব বেশি, কিন্তু সাধারণ সময় মমতা অতটা দেখা যায় না। এই মমতাটাকে শুধু সংকটের সময় নয়, সবসময় এবং দৈনন্দিন চর্চায় নিয়ে আসতে হবে।

অনেক সময় মনে হতে পারে যে, আমি একা। একা নিয়মিত দিলে কি

হবে? এখানে আমরা ভুল করি। আসলে কাজ কিন্তু শুরু করতে হয় একা। কবিগুরুর গান আছে না—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে!' যে কাজটা ভালো, যে কাজটা পুণ্যের, সেটা প্রথম নিজে করতে হয়। যখন আরেকজন আপনাকে করতে দেখবে, অনুপ্রাণিত হবে। তখন সবাই মিলে রক্তের এই চাহিদাটা আমরা পূরণ করতে পারব।

আমরা যখন প্রথম রক্তদান শুরু করেছিলাম, আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করার মানুষের কোনো অভাব ছিল না। আমাদের রক্তদান কার্যক্রম যে কিছুদিন পর মুখ থুবড়ে পড়বে, এ ব্যাপারে অনেক বিশেষজ্ঞ একমত ছিলেন। কেন? আমরা অধিকাংশই কাজ শুরু করি, কিন্তু যখন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই, তখন আমরা লেগে থাকতে পারি না। প্রথম বছর সংগৃহীত ১৫শ ব্যাগ রক্তের অধিকাংশই ফেলে দিতে হয়েছে এবং প্রথম তিন বছর পর্যন্ত আমাদের ভর্তুকি দিতে হয়েছে পুরো কাজটাতে। আমাদের ধারণা ছিল, তিন বছর যদি আমরা টিকে থাকতে পারি, তাহলে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, প্রথম তিন বছর লেগে থেকে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছি। এরপরে আর পেছনে তাকাতে হয় নি। আমাদের রক্তদান কার্যক্রম এখন স্বনিয়ন্ত্রিত। প্রসেসিং ফি থেকে যে অর্থটুকু আসে, সেটা দিয়েই রক্তদান কার্যক্রমের সাথে জড়িত সমস্ত খরচ আমরা নির্বাহ করি। ফাউন্ডেশনকে আর সেইভাবে ভর্তুকি দিতে হয় না। ভর্তুকি দিয়ে আসলে কোনো কাজকে খুব বেশি দিন চালানো যায় না।

অনেক সময় ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট গল্প, ছোট ছোট উদাহরণ মানুষকে খুব অনুপ্রাণিত করে। ডা. অপি যে ঘটনাটা বলেছিল সেই ঘটনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং আমরা উদ্যোগী হয়েছিলাম। আজকে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় কার্যক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে।

মৃত্যু জীবনের অবধারিত পরিণতি। কারো পক্ষে মৃত্যু এড়ানো সম্ভব নয়। আপনি সুস্থ অবস্থায়ও মারা যেতে পারেন, অসুস্থ অবস্থায়ও মারা যেতে পারেন। অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুকে কীভাবে সুন্দর করা যায়, মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে কীভাবে সম্মান দেয়া যায়, মৃত্যুটাকে সহজভাবে গ্রহণ করার জন্যে অনুপ্রাণিত করা যায়, শক্তি জোগানো যায়—এই সেবার নাম হচ্ছে প্যালিয়েটিভ কেয়ার। আমাদের দেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ। অসাধারণ মানুষ, ভালো মানুষ। সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কথা বলতে পারেন তিনি। আমি একবার তার

আলোচনায় শুনছিলাম—তিনি একটা গল্প বলছিলেন। লরেন আইজলির একটি গল্প। গল্পটার নাম স্টারফিশ। অনেকে হয়তো শুনেছেন। গল্পটা হচ্ছে—

একদিন এক প্রবীণ লোক সমুদ্রের বেলাভূমি দিয়ে হাঁটছেন। খেয়াল করলেন যে, এক তরুণ সৈকতের বালুতে ঝুঁকে কিছু একটা কুড়িয়ে সমুদ্রের দিকে ছুড়ে মারছে। প্রবীণ লোকটি কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ংম্যান! তুমি কী করছ?

সমুদ্রে যখন তরঙ্গ এসে সৈকতে আঘাত করে, পানির সাথে অনেক মাছের পোনা এসে বালুতে আটকা পড়ে। সে হেসে বলল, যে স্টারফিশগুলো বালুতে এসে আটকা পড়ছে, এগুলোকে আবার সমুদ্রে ফিরিয়ে দিচ্ছি। প্রবীণ খুব মজা পেয়ে হেসে বললেন, তুমি কি বুঝতে পারছ এই সৈকতের দৈর্ঘ্য কত? শত শত স্টারফিশ বালুতে আটকা পড়ছে। একটা একটা করে কয়টাকে তুমি বাঁচাতে পারবে? এত কষ্ট করে কি কোনো পার্থক্য তৈরি হচ্ছে?

তরুণ ঝুঁকে পড়ে আরেকটি স্টারফিশ তুলে আবার সমুদ্রে ছুড়ে মারল এবং সেই প্রবীণের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, স্যার! এই একটি পার্থক্য তো তৈরি হলো! একটি মাছকে তো আমি বাঁচাতে পারলাম।

আসলে আপনি প্রত্যেককে বাঁচাতে পারবেন না। ডা. অপি সেই ভাইবোন দুজনকে বাঁচাতে পারে নি, কিন্তু বোন নিজের জীবন দিয়ে ভাইকে তো বাঁচাতে পারল! ভাইকেও বাঁচাতে পারত না যদি ডা. অপি রক্ত না দিত। অতএব কত জন এটা গুরুত্বপূর্ণ না। আর এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এক ব্যাগ রক্ত থেকে রক্তের উপাদান পৃথক করে চার জন মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব। এই এক ব্যাগ রক্ত কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যখনই ঢাকায় যাবেন, শান্তিনগর ল্যাবে যাবেন। রক্ত দেবেন। একটি পার্থক্য না, চারটি পার্থক্য তৈরি করতে পারবেন।

আমরা পরম করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তিনি রক্তদানের মতো একটি মহৎ কাজকে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গে পরিণত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। রক্ত দেয়ার ইতিহাস আমাদের রক্তেই রয়েছে। আমরা সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে, ভাষার জন্যে রক্ত দিয়েছি। এখন কী করতে হবে? একটি জীবনকে বাঁচানোর জন্যে আমরা ল্যাবে গিয়ে রক্ত দেবো।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২, কোয়ান্টামম

সুখাদ্য সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলে

লামা বিচিত্র সব পাখির শব্দে মুখরিত। আপনারাও আজকে সন্ধ্যায় পাখি সব কীভাবে কলরব করে, এটা ইনশাআল্লাহ উপভোগ করবেন। পাখির অভয়ারণ্য হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টামম। পাখিরা এখানে আনন্দে থাকে। আমাদের সাড়াশব্দ পেলেই তাদের উপস্থিতি আমাদের জানান দেয়। কেন জানান দেয়? রহস্যটা কী? কেন এত পাখি? একজন মানুষ কোথায় আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে? কোথায় তার নাচতে ইচ্ছে করে? কোথায় গান গাইতে ইচ্ছে করে? কোন পরিবেশে সুস্থতা টগবগিয়ে ওঠে?

প্রথমত, যেখানে তার জীবনের নিরাপত্তা থাকে। দ্বিতীয়ত, যেখানে স্বাস্থ্যকর খাবার থাকে। স্বাস্থ্যকর খাবার থাকলে সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। নিরাপত্তা এবং সুস্বাস্থ্য থাকলে তার মধ্যে আনন্দ গান নাচ সবকিছু টগবগ করবে। যদি নিরাপত্তা থাকে কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার নাই, তাহলে কী হবে? সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নাচতে গেলে সে ইমব্যালান্সড হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। আমাদের কোয়ান্টামমে পাখিরা এখানে দুটোই পেয়েছে।

আমরা ২০ বছর আগে এখানে যে গাছগুলো লাগিয়েছিলাম, সেই গাছগুলো এখন বড় হয়েছে। সেই গাছগুলো এখন পাখিদের খাবার দিচ্ছে। শত শত হরিয়াল একসাথে ওড়ে। ময়না আসে, টিয়ার ঝাঁক আসে। কারণ তারা এখানে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের নিশ্চয়তা পায়।

আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে, সুখাদ্য সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলে। সুখাদ্যের সাথে দুটো জিনিস জড়িত। এক. খাবারটা সঠিক হতে হবে। দুই. অভ্যাসটা সঠিক হতে হবে। যে-রকম পাখি ততটুকুই খায় যতটুকু তার প্রয়োজন। অতিরিক্ত খায় না। সে শুধু তার সন্তান, মানে তার ছানার জন্যে

ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে যায়। নিজের জন্যে কিন্তু কোনো খাবার নেয় না। কোনো পাখিকে কিন্তু আপনি চর্বিদার হতে দেখবেন না কখনো। মুরগি চর্বিদার হয়, হাঁস চর্বিদার হয়, কিন্তু পাখির সবকিছুই পরিমিত। কারণ যদি তার ওজন বেড়ে যায়, ডানা এবং দেহের অনুপাত ঠিক না থাকে, তাহলে সে উড়তে পারে না। মানুষের জীবনও তা-ই। সুস্থ থাকতে হলে খাবারটা সঠিক হতে হবে। সঠিক মানেই পরিমিত। তাহলেই সুস্বাস্থ্য গড়ে উঠবে।

যারা তরুণ থাকতে চান, কর্মক্ষম থাকতে চান, ৮০ বছর বয়সেও যদি নাচতে চান, নাচতে পারবেন। কোনো অসুবিধে নেই। কী করতে হবে? খাবারের অভ্যাসটা সঠিক হতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাবার এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস—এ দুটো মিলে হয় স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস। আমরা ৩০ বছর ধরে বলে আসছি আর এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে যে, তারুণ্য বজায় রাখার সবচেয়ে বড় উপায় সঠিক খাদ্যাভ্যাস।

স্বাস্থ্যকর খাবারকে আমরা সুখাদ্য বা সুস্থ খাবার আর অস্বাস্থ্যকর খাবারকে কী বলতে পারি? কুখাদ্য বলতে পারি। কুখাদ্য বললে বুঝতে সহজ হয়। কারণ কু শব্দটা পরিচিত শব্দ। কু মানে যে ভালো নয়, এটা আমরা বুঝি। ২০১৯ সালে *দ্য ল্যানসেট* জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার রিপোর্ট হলো, কুখাদ্য খাওয়ার ফলে বিশ্বে ২০১৭ সালে মৃতের সংখ্যা এক কোটি ১০ লক্ষ! চিন্তা করেন, এক কোটি ১০ লক্ষ মৃত্যু কুখাদ্যজনিত! তামাক বা উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে যত মৃত্যু, তার চেয়ে শুধু কুখাদ্য খাওয়ার কারণে মৃত্যুর পরিমাণ বেশি। সেটা নিয়ে কিন্তু কোনো হইচই নাই, কোনো আতঙ্ক নাই, কোনো প্রচারণা নাই, মিডিয়াতে বক্তব্য নাই। হইচই কী নিয়ে হয়? যেটা নিয়ে হইচই করলে পয়সা কামানো যাবে সেটা নিয়ে।

কুখাদ্য আবার মানুষের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। এক ডায়াবেটিক রোগীর স্ত্রী শেষ পর্যন্ত ফ্রিজে তালা লাগিয়েছেন, যাতে স্ত্রী রাতে ঘুমিয়ে থাকলে ফ্রিজ থেকে মিষ্টি জাতীয় খাবার বের করে লোকটি খেতে না পারেন! তালা লাগিয়ে চাবি কোথায় রাখবেন, এটা তো স্বামীর জানতে আর বাকি নেই। লোকটিও চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকেন। নাক ডাকার ভান করেন। স্ত্রী যখন ঘুমিয়েছেন নিশ্চিত হন, তখন তিনি খুব আস্তে আস্তে গিয়ে চাবি বের করেন। অন্ধকারের মধ্যে ফ্রিজের তালা খোলেন। ইচ্ছেমতো খান। মুখ মুছে চাবিটা আবার খুব সুন্দর করে রেখে দেন। অর্থাৎ কুখাদ্যের প্রতি মানুষের লোভ এত বেশি!

আপনি দেখবেন যে, অসুখ হলে ডাক্তার যে খাবারটা খেতে নিষেধ করেন, সেটার প্রতি আমাদের আকর্ষণ বাড়ে। মনে হয়, এটা না খেলে আমি

বাঁচবই না! আগামীকাল বাঁচি কী না বাঁচি। একটু খাই। মরলে খেয়ে মরি। আর ডাক্তার যে জিনিসটা খেতে বলবে, যেটা খেলে আপনার উপকার হবে, যেটা আপনার পথ্য, সেটার প্রতি দুনিয়ার অনীহা! এটা একটা খাবার হলো! এটাতে তার অরুচি। কুখাদ্য দেন, কোনো অরুচি নেই।

কুখাদ্য কী করে? আপনার অন্ত্রের ভেতরে মাইক্রোব বা অনুজীব থাকে। এগুলো হজম শক্তি বাড়ায়, খাবারকে হজম করতে ও খাবার থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। খাবার থেকে শরীরের প্রয়োজনে রাসায়নিক উপাদান সৃষ্টি করে এই অনুজীব। কুখাদ্য এই উপকারী অনুজীবগুলোকে নষ্ট করে দেয়। এটা নিয়ে এক ডাক্তার (প্রফেসর টিম স্পেকটর, জেনেটিক এপিডেমিওলজিস্ট) নিজের ছেলের ওপর একটি পরীক্ষা করেছিলেন। ছেলেকে ১০ দিন শুধু ম্যাকডোনাল্ড-এর বিগ ম্যাক, চিকেন নাগেটস, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কোক খাইয়েছেন। অন্য কোনো খাবার ছেলে খায় নি। বিগ ম্যাক কোনটাকে বলা হয়? দোতালা বার্গার যেটা। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইকে তো আমেরিকানরা বলে ফ্রিডম ফ্রাই। আমরা ৩০ বছর ধরে বলছি, ফাস্ট ফুড যত খাবেন আজরাইল তত ফাস্ট আপনার দিকে অগ্রসর হবে।

ছেলেকে বলা হয়েছিল, তুমি যা ইচ্ছে খাবে এবং তার বাবা বিল পরিশোধ করবে। সে ইচ্ছেমতো খেয়েছে এবং খাওয়ার নেট রেজাল্ট হচ্ছে তার পাকস্থলীর ৪০ শতাংশ উপকারী অনুজীব নষ্ট হয়ে গেছে মাত্র ১০ দিনে! সমস্ত ফাস্ট ফুডই হচ্ছে কুখাদ্য, সেটা ম্যাক কোম্পানির হোক বা কেএফসি, বিএফসি এবং এ ধরনের দেশি-বিদেশি যত প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন মদ তো মদই, সেটা বাংলা হোক আর বিলাতি। মদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

এই পরীক্ষাটি চালানোর আগে ছেলের অন্ত্রে তিন হাজার পাঁচশ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া ছিল। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ মানে ১৪শ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে। আপনি বলতে পারেন যে, পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়া গিয়েছে তাতে কী হয়েছে? কিন্তু এর ডমিনো ইফেক্ট পড়ে পুরো শরীরের ওপর। কারণ আপনি যা খাবেন, এটা হয় আপনার আয়ু বাড়াবে অথবা আয়ু নষ্ট করবে। সুখাদ্য আয়ু বাড়ায় আর কুখাদ্য আপনাকে অসুস্থ করে তোলে, আয়ু কমায়।

তাহলে আমাদের কী করতে হবে? মনে রাখবেন, চিনি একটা গজব। এটাকে কী বললে ভালো হয়? বিষ? আমরা বিষটাকেও এখন বিষ মনে করি না। আমরা গান গাই যে, আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান! কারণ বিষও ভেজাল হয়ে গেছে, না হলে জেনেশুনে বিষ পান করে গান গায় কীভাবে! তার মানে বিষের কোনো ইফেক্ট তার ওপরে হয় নি। চিনি হচ্ছে গুপ্ত ঘাতক বা সুপ্ত

ঘাতক। অর্থাৎ যে ঘাতক ঘুমিয়ে থাকে। ঠিক যে সময়ে হিট করার সে-সময়ে হিট করে।

আমেরিকানদের এত অনিদ্রা কেন? যত উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, কীসের সমস্যা তাদের? অনিদ্রা বা ইনসমনিয়া। অনিদ্রার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে চিনি। ২০১৬ সালের একটা স্টাডি। এটা প্রকাশিত হয়েছিল *জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল স্লিপ মেডিসিন* পত্রিকাতে যে, চিনিযুক্ত খাবার রাতে অস্থিরতা বাড়িয়ে দেয় এবং ঘুম কমিয়ে দেয়। আপনি খেয়াল করবেন, রাতে তাদের ডিনার শেষ হয় ডেজার্ট দিয়ে। যত চিনি, ডেজার্ট তত মজা। তাই তো? রাতে অস্থিরতা বেড়ে গেলে কখনো গভীর ঘুম হয় না। মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়। অথচ প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ হচ্ছে গভীর ঘুম।

রাতের বেলা যিনি বুফে খেয়েছেন তার ঘুম ভালো হয় না কেন? অভিজ্ঞতা থাকলে স্মরণ করতে পারেন যে, রাতে বুফে খেলে হাঁসফাঁস লাগে। কারণ বুফে খাবারের মজা হলো যত খাবেন, একই দাম! পয়সা যেহেতু একই, অতএব বেশি খেতে অসুবিধা কী! কিন্তু খাচ্ছেনটা কী? কুখাদ্য। এটা হচ্ছে বেনিয়া বুদ্ধি। এই যে খাবার কোম্পানি, এদের আবার ওষুধ কোম্পানিতে শেয়ার আছে। আপনাকে আগে খাইয়ে অসুস্থ বানাবে, তারপর ওষুধ বিক্রি করবে। ওষুধের পরেই প্রসেসড ফুড সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। যে কারণে কুখাদ্য খেয়ে বছরে এক কোটি ১০ লক্ষ মানুষ মারা গেছে!

এখন আমাদেরকে কী করতে হবে? *নিউ সায়েন্টিস্ট* পত্রিকার (২ অক্টোবর ২০২১) রিপোর্ট হচ্ছে—ডাল, পেঁয়াজ, সব ধরনের বিন বা বিচি, বাদাম, এসপারাগাস বা শাক ও পাতাবহুল সবজি—যেগুলোতে ফাইবার বেশি, এসব খাবার উপকারী অনুজীবের জন্যে ভালো। এসপারাগাসকে ডাটাই বলতে পারেন।

এগুলো কী করে? অন্ত্রে যে অনুজীবগুলো রয়েছে, এই জীবগুলো এত ক্ষুদ্র যে পাওয়ারফুল মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না। এই উপকারী অনুজীবের খাবার হচ্ছে ফাইবার বা আঁশ। অতএব যত ধরনের আঁশজাতীয় সবজি রয়েছে, এগুলো খাবেন। অন্ত্রের অনুজীব ডোপামিন এবং সেরোটনিন উৎপাদন করে। ডোপামিন এবং সেরোটনিন নামক রাসায়নিক আমাদের মেজাজকে হালকা করে, মুডকে প্রসন্ন করে। এর সাথে যে খাবারগুলো ফার্মেন্টেড করা হয়, যেমন : ইয়োগার্ট (মিষ্টি দই না, যেটাকে টক দই বলে। অনেকে আবার খোঁচা দিয়ে ডায়াবেটিক দইও বলে), লেবুর আচার, আমের আচার, জলপাইয়ের আচার কিছুটা গ্রহণ করতে পারেন। তাহলে ফল,

আঁশজাতীয় সবজি, সব ধরনের বাদাম পরিমিত পরিমাণে খাবেন। পরিমিত পরিমাণ যখন খাবেন তখন আপনি সুস্থ থাকবেন, আপনি ভালো থাকবেন।

প্রাকৃতিক খাবারের উপকারিতা এখন সারা পৃথিবীতে প্রমাণিত। করোনাকালে আমরা যখন মধুর সাথে রসুন আর কালোজিরা খেতে বলেছিলাম, তখন আমাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা কম হয় নি। এখন ডাক্তাররা বলছে এভাবে খাওয়া যেতে পারে। কারণ রসুন ও কালোজিরা হচ্ছে ইমিউনিটির সুপার হিরো। আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ যোদ্ধা তৈরির মহানায়ক হচ্ছে রসুন, কালোজিরা, মধু। শুধু একা ম্যারাডোনা হলে হবে না, ম্যারাডোনার সাথে আরো প্লেয়ার লাগে। সেজন্যে কলা দুধ ডিম খাবেন। যে-কোনো বয়সে ডিম খেতে পারেন। ডিম সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা দেয়া হয় যে, ডিম কোলেস্টেরল বাড়ায়। যে ধারণাটা সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল চিনি নিয়ে, সেটা ডিমের ওপরে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

খাবারের ব্যাপারে আমাদের পয়েন্ট কিন্তু খুব সিম্পল। আমরা কোর্সে যা বলি, সারা পৃথিবীর ডায়াটেশিয়ানরা এখন তা-ই বলছে। আমরা কোর্সে বলি যে, প্রতিদিন এককোষ রসুন, ৩০-৪০টা কালোজিরা, এক চা-চামচ মধু, একগ্লাস দুধ, একটা ডিম ও একটা কলা খাবেন। সামুদ্রিক মাছ খাবেন। আর মাংস খুব পরিমিত খাবেন। রেড মিট যত কম খান তত ভালো। এর সাথে নিয়মিত ডাব খাবেন। ডাবের বিকল্প হচ্ছে লেবু পানি। যখন ডাব পাওয়া যাবে না, লেবু পানি খাবেন। যারা ফ্যাট কাটাতে চান, খাওয়ার পর কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে খাবেন।

সকালে ভরপেট নাশতা করবেন। ভরপেট মানে ভূরিভোজ না। অতিরিক্ত ভালো জিনিসও ক্ষতিকর। গামা পালোয়ানের নাকি নাশতায় লাগত একটা আস্ত খাসি। দেড়শ ডিম নাকি খেতেন সকালে। খুব অল্প বয়সে লিভার পঁচে মারা গিয়েছিলেন। কারণ সবকিছুর একটা লিমিট আছে। পুষ্টিকর খাবারও যদি বেশি খান সেটা ক্ষতিকর। অতএব সবসময় পরিমিত খাবেন। সকালে নাশতা যখন আপনি ভরপেট করবেন, আপনার মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়বে। নাশতায় দুটো খেজুর রাখতে পারেন। এনার্জি পাবেন। ব্রেনটা ভালো কাজ করবে।

দুপুরে সকালের চেয়ে কম খাবেন। রাতে একেবারে কম। রাতে ডিনার পার্টির মধ্যে যত না যান তত ভালো। কতটুকু খাবেন? নবীজীর (স) হাদীস অনুযায়ী খাবেন। তিনি বলেছেন, 'তোমার পাকস্থলীকে তিন ভাগে ভাগ করো। একভাগ খাবার দিয়ে পূর্ণ করো। একভাগ পানীয় দিয়ে। আর বাকি

একভাগ খালি রাখো, যাতে ভালোভাবে দম নিতে পারো।' *[মিকদাদ ইবনে মাদিকারিব (রা); তিরমিজী, মেশকাত]*

কেন? 'যাতে ভালোভাবে দম নিতে পারো!' সেই কবে এই দমের কথা তিনি বলেছেন। করোনাকালে এসে ডাক্তাররা বলছেন যে, দম নাও! যিনি পরিমিত খাবার গ্রহণ করবেন তার শারীরিক ব্যাধির পরিমাণ কম হবে। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন। নবীজী (স) যেভাবে খেতেন, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক। একবারে ঢক ঢক করে নয়, একগ্লাস পরিমাণ পানি তিন বারে পান করবেন। পানির ওপর যেন নিঃশ্বাস না পড়ে খেয়াল করবেন। অর্থাৎ একবার পানি পান করে গ্লাসটা সরাবেন। গ্লাস যদি না সরান তো শরীর থেকে বর্জ্য হয়ে নিঃশ্বাসের সাথে যা বের হচ্ছে, তা পানির সাথে মেশে। নবীজী (স) তিন ঢোকে পানি পান করতেন।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, তিনি আমাদের সচেতন হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। আমরা যদি কুখাদ্য বর্জন করি এবং স্বাস্থ্যকর সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলি, তাহলে শুধু সুস্থতা নয়, দীর্ঘ ও কর্মময় জীবনের অধিকারী হবো। পরম করুণাময় এই জ্ঞান, এই সত্য আমাদের জীবনে প্রয়োগ করার তৌফিক দান করুক।

২৯ অক্টোবর ২০২১, কোয়ান্টামম

কোয়ান্টাম ব্যায়ামচর্চা শরীর-মন ভালো রাখে

শারীরিক-মানসিক রোগ কী? এটা আমরা মোটামুটি সবাই-ই জানি। আর করোনাকালে রোগ কী, এ সম্পর্কে নতুন করে ধারণা দেয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ আতঙ্কবাদীরা রোগ এবং রোগের উপসর্গ নিয়ে এত প্রচারণা চালিয়েছে যে, নতুন করে কোনোকিছু না বলাই উত্তম।

শরীরের রোগ, মনোদৈহিক রোগ, মানসিক রোগ—আমরা রোগকে এই তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি। দেহ নাই, মনও নাই। মন বস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। অর্থাৎ মনটা বস্তুগত অস্তিত্ব তৈরি করেছে। বস্তুগত অস্তিত্ব থেকে যখন সে বেরিয়ে যায়, তখন মন কোথায় যায়? চেতনা কোথায় যায়? সে ফিরে যায় তার প্রভুর কাছে।

শারীরিক রোগ, মানসিক রোগ, মনোদৈহিক রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে যদি একটি ব্যায়াম কার্যকরী হয় সেটা হচ্ছে যোগব্যায়াম বা ইয়োগা। এরই আধুনিক সংস্করণ কোয়ান্টাম ব্যায়াম। আমরা কোয়ান্টাম ব্যায়াম নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে শারীরিক মানসিক এবং মনোদৈহিক রোগ নিরাময়ে ওষুধের ভূমিকা নিয়ে আমরা একটু ধারণা নিই।

আমাদের দেশে শারীরিক মানসিক এবং মনোদৈহিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ওষুধ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারণায় আমরা ওষুধ-নির্ভর হয়ে গেছি। কারণ আমরা যত ওষুধ খাব, তত তাদের মুনাফার পরিমাণ বাড়বে। সরকারের নিজস্ব গবেষণা বলছে, একজন মানুষ যদি স্বাস্থ্যের পেছনে ১০০ টাকা খরচ করে, ৬৪ টাকা চলে যায় ওষুধ কিনতে। এই গবেষণা করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট। কেন? কারণ আমাদের দেশে

চিকিৎসক ও রোগী, দুজনই ওষুধ-নির্ভর। চিকিৎসক যদি অনেকগুলো ওষুধ না লেখেন, রোগী তৃপ্ত হয় না যে, ডাক্তার সাহেব আমাকে ভালোভাবে দেখেন নি। যে সকল চিকিৎসক শুধু প্রয়োজনে ওষুধ দেন, তাদের চেয়ে যারা বেশি ওষুধ লেখেন, সাধারণ রোগীরা তাদের গুরুত্ব দেয় বেশি। ফলে দুদিক থেকেই ওষুধের ডিমান্ড। রোগীর দিক থেকে ও চিকিৎসকের দিক থেকে।

আমাদের এই উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট ডা. দেবী শেঠি। তিনি খুব দুঃখ করে বলেন, 'আগে একজন হৃদরোগীকে তার অপারেশন করা প্রয়োজন, এটা বোঝানোর জন্যে একঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হতো। আর এখন একঘণ্টা সময় ব্যয় করে তাকে বোঝাতে হয় যে, তোমার হার্টের অপারেশন করার দরকার নাই। পার্থক্যটা হয়ে গেছে এখানে।'

কারণ একটা তথ্য পুরোপুরি মিথ্যা হলে সেটার প্রভাব কম হয়। কিন্তু মিথ্যার সাথে যখন আংশিক সত্যকে মিশিয়ে দেয়া হয় বা আংশিক সত্যের আবরণে যখন মিথ্যাকে ঢেকে দেয়া হয়, তখন এটা থেকে বেরোতে অনেক সময় লাগে। যেমন করোনা শোনার সাথে সাথে মনে করা হতো, করোনা মানেই মৃত্যু। বোধহয় মারা গেছি! যখন দেখা গেল, করোনা মানে মৃত্যু নয়, আমি মারা যাই নি! তারপর আবার প্রাণের স্পন্দন ফিরে এসেছে। করোনাকালে ওষুধের অপব্যবহার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এখন সরকারের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলছে যে, করোনাকালে ৮০ শতাংশ অ্যান্টিবায়োটিক ছিল অপ্রয়োজনীয়। হাসপাতালে ভর্তি করার আগে ৭০ শতাংশ রোগী অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে এসে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৩৩ শতাংশ রোগী নিজেই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছে। অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের ফলে ৮০ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সুপারবাগ তৈরি হচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে ব্যাকটেরিয়া টিকে থাকতে পারে, তাদের বলে সুপারবাগ। ফলে অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিক তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে।

ডাক্তার এবং রোগী, দুই পক্ষেরই অবিদ্যা এর জন্যে দায়ী। ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না, এটা জানার পরও অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হচ্ছে। সেইসাথে অহেতুক টেস্ট। ফলে চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে বছরে এক কোটির বেশি মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। যেটা আমাদের জনসংখ্যার সাত শতাংশ!

আমাদের দেশের তিন কোটি মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে বাস করে। এর পেছনেও সবচেয়ে বড় দায় এই চিকিৎসাব্যবস্থার। আমরা যদি শারীরিক

মানসিক ও মনোদৈহিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে পারি, দেশের চিকিৎসাখাতের ব্যয় প্রায় ৮০ শতাংশ কমিয়ে ফেলা সম্ভব। চিকিৎসা ব্যয় কমাতে খুব বেশি মেহনতের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু সচেতনতা।

দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় কেন? ছোট ছোট যত্নের অভাবে। বছরের পর বছর দেহে ছোট ছোট অযত্ন জমতে থাকে। ধরুন, একটা ঘরে যদি ময়লা জমতে থাকে, কী হবে? আমি তো স্টিলের আলমারির মধ্যে কোনো ফাঁক খুঁজে পাই না, তারপরও দেখি যে, ওটার মধ্যে ময়লা ঢুকে যায়। খুব রিফাইনড ময়লা। এসি রুম, তারপরও ওখানে ময়লা জমে। একদিন, দুই দিন, তিন দিনে বোঝা যায় না। এক সপ্তাহ, ১৫ দিন পর বোঝা যায়। ১৫ দিন যদি আলমারি না খুলি, তারপর বোঝা যায় যে, সুন্দর পাউডার। যেটাকে আপনি ইচ্ছে করলে গালে মাখতে পারবেন না। কারণ ধুলা-আবর্জনার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস থাকে।

দেহও তা-ই। ছোট ছোট অযত্ন, অবহেলা জমতে জমতে অসুখ সৃষ্টি হয়। একইভাবে মনের অযত্ন যদি আপনি করেন, আত্মার অযত্ন যদি করেন অসুখ হয়। কারণ সুস্থতা শুধু শারীরিক-মানসিক নয়, সুস্থতা আত্মিক, পারিবারিক এবং সামাজিক। আপনি যদি নিঃসঙ্গ হন, আপনার অসুস্থতার পরিমাণ বেড়ে যাবে। যে কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, সুস্থতা হচ্ছে শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আত্মিকভাবে ভালো থাকার নাম। তাই যত্ন নিতে হবে চতুর্মুখী। আপনার অস্তিত্ব শুধু দেহ নয়, আপনার অস্তিত্ব আপনার দেহ, আপনার মন, আপনার সমাজ, আপনার আত্মা। সবটা মিলে সুস্থতা।

তাহলে কী করতে হবে? আপনার অস্তিত্বের সুস্থতার অন্যতম প্রতিষেধক হচ্ছে কোয়ান্টাম ইয়োগা বা কোয়ান্টাম ব্যায়াম। যেটাকে আমরা যোগব্যায়াম বা ইয়োগা বলি, এটা মানবজাতির হাজার বছরের সম্পদ। প্রাচীন সভ্যতায় সাধকেরা এই ব্যায়াম বিভিন্ন ভঙ্গিতে চর্চা করতেন। মহেঞ্জোদারো হরপ্পায় এই চর্চাকে যোগ বলা হয়।

যোগ শুধু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ নয়। আমরা যেটাকে ব্যায়াম বলি, সেটা হচ্ছে আসন। যোগ হচ্ছে একটি বিজ্ঞানসম্মত শারীরিক-মানসিক যত্নায়ন প্রক্রিয়া। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যোগের অংশ। চিন্তা-চেতনাকে পরিশুদ্ধ করাও যোগের অংশ। প্রাণায়াম, ধ্যান যোগের অংশ। অষ্টাঙ্গ যোগের একটা অঙ্গ হচ্ছে আসন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাধারণ মানুষের কাছে এই ব্যায়ামটাই ইয়োগা বা যোগ নামে পরিচিত। গত শতাব্দীতে ব্যায়ামের এই অংশের সাথে আমরা কোয়ান্টাম শক্তিকে সংযোজন করলাম। কোয়ান্টাম

মানেই মনের ক্ষমতা। আমরা আসনের সাথে ভিজ্যুয়ালাইজেশন বা মনছবিকে যোগ করলাম। আপনি যখন কোনো আসন করবেন তখন মনছবি করতে হবে যে, আসনের ফলে আপনার অঙ্গগুলোতে কী ক্রিয়া হচ্ছে, কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। অবলোকন করতে হবে—এই এলাকায় রক্ত চলাচল বাড়ছে, এই এলাকায় চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন যে, ইয়োগা করার ফলে অঙ্গগুলো মজবুত হচ্ছে, সুগঠিত হচ্ছে, স্থিতিস্থাপকতা বাড়ছে, রক্ত চলাচল বাড়ছে। ফলে নির্দিষ্ট অঙ্গে যদি ব্যথা-বেদনা থাকে তা দূর হয়ে যায়।

যোগের বিভিন্ন আসনকে মডিফাই করে ফিজিওথেরাপি করা হয়েছে। যখন আপনি ফিজিওথেরাপিস্টকে পয়সা দিচ্ছেন, তিনি আপনার হাত-পা ডলে দিচ্ছেন, ওঠাচ্ছেন, নামাচ্ছেন। আর যোগব্যায়াম অনুশীলনে আপনার নিজেকেই হাত-পা ওঠাতে নামাতে হয়।

যখনই যোগব্যায়ামের সাথে আপনি মনছবিকে যোগ করলেন, মনের শক্তিকে যুক্ত করলেন, দেহের সাথে সাথে মনের ব্যায়ামও হয়ে গেল। ভিজ্যুয়ালাইজেশন নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। আপনি ভিজ্যুয়ালাইজ করছেন যে, আপনি দৌড়াচ্ছেন। যদি আপনার ভিজ্যুয়ালাইজেশন স্ট্রং হয়, বসে থেকে আপনার ব্রেনে প্রোগ্রাম হয় যে, আমি দৌড়াচ্ছি। যে-রকম আপনি একটা খেজুর চিবোতে থাকবেন। আধাঘণ্টা ধরে একটা খেজুরই চিবান। তারপরে পানি পান করুন। আধাঘণ্টা খাবার খেলে ব্রেন যে পরিমাণ তৃপ্ত হতো, সেই পরিমাণ তৃপ্তি লাভ করে একটা খেজুর আধাঘণ্টা চিবালে। কারণ নার্ভাস সিস্টেম বাস্তবতা এবং কল্পনার মধ্যে তফাৎ করতে পারে না। অর্থাৎ দাঁত চিবোচ্ছে আর ব্রেনে ইনফরমেশন যাচ্ছে যে, হাঁ, খাচ্ছি। এজন্যে যারা ডায়েট কন্ট্রোল করতে চান, তারা অল্প খাবেন, চিবোবেন অনেকক্ষণ ধরে। ব্রেন ভাববে যে, অনেক খাওয়া হয়েছে। একশনটা সেইভাবে হবে।

কোয়ান্টাম ইয়োগার সাথে মাইন্ড পাওয়ারটাকে খুব অঙ্গাঙ্গিভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে যিনি চর্চা করছেন, তিনি শারীরিক মানসিক আত্মিক এবং সামাজিক—সবদিক থেকে উপকৃত হচ্ছেন।

একটা সময় এটা নিয়ে আমাদের দেশে যথেষ্ট হাসিঠাট্টা হতো। অবিশ্বাস ছিল, সন্দেহ ছিল, সংশয় ছিল। কিন্তু এখন সারা পৃথিবীতে চিত্রটা বদলে গেছে। কেন? ব্যায়ামের উপকারিতার ফলে। আমেরিকান কলেজ অব ফিজিশিয়ানস বলছে যে, যাদের ক্রনিক লো ব্যাকপেইন রয়েছে তাদের প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে ইয়োগা। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী মিলিটারিদের এখন ইয়োগা ট্রেনিং দিচ্ছে। কারণ শুধু লেফট-রাইট করে তারা ফিজিক্যালি ফিট

হচ্ছে, কিন্তু তারা ডিপ্রেশন থেকে বের হতে পারছে না, মানসিক অস্থিরতা থেকে বের হতে পারছে না। সেজন্যে তাদের সৈনিকদের তারা ইয়োগা শেখাচ্ছে, নভোচারীদের ইয়োগা শেখাচ্ছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (এনআইএইচ) যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসাবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ সরকারি প্রতিষ্ঠান। মেডিটেশনের মতো তারা ইয়োগাকেও তাদের গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বাংলাদেশে ২০১৩ সালে প্রথম *ন্যাশনাল গাইডলাইন ফর হাইপারটেনশন* নির্দেশিকায় যোগব্যায়াম এবং মেডিটেশন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমাদের দেশের যত প্রশাসনিক একাডেমি রয়েছে, প্রশাসকদের স্ট্রেস কমানোর জন্যে ইয়োগার ট্রেনিং এখন আমরাই করাচ্ছি। কারণ আমরা ছাড়া সঙ্ঘবদ্ধ কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই, যারা ইয়োগার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। ইয়োগার ব্যাপারে আমাদের বিশেষায়িত জ্ঞান ৪০ বছরের। আমরা ইয়োগা মেডিটেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করলাম ১৯৮৩ সালে।

অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমান, শিল্পী ও ব্যায়ামবিদ কামরুল হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. কাজী মফিজুর রহমান—তারা ছিলেন আমাদের প্রথমদিকের উৎসাহী যোগ চর্চাকারী। তারা আমাদের শান্তিনগর অফিসে এসেছেন ও যোগচর্চা করেছেন। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আজকে ইয়োগার কথা বলতে হয় না। এখন এমন কোনো পত্রিকা নাই, যারা ইয়োগার ওপরে রেগুলার ফিচার বের করে না। আমাদের ৪০ বছরের কাজের ফলশ্রুতি হচ্ছে দেশে ইয়োগার জনপ্রিয়তা।

নামাজে ওঠা-বসা-দাঁড়ানো-হাত তোলা, সবকিছুর মধ্যে যোগব্যায়ামের ৮২টা মুদ্রা রয়েছে। রসুলুল্লাহ (স) স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কত সচেতন ছিলেন! তিনি যোগের একটি আসন নিয়মিত অনুশীলন করতেন—অর্ধবজ্রাসন, নামাজে যেভাবে আমরা বসি। অর্থাৎ ধর্মাচারের মধ্যে ব্যায়ামকে সংযুক্ত করা সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের বড় অবদান। যে কারণে মদিনাতে রোগী পাওয়া যেত না। হযরত ওমরের (রা) সময় যখন খেলাফত বিস্তৃত হলো, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, যেটাকে রুম বলা হতো সেটা খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হলো। তখন স্বাভাবিকভাবে মদিনাতে টাকাপয়সা আসতে শুরু করল। রুম থেকে ডাক্তার আসা শুরু করল। যে ডাক্তারই আসে, একমাস পর ফেরত চলে যায়। কারণ রোগী পায় না মদিনাতে। কেন? সুস্থ জীবনাচার এবং ব্যায়াম।

নবীজী (স) যে আসনে প্রায়ই বসতেন, সেটার আরবি নাম কারফাসা।

বাংলায় সেটাকে আমরা বঙ্গাসন বলি। আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত, ‘আমি রসুলকে (স) কারফাসা ভঙ্গিতে বসে খেজুর খেতে দেখেছি।’ *[মুসলিম]*

তিরমিজী শরীফে গ্রন্থিত হাদীস—আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রা) কারফাসা ভঙ্গিতে বসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা সুন্নত। আমরা বললাম, আমাদের মনে হয় এভাবে বসাটা কষ্টকর। তিনি বললেন, ‘কখনো নয়! বরং এটা আমাদের রসুলের (স) সুন্নত।’

এই একটি আসন যদি মহিলারা নিয়মিত করেন, ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সিজার করার প্রয়োজন হবে না। বডির লোয়ার পার্ট এত স্ট্রং হবে! বঙ্গাসন হচ্ছে পিঁড়ি ছাড়া নিচু চুলার কাছে বসা। পিঁড়ি বোঝেন তো? জলচৌকির চেয়ে নিচু। যারা এখন থেকে নিয়মিত বঙ্গাসন করবেন, হাঁটুতে ব্যথা, ঊরুতে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, ব্যাকপেইন, লো ব্যাকপেইন থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। পৃথিবীতে যত পেইনকিলার তৈরি হয়, ৮০ শতাংশ পেইনকিলারের ভোক্তা হচ্ছে আমেরিকান। আপনাদের আমেরিকান হতে হবে না, বাঙালি হিসেবে ব্যাকপেইন ছাড়া জীবন অতিবাহিত করতে পারবেন, যদি শুধু এই একটি সুন্নত নিজের জীবনে চালু করেন।

যোগব্যায়ামের চার হাজার আসন চর্চা করার প্রয়োজন নেই। আবার ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্যে, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে হেভি এক্সারসাইজেরও কোনো প্রয়োজন নেই। এজন্যে প্রয়োজন কোয়ান্টাম ব্যায়াম। আপনাদের মা-জী কোয়ান্টাম ব্যায়াম নিয়ে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটা বই লিখেছেন। ডিসেম্বর ২০০৪ সালে প্রকাশিত। মানে ১৭ বছর! *রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম এবং সৌন্দর্যচর্চা*। আমার সৌভাগ্য হয়েছে এই বইয়ে ছোট্ট একটা ভূমিকা লেখার। এই বইটা প্রত্যেকের ঘরে থাকা উচিত, যাতে আপনি চর্চা করতে পারেন।

আর ঘরের কাজ করবেন। ঘরের কাজে নড়াচড়া হয় অনেক। উঠতে হয়, নামতে হয়, কাত হতে হয়, চিৎ হতে হয়, উপুড় হতে হয়, নানান রকম ভঙ্গি! ঘরের এমন কোনো কাজ নাই যেটা রসুলুল্লাহ (স) করতেন না। আমরা খালি সুন্নত বলতে বিশেষ কিছুকে বুঝি। শুধু বিশেষ কিছু নয়, বরং রসুলুল্লাহ (স) করেছেন এমন সব কাজই সুন্নত। নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়াম করবেন। ডাক্তারের কাছে কম যেতে হবে, ওষুধ কম খেতে হবে। ফলে চিকিৎসা খাতে ব্যয় ও দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যাবে।

২৬ নভেম্বর ২০২১, কোয়ান্টামম

ঘুম ॥ প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ

Early to bed and early to rise, makes a man healthy wealthy and wise. আমরা খুব বিস্মিত হই এই ভেবে যে, ইংরেজিতে এত সুন্দর ছড়া রয়েছে। ইংরেজিতে এই কবিতা লেখার অন্তত হাজার বছর আগে খনা বলেছিলেন—'সকাল শোয় সকাল ওঠে, তার কড়ি না বৈদ্য লুটে!' কড়ি মানে টাকা। বৈদ্য মানে এখনকার ভাষায় চিকিৎসক! কারণ রোগ হলে মানুষ চিকিৎসকের কাছে যায়। ফলে টাকাটাও তার কাছে যায়। খুব নির্মম সত্য কথা খনা বলে গিয়েছেন।

আসলে এই বাংলার মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত শাণিত। কেন? কারণ বাংলার মানুষের মনে মায়া আছে এবং অন্তরে স্রষ্টাপ্রেম আছে। মানুষের প্রতি প্রেম, স্রষ্টার প্রতি প্রেম। যে কারণে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক জ্ঞানী ছিলেন, অনেক প্রাজ্ঞ ছিলেন, অনেক মানবিক ছিলেন।

Early to bed—সকাল শোয়, মানে তাড়াতাড়ি, সন্ধ্যা হওয়ার পর পর শোয় এবং সকাল ওঠে অর্থাৎ ভোর হওয়ার আগে ওঠে। বলাই হয় যে, ভোরের হাওয়া লাখ টাকার দাওয়া! এখন তো এটা লাখ টাকা না, কোটি টাকার দাওয়া। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এই জ্ঞান থেকে দূরে সরে যাওয়াতে প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রায় ৫২ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; ২০১৮ সালের প্রতিবেদন)।

আসলে চিকিৎসক যে খুব একটা পায় তা-ও না। ক্লিনিকওয়ালা, যারা বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতি নিয়ে টেস্ট করানোর জন্যে বসে থাকে, কোনো কথা নাই, বার্তা নাই—এমআরআই করো, এই করো, সেই করো। অর্থাৎ ওষুধ

খাওয়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে ৫০-৬০ হাজার টাকা শেষ!

কেন? কারণ আমরা প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছি। প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধের নাম হচ্ছে ঘুম। অথচ এখন রাত্রি হওয়ার পর পরই ঘুমোতে না গিয়ে সারারাত কী করছি? ফেসবুকিং করছি, গেম খেলছি অথবা টিভি সিরিয়াল দেখছি। পর্দার সামনে থাকতে থাকতে যখন চোখ ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন রাত ৩টা-৪টা বাজে। তখন ঘুমোতে যাই। ফলে কী হয়?

আমাদের পিনিয়াল গ্ল্যান্ড থেকে একটা হরমোন নিঃসরণ হয়। এটার নাম মেলাটোনিন। ঘুম আনার জন্যে প্রয়োজনীয় হরমোন এই মেলাটোনিন। মেলাটোনিনের একটা সাইকেল থাকে। যখন স্ক্রিনের কৃত্রিম নীল আলো আপনার চোখে পড়ে, তখন ঘুমের চক্রটা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ঘুম আসার জন্যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক মেলাটোনিনের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং ঘুমটা নষ্ট হয়ে যায়। মেলাটোনিনের ঘাটতি বাড়লে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, অনিদ্রা সৃষ্টি হয়। স্তন গর্ভাশয় এবং প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিষণ্নতা বেড়ে যায়।

আসলে এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। পর্যাপ্ত ঘুমের প্রয়োজনীয়তা চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রমাণিত সত্য। যখন ঘুমের সাইকেলটা নষ্ট হয়ে যায় তখন শুধু ঘুমের সাইকেল নয়, এই যে দেহঘড়ি বা জৈবঘড়ির—দেহের ভেতর সময়ের চক্র, সময়ানুসারে কাজের প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। যখন আপনি কাকডাকা ভোরে আজানের সাথে সাথে উঠছেন, তখন ভোরের নির্মল বাতাস দেহ-মনে চনমনে একটা ভাব নিয়ে আসে। সারাদিন যানবাহন ও কলকারখানার ধোঁয়া নির্মল বাতাস নষ্ট করে দেয়। রাতের বেলা সাধারণভাবেই মানুষজন ঘরে থাকে। ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকে। রাস্তাঘাটে গাড়ি চলাচল কম হয়। ফলে সুবহে সাদিকের নির্মল বাতাস অক্সিজেন এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর। যারা ভোরে উঠে দিন শুরু করেন, দিনের বরকত তারা পান। নিজের দিকে তাকানোর সুযোগ পান। তারা অন্যদের চেয়ে সুশৃঙ্খল।

কেন? ভোরবেলা যখন ওঠা হয় দিনটা অনেক লম্বা হয় আর ভোরবেলা যদি না ওঠেন, দিনটা ছোট হয়ে যায়। যারা সকালবেলা হাঁটতে বের হন বা ইয়োগা করেন, তারা তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং তাদের পারিবারিক বন্ধনও সুদৃঢ়। কারণ তারা ধীরস্থির। ব্যস্ততার মাঝেও পরিবারের প্রতি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পান বেশি।

আশির দশক থেকে শুরু হয়েছে পর্দার আগ্রাসন। প্রথমে টিভি, তারপরে

ক্যাবল আর এখন স্মার্টফোন। পর্দার আগ্রাসনের ফলে রাতজাগার পরিমাণ বেড়ে গেছে। ফলে কী হচ্ছে? রাতের বড় অংশ জেগে থাকা হচ্ছে। ভোররাতে ঘুম এবং তারপরে উঠতে দেরি। কোনোরকম উঠে খালি দৌড় দৌড়! অফিসে-স্কুলে ছুটে যেতে গিয়ে সকালের পরিচ্ছন্নতার কাজও ঠিকভাবে হয় না, নাশতাও ঠিকভাবে হয় না। তারা অফিসে বা ক্লাসে গিয়েও ঝিমাতে থাকে। দিনের অর্ধেকটা চলে যায় ঝিমাতে ঝিমাতেই। অবসাদগ্রস্ততা, খিটখিটে মেজাজ, মুড অফ এবং বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্যঝুঁকির শিকার হয় তারা।

রাতের ঘুম হচ্ছে প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ। রাতে পর্যাপ্ত ঘুমালে আপনার সুস্থতার পরিমাণ বেড়ে যাবে। যারা প্রযুক্তি নির্মাণ করেছে, যারা প্রযুক্তি বিক্রি করে লাভবান হয়েছে, প্রযুক্তির এই দানবরা কিন্তু রাতে ঘুমায়। তারা রাতে জাগে না।

ইয়াহুর প্রধান নির্বাহী রাতে চার ঘণ্টা ঘুমান এবং ভোর সাড়ে ৪টায় ওঠেন। ইমেইল চেক করেন। তারপরে জিমে চলে যান। টুইটারের (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স) সহপ্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডরসি ভোর সাড়ে ৫টায় ওঠেন। প্রথমে মেডিটেশন করেন এবং তারপর ছয় মাইল জগিং করেন। এরপরে দিনের কাজ শুরু করেন। অর্থাৎ প্রযুক্তি বিক্রি করে যারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছে তারা কিন্তু এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের ঘুম হারাম করে নি। তারা নিজেরা ভালোমতো ঘুমিয়েছে এবং বুদ্ধি পাকিয়েছে যে, অন্যের ঘুম কীভাবে হারাম করা যায়!

আপনি রাতের প্যাঁচা হতে পারেন। প্যাঁচা কী করে জানেন তো? রাতে জেগে থাকে। আবার সকালবেলার পাখিও হতে পারেন। ঐ যে ছড়া আছে না—'আমি হবো সকালবেলার পাখি!' এখন আপনি কী হবেন এটা আপনার ওপরে নির্ভর করছে। একদিন, দুই দিন, তিন দিন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে রাত্রি জাগলেন, এটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু রাত জাগাটাই যখন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই মেলাটোনিন হরমোনের সাইকেলটা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কী হয়? জ্বর জ্বর লাগে, ঠান্ডা লাগে, এসিডিটি হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়। আর অনিদ্রা তো আছেই। অনিদ্রার পরিণতি হচ্ছে অল্প বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মধারা যেমন—সৃজনশীলতা, প্রাণবন্ততা, কর্মতৎপরতা কমে যাওয়া। মনে রাখবেন, ঘুম প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ। রাতে যদি আপনি গভীরভাবে ঘুমান এবং ভোরে জেগে ওঠেন, চিকিৎসার পেছনে আপনার ব্যয় হবে সবচেয়ে কম। অর্থাৎ চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা আপনার টাকা লুটে নিতে পারবে না।

এক. রাতে যদি জাগেন তাহলে জৈবছন্দ, যেটাকে বায়োরিদম বলা হয় ইংরেজিতে—এই বায়োরিদমটা নষ্ট হয়ে যায়। বায়োরিদমের কথা আমরা ৪০ বছর ধরে বলে আসছি যে, আপনার দেহের একটা ছন্দ আছে। এই ছন্দটা নষ্ট করবেন না। ছন্দ অনুসারে কাজ করবেন। গবেষণায় দেখা গেছে, সকালবেলা যারা ওঠে পরীক্ষার স্কোর তাদের ভালো। যারা দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে তাদের পরীক্ষার স্কোর তুলনামূলক খারাপ।

দুই. দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার হচ্ছে সকালের নাশতা। আমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু সকালে নাশতা করত না, তারা ভাত খেত। এজন্যেই তারা এত শক্তিমান ছিল, বুদ্ধিমান ছিল। সকালের নাশতা—রুটি, ভাত যেটা পাওয়া যায় সেটা দিয়ে ভরপেট নাশতা করবেন। সকালের নাশতা হচ্ছে জীবন রক্ষাকারী। আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি ২০১৯ সালে একটা গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে, সকালের নাশতা জীবন রক্ষাকারী হতে পারে। অন্যদিকে সকালে নাশতা যদি বাদ দেয়া হয়, কী হয়? আমাদের অনেকে এখন ব্রেকফাস্ট করে না। ব্রাঞ্চ করে দুপুর ১২টার সময়। ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ, একত্রে নাম হচ্ছে ব্রাঞ্চ। এই ব্রাঞ্চ যারা করে তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার ঝুঁকি ১৯ শতাংশ বেশি।

ইংল্যান্ডের ফুটবল ক্লাব আর্সেনাল-এর খেলোয়াড়দের সকালবেলার খাবার হচ্ছে চাল সেদ্ধ। চাল সেদ্ধ মানে কী? ভাত। সাথে সবজি, ডাল। আর্সেনাল ক্লাবে যিনি ২২ বছর কোচ ছিলেন, যিনি ক্লাবটাকে দাঁড় করিয়েছেন—আর্সেন ওয়েঙ্গার অনেক গবেষণা করে দেখলেন যে, এই খাবার না খেলে খেলোয়াড়দের স্ট্যামিনা বাড়ে না।

আমাদের কোয়ান্টারাও সকালে ভাত খায়। তাদের সাথে দৌড়ে কেউ পারে না। কোয়ান্টারা দৌড় দিলে অন্যরা তাকিয়ে থাকে।

আজ আমাদের কোয়ান্টারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হচ্ছে। পাহাড়ের কোনো স্কুল থেকে আজ পর্যন্ত এত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল বা অন্য কোথাও ভর্তি হয় নি। কেন? তারা রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালবেলা ওঠে ফজরের সময়। ব্যায়াম বা ইয়োগা করে, মেডিটেশন করে, তারপরে ভরপেট ভাত খায়। সবজি, ডাল, সেইসাথে ডিমও খায়। ব্যস! তাদের এনার্জি, তাদের ফিটনেস যে-কোনো স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে অনেক অনেক ভালো।

কেন? যখন একজন মানুষ রাত্রি ১১টার মধ্যে ঘুমোতে যায় ও ফজরের সময় ওঠে অর্থাৎ সূর্যের কিরণ ওঠার আগে ওঠে, তখন তার জীবনে শৃঙ্খলা

সৃষ্টি হয়। জীবনে এই শৃঙ্খলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে ডায়াবেটিক সমিতির মেম্বার হয়ে ৪০, ৫০ বছর বয়সে জানতে হবে যে, ডিসিপ্লিন ইজ লাইফ! শৃঙ্খলা হচ্ছে জীবন। এটা শিখতে হবে স্কুলে থাকতে, শিশুশ্রেণিতে যে, ডিসিপ্লিন ইজ লাইফ। এটা শিখতে যদি ৫০ বছর লাগে তো আর কত বছর বাঁচবেন? তখন তো মিষ্টি খেতে পারবেন না, এইটা খেতে পারবেন না, ঐটা খেতে পারবেন না। এইটা খেলে সুগার বাড়বে, ঐটা খেলে সুগার কমবে বা হাইপো হবে, আরো কত কিছু!

আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সূর্য ওঠার আগে উঠে ধ্যানমগ্ন হতেন। সূর্যের কিরণ তার চেহারার ওপর এসে পড়ত। ধ্যান থেকে উঠে তিনি প্রতিদিনের কাজ শুরু করতেন। যে কারণে তার বইয়ের পরিমাণ যে কত! কত যে কাজ তিনি করেছেন তার শেষ নাই। কবিগুরু অত্যন্ত সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করেছিলেন বলেই এত লেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

সাইকোলজিস্টরা গবেষণা করে বলছেন, একজন মানুষের মেধা ৯৩ শতাংশ আর ডিসিপ্লিন (সুশৃঙ্খলা) সাত শতাংশ হলে জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর একজন মানুষ যদি ৯৩ শতাংশ সুশৃঙ্খল হয়, সাত শতাংশ মেধা দিয়েও জীবনে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা তার বেশি। কারণ শৃঙ্খলা মানেই হচ্ছে নিয়ম। শৃঙ্খলা মানে একটা প্রক্রিয়া, একটা চর্চা বা অনুশীলন। যিনি নিয়মিত অনুশীলন করেন তার জীবনে সাফল্য আসে। আবার ৯৩ শতাংশ মেধা নিয়েও তিনি ব্যর্থ হতে পারেন, যদি সুশৃঙ্খল না হন।

জোসেফ স্কুলিং। অলিম্পিকে সিঙ্গাপুরের প্রথম স্বর্ণজয়ী সাঁতারু। ছোটবেলা থেকে তার স্বপ্ন ছিল যে, তিনি অলিম্পিকে সোনা জিতবেন। তার বয়স যখন আট বছর, তার বাবা তাকে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। ভোর ৪টার সময় উঠে বাবার হোটেল রুমে নক করছে যে, বাবা! আমাকে সুইমিং পুলে নিয়ে চলো। আমার প্র্যাকটিস করতে হবে। চিন্তা করেন! আট বছরের একটা ছেলে ভোর ৪টায় বাবার রুমে নক করছে যে, বাবা! আমাকে সুইমিং পুলে নিয়ে চলো! বেড়াতে গেলে আমরা কী মনে করি যে, আরে! এখন আমি বেড়াচ্ছি। সমুদ্রের পাড়ে বালুর ওপরে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি!

তার যিনি আদর্শ বা মডেল ছিলেন—মাইকেল ফেলপস। মাইকেল ফেলপস-এর সাথে ছোটবেলায় তিনি ছবি তুলেছিলেন যে, এই হচ্ছে আমার মডেল। অলিম্পিকে নিজের মডেল ফেলপস-কে এক সেকেন্ডের ব্যবধানে হারিয়েছেন স্কুলিং। ফেলপস-এর মহত্ব হচ্ছে, তিনি স্কুলিং-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই শৃঙ্খলাটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ জীবনের জন্যে।

এপিজে আবদুল কালাম ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে অংক কষতে চলে যেতাম শিক্ষকের কাছে। শিক্ষক পাঁচ জনকে অংক করাতেন দেড় ঘণ্টা, এরপর সাড়ে ৫টায় ছুটি পেয়ে তিন কিলোমিটার দৌড়ে স্টেশনে যেতেন। স্টেশনে রেলগাড়ি থামার সুযোগ নেই। গাড়ি থেকে পত্রিকা ছুড়ে মারা হতো। সেই পত্রিকা সংগ্রহ করে শহরে ফেরি করতেন তিনি। অর্থাৎ পড়াশোনার পয়সা জোগাড় করার জন্যে হকারি করতেন, পত্রিকা বিলি করতেন। ছেলেবেলায় এই মেহনত, পরিশ্রম করার ফলে তিনি কী করেছেন? ৮০ বছর বয়সেও কাজ করেছেন। মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্যে আলোচনা করতেন এবং আলোচনার ডায়াসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে তিনি মারা যান। অর্থাৎ কর্মময় মৃত্যু! এপিজে আবদুল কালামের জীবন অসাধারণ সুশৃঙ্খল। সেজন্যে তিনি জেলের ছেলে হয়েও লেখাপড়া শিখে এত বড় হতে পেরেছেন!

আধুনিক মালয়েশিয়ার জনক মাহাথির মোহাম্মদ। যিনি ৯২ বছর বয়সে আবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন! তিনি মালয়েশিয়াতে কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে সঠিক সময় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পাঞ্চকার্ডের প্রচলন করেন। তিনি কখন অফিসে ঢোকেন *টাইম* ম্যাগাজিন পর পর পাঁচ দিনের সেই রেকর্ড প্রকাশ করেছে। প্রথমদিন সকাল ৭:৫৭ মিনিট, দ্বিতীয় দিন ৭:৫৬ মিনিট, পরদিন ৭:৫৭ মিনিট, এর পরদিন ৭:৫৯ মিনিট এবং পঞ্চম দিন সকাল ৭:৫৭ মিনিট। অর্থাৎ ৮টা বাজার আগেই তিনি অফিসে ঢুকতেন। প্রধানমন্ত্রী অফিসে ঢুকলে কী, না ঢুকলে কী! এতে কারো কিছু যায়-আসে না। কারণ তার তো সবই অফিস। বাসাও অফিস, বাস্তব অফিসও অফিস। তারপরেও অফিসে ৮টা বাজার এক মিনিট আগে হলেও তিনি ঢুকেছেন!

নবীজী (স) সহজভাবে বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্যে সকালকে বরকতময় করে দাও।' *[সাখর ইবনে ওয়াদাহা (রা); তিরমিজী]*

রসুলুল্লাহর (স) কন্যা, মা ফাতেমার (রা) বর্ণনা, 'একদিন রসুল (স) ভোরবেলা এসে আমাকে ঘুমে দেখতে পেলেন। তখন তিনি আমাকে নাড়া দিয়ে বললেন, হে প্রিয় কন্যা! ওঠো! তোমার রবের পক্ষ থেকে রিজিক গ্রহণ করো। অলসদের দলভুক্ত হয়ো না। কারণ আল্লাহ তায়ালা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মানুষের মাঝে রিজিক বণ্টন করে থাকেন।'

বাইবেলে আছে, 'আরেকটু ঘুম, আরেকটু তন্দ্রা, বিছানায় আরেকটু গড়াগড়ি—দারিদ্র্য ও অভাব দস্যুর মতো হানা দেবে তোমার অন্দরে।' *[হিতোপদেশ ২৪:৩৩-৩৪]*

১০—

ধম্মপদে বলা হয়েছে, ‘আলস্য ও অতিভোজনের দরুন স্থূলাকায় নিদ্রালু হয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দেয়া স্বভাবে পরিণত হলে সেই মূর্খের জীবনে দুঃখের পুনরাবৃত্তি ঘটবে!’ *[নাগবগ্‌গো : ৩২৫]*

ভগবদ্‌গীতায় ধ্যানযোগের ১৬ এবং ১৭ নম্বর শ্লোক হচ্ছে, ‘যিনি নিয়মানুযায়ী আহার করেন, কাজ করেন, বিশ্রাম নেন, যার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মের ছন্দে ছন্দায়িত, তিনি ধ্যানে সফল হন। তার দুঃখের বিনাশ ঘটে। বিচরণ করেন আত্মার আনন্দলোকে।’

তাহলে আমাদের কর্মপ্রণালী কী হবে? রাত ১১টার মধ্যে পারিবারিকভাবে সকল স্ক্রিন বন্ধ করে ঘুমাতে যান। চা-কফি যত না খান তত ভালো। বিশেষত বিকেলের পর কফি খাবেন না। কারণ কফির ক্যাফেইনের প্রভাব ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরে থেকে যায়। ফলে গভীর ঘুম হয় না। পৃথিবীতে যে জাতি কফি বেশি খায়, তাদের অনিদ্রার হার সবচেয়ে বেশি।

নিয়মিত যোগব্যায়াম এবং দৈহিক পরিশ্রম করতে হবে। তাহলে ঘুমের গভীর স্তর—ডেল্টা লেভেলের পরিমাণটা ভালো হবে। আর ভোরবেলা দিন শুরু করুন। আপনি সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। যাদের ঘুমে একটু সমস্যা হয় বা ঘুম আসতে চায় না, কী করবেন? বিছানায় শুয়ে ধীরে ধীরে দম নিতে থাকুন, দম ছাড়তে থাকুন। ঘুম চলে আসবে। আর ঐ সময় স্রষ্টাকে স্মরণ করতে থাকবেন। কারণ তখন শয়তান একটিভ হয়ে যাবে যে, ব্যাটা! ঘুম না আসা পর্যন্ত তো খালি আল্লাহ আল্লাহ করবে! ঘুম পাড়িয়ে দাও ওকে! আল্লাহর নাম নিতে নিতেই দেখবেন যে, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

১১টার মধ্যে ঘুমাতে যাওয়া ও ফজরের সময় ওঠা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হোক। আমাদের জীবন সুশৃঙ্খল হোক। আমরা কর্মময় সফল সৃজনশীল জীবনযাপন করি, জীবন যুদ্ধে জয়ী হই। এই প্রার্থনা করেই আমরা আমাদের আজকের আলোচনার উপসংহার টানতে পারি—প্রভু! আমাদেরকে সুন্দর ঘুম, সুন্দর জাগৃতি অর্থাৎ সকাল শোয়া, সকাল ওঠার তৌফিক দান করুন।

২৯ অক্টোবর ২০২২, কোয়ান্টামম

নব্যধনিক রোগ ॥
হৃদরোগ

হৃদরোগ হলো হৃদযন্ত্র এবং রক্তনালীর রোগ। গত বছর হৃদরোগে আমাদের দেশে দুই লক্ষ ৭০ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়। মানে আমাদের দেশে গতবছর যত মানুষ মারা গেছে তার ৩৪ শতাংশ মারা গেছে হৃদরোগে। হৃদরোগকে আমরা বলতে পারি নব্যধনিক শ্রেণির রোগ। নতুন টাকা যাদের হাতে এসেছে, এটা মূলত তাদের রোগ। কারণ নতুন টাকা এলে একজন মানুষ অন্যকে কীভাবে দেখাবে যে, তার নতুন টাকা এসেছে? বলে বেড়াতে তো পারে না, বিজ্ঞাপনও দিতে পারে না। আবার টাকা হাতে নিয়ে হাঁটতেও পারে না। কে আবার ছোঁ মেরে নিয়ে যায়! সে কী করে? সে ভোজসভার আয়োজন করে।

এই নব্যধনিক শ্রেণি খাবার খায় সন্ধ্যার পরে। এরা মূলত বুফে খাবার খায়। খাবারের প্রতিযোগিতা। ১০০ আইটেম। যা-ই খাওয়া হোক, টাকা একই। আইটেম ১০০টা হোক, ২০০টা বা ৫০টা, তার পেট যতটুকু ততটুকুই তো সে খাবে কিন্তু একেবারে ঠেসে ঠেসে খাবে। যখন আর খেতে পারে না তখন সে থামে। কোথায় গিয়ে খায়? সবচেয়ে চর্বিদার খাবার যেখানে পাওয়া যায়, ভাজাপোড়া, গ্রিল যেখানে পাওয়া যায় সেখানে।

হোয়াইট পয়জন চিনি, তেল, চর্বি, অতিরিক্ত ভাজাপোড়া, বুফে খাবার, রাতে ভূড়িভোজ হচ্ছে হৃদরোগের এক নম্বর কারণ। আর যত ধরনের আসক্তি—খাবারের আসক্তি, বিলাসিতায় আসক্তি, স্মার্টফোন বা অন্য যে-কোনো আসক্তি হৃদরোগের অন্যতম কারণ। আসলে হৃদরোগ হচ্ছে স্মার্টরোগ! তথাকথিত স্মার্টনেসের এখনকার প্রতীক হচ্ছে স্মার্টফোন।

স্মার্টফোন এমন একটি জিনিস, যা মানুষকে আসক্ত করে তোলে। প্রতিমুহূর্ত ওটার দিকে তাকাতে বাধ্য করে। কিছুক্ষণ পর পরই সে স্ক্রিনের দিকে তাকায়। ফলে আসক্তি সৃষ্টি হয়। স্মার্টফোনকে বলতে পারি ডিজিটাল মাদক।

হৃদরোগের দুই নম্বর কারণ হচ্ছে ধূমপান। সিগারেট আর মাদক গ্রহণ করার মধ্যে মূলত কোনো তফাৎ নেই। গাঁজা হতে পারে, ইয়াবা হতে পারে, বিয়ার, এনার্জি ড্রিংকস, সফট ড্রিংকস গ্রহণ হতে পারে। তিন নম্বর কারণ হচ্ছে শারীরিক পরিশ্রম না করা। যেমন : আমরা আজকাল যে জায়গাটুকু হেঁটে যেতে পারি সেই জায়গায়ও গাড়িতে বসে হেলান দিয়ে যাই।

এই তিনটা কারণ যার জীবনে ঢুকবে তার জীবনে স্ট্রেস ঢুকবে, টেনশন ঢুকবে। নব্যধনিক সম্প্রদায়ের টেনশন সবচেয়ে বেশি। সবসময় চিন্তা—কীভাবে আরো কামাই করা যায়! হৃদরোগকে যে কারণে রাজরোগও বলা হয়। আমি কী ভুল বললাম? নকল রাজার রোগ হচ্ছে হৃদরোগ। কারণ নতুন টাকা হলে কীভাবে খরচ করবে তারা এটার দিশা পায় না। আসল রাজা, আসল ধনিক যারা, যারা অনেক দিন ধরে ধনসম্পদের ব্যবহার করে আসছেন, তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরিমাণ কম।

বরিশালে একটা উপমা আছে—মহিষাটাকি। মহিষাটাকি বোঝেন? বরিশালে মহিষ পালন করা হয় খালে-বিলে, বিশেষত চর এলাকায়। মহিষ কাদায় পা দিলে সেখানে একটা গর্ত হয়। গর্তে কিছু পানি জমে। ঐ গর্তের পানিতে যে ছোট মাছ জন্মায় এটাকে বলে মহিষাটাকি। এই ছোট মাছটাকে যদি আপনি পুকুরে ফেলেন সে তখন দিশা পায় না! ইয়া আল্লাহ! কোথায় এলাম! কীভাবে সাঁতার কাটব! উপুড় হয়ে, না চিৎ হয়ে! নব্যধনীদের অবস্থা হচ্ছে সে-রকম এবং এরাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয় সবচেয়ে বেশি। কারণ জীবনে ব্যালেন্সটা অর্থাৎ জীবনাচারে যে মধ্যপন্থা, এই মধ্যপন্থাটা তাদের জীবনে থাকে না। যার নতুন টাকা হয় সে কিন্তু সবসময় অভাবের মধ্যে থাকে। তার টাকাটা কখন নষ্ট হয়ে যায়, টাকাটা নিয়ে কী করবে এই চিন্তায় সে থাকে। তারা নিজেরা ঘরে রান্না করে না। তারা কী করে? ফুডপান্ডায় অর্ডার করে দেয়। জাতে উঠতে গিয়ে, রাজরোগ—হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।

আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখবেন, বহু খাবার কোম্পানির মালিকের শেয়ার আছে ওষুধ কোম্পানিতে। আগে খাইয়ে আপনাকে অসুস্থ বানায়, তারপরে হাসপাতালে নেয়। অর্থাৎ খাইয়েও আপনার কাছ থেকে টাকা নিল, বাকি যা টাকা ছিল সেটাও ক্লিনিকওয়ালারা নিয়ে গেল। এটা একটা দুষ্টচক্র। খাবার,

ওষুধ, ক্লিনিক—তিন জায়গাতে তাদের বিনিয়োগ রয়েছে। এরা মোটামুটি একই গ্রুপ, একই লোক, একই বিনিয়োগকারী। আর সাধারণ মানুষ এই বেনিয়াদের শিকার। এরা যেভাবে আপনাকে চালাতে চায়, যেভাবে আপনাকে দিয়ে ব্যবসা করতে চায় সেভাবেই করে।

এ-ছাড়া ক্যান্সার, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ অর্থাৎ যত ঘাতক ব্যাধি আছে, এর মূল উৎস হচ্ছে টেনশন এবং অসুস্থ জীবনাচার। এই রোগগুলো থেকে বাঁচতে হলে আমাদের করণীয়টা কিন্তু খুব সহজ। যদি এখন থেকেই করণীয়গুলো অনুসরণ করেন, ইনশাআল্লাহ আপনি ৭০-৮০ বছর বয়স পর্যন্ত স্লিম থাকতে পারবেন। অতিরিক্ত ওজন যদি না হয়, চর্বি যদি না হয়, হৃদরোগ-ডায়াবেটিস থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন। মৃত্যু থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, মারা সবাই যাবেন। কিন্তু আপনি সুস্থ অবস্থায় মারা যাবেন। কাজ করতে করতে মারা যাবেন। হাসতে হাসতে মারা যাবেন। মৃত্যুর সময় বলতে পারবেন যে, 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান।' আনন্দময় মৃত্যু হবে আপনার।

হাসপাতালে গিয়ে লাইফ সাপোর্টে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। আপনি অনেক সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। তাই স্ট্রেস, টেনশন দূরের জন্যে কী করতে হবে?

এক, নিয়মিত মেডিটেশন। দুই, ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি লালন। সবসময় সকালটা শুরু করবেন হাসি দিয়ে এবং 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলেন, হরি ওম, থ্যাংকস গড বা প্রভু! তোমাকে ধন্যবাদ—যেভাবে বলেন সেভাবে প্রভুকে ধন্যবাদ দেবেন।

তিন, সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ। প্রো-একটিভ মানে কী? নিজের কল্যাণ, অন্যের কল্যাণ। নিজের উপকার, অন্যের উপকার। নিজের ক্ষতি থেকে বিরত থাকা, অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা। এটা হচ্ছে প্রো-একটিভ বা ইতিবাচক থাকা এবং এটাই হচ্ছে শোকরগোজারি। অর্থাৎ স্রষ্টা যা করতে বলেছেন সেটা করবেন আনন্দিত চিত্তে, যা বর্জন করতে বলেছেন সেটাও বর্জন করবেন আনন্দিত চিত্তে।

সুস্থ জীবনাচারের জন্যে খাবার খুব গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত তেল-চর্বি বর্জন করতে হবে। আমরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত। আমরা কিন্তু নব্যধনীর পাল্লায় নাই। কিন্তু অনেক সময় আমরা ঋণ করে ঘি খেতে চাই। সামর্থ্য নাই কিন্তু ফুডপান্ডায় অর্ডার দিচ্ছি। দুদিন পর দেখা গেল যে, চিড়া-মুড়ি বা শুকনা রুটি খেয়ে আছি। কারণ আপনি যখন অতিরিক্ত খরচ করে ফেলবেন, তখন বাকিটা তো আপনাকে সামাল দিতে হবে। আমরা

এখানে যারা আছি, আমরা মোটামুটি সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করছি। আমাদের মধ্যে হৃদরোগের সম্ভাবনা কম। কিন্তু আমরা যেন নব্যধনীদের দেখাদেখি ভুল না করে ফেলি। অতএব কী করবেন?

রান্নায় যে তেল ব্যবহার করেন, তেলের পরিমাণটা আজ থেকে ২০ শতাংশ কমিয়ে দেবেন। আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি ২০ শতাংশ কমে গেল। চিনি, চিনিজাত মিষ্টি যদি পুরোপুরি বর্জন করতে পারেন, তাহলে হৃদরোগের ঝুঁকি আরো ৩০ শতাংশ কমে গেল। যদি ৫০ শতাংশ বর্জন করতে পারেন, তাহলে ১৫ শতাংশ কমে গেল। অর্থাৎ তেল এবং চিনি যত কমাবেন, হৃদরোগের ঝুঁকি তত কমতে থাকবে।

মাখনযুক্ত পেস্ট্রি বা কেক অর্থাৎ অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার বর্জন করবেন। ফাস্ট ফুড যিনি খাবেন তার হৃদরোগের ঝুঁকি ৫০ শতাংশ বেড়ে গেল। চর্বি খাবেন না তা না, চর্বি খাবেন। আমিও চর্বি খাই। সেটার উৎস কী? বাদাম। এটারও গল্প আছে। একবার এক মাড়োয়ারির দোকানে গিয়েছি। মাড়োয়ারি যথেষ্ট বিত্তবান। তিনি গদিতে বসে আছেন। আমাকে একেবারে পাশে নিয়ে বসিয়েছেন। তখন আমি এস্ট্রলজার। জানেন তো এস্ট্রলজারদের খাতিরদারি বেশি হয়। অনেকের ধারণা, যদি এস্ট্রলজারকে ভালোভাবে খাওয়ানো হয়, ভাগ্যটা ভালো হয়ে যাবে। আসলে এস্ট্রলজারের কিছুই করার ক্ষমতা নাই। সে শুধু বুঝতে পারে কী হতে পারে, না হতে পারে। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। উনি বললেন, বাদামকা শরবত লাও। আমি ভাবছি যে, বাদামের শরবত কী না কী। বসে আছি। কিছুক্ষণ পরে বাদামের শরবত এলো। পানির মধ্যে বাদাম বাটা। খেয়েছেন কেউ? খাবেন, ভেরি টেস্টি।

ধরুন, পেস্তা বাদামের শরবত একরকম হয়, কাজু বাদামের শরবত আরেকরকম, চিলগোজা বা কাঠবাদামের শরবত আরেকরকম। প্রথমে বাদাম গ্রাইন্ডারে পেস্ট করবেন। পেস্ট-এ পানি মেশাবেন। একগ্লাস বানিয়ে ফেলবেন এবং চুমুকে চুমুকে দেখবেন যে, আলাদা আনন্দ। তবে আপনাদের শরবত বানিয়ে খেতে হবে না। কারণ শরবত একবার খেলে আপনি আর চিবিয়ে খেতে চাইবেন না। যত ধরনের বাদাম আছে চিবিয়ে খাবেন।

ওমেগা থ্রি, ফ্যাটি এসিডসমৃদ্ধ উপকারী চর্বিজাতীয় খাবার গ্রহণ করবেন। সব ধরনের সামুদ্রিক মাছ খাবেন। সামুদ্রিক মাছে ফ্যাটি এসিড, ওমেগা থ্রি, ওমেগা সিক্স, ওমেগা নাইন বেশি পরিমাণে থাকে। যার ফলে সমুদ্রপাড়ের মানুষ, যারা সমুদ্রের মাছ খায়, তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম।

যবের ছাতু। জাস্ট পানিতে দিলেই শরবত হয়ে গেল। ছাতুর শরবত খুব ভালো পানীয়।

তারপরে ভুট্টা, লাল আটা খাবেন। সাদা আটা না, গমের খোসাসহ যেটা ভাঙানো হয়। আঁশজাতীয় খাবার, শাকসবজি, ফলমূল খাবেন। সালাদ খাবেন প্রচুর পরিমাণে। অর্থাৎ কাঁচা যা পাওয়া যায় সেটা খাবেন। সেই সাথে কী খাবেন? মরিঙ্গা।

আমাদের লন্ডন শাখার আহ্বায়ক। প্যাকেট করে মরিঙ্গা পাঠালেন। গুরুজী, এই হচ্ছে মরিঙ্গা। এটার বীজ পাঠালাম। এখানে এত পাউন্ড এটার দাম। আমি দেখলাম যে, আমাদের টাকাতে এক হাজার টাকা!

আমাদের এক সহকর্মীকে বললাম, এটা মরিঙ্গা। এমন জায়গায় বীজ রাখবেন যাতে কেউ আবার তুলে নিয়ে না যায়। মরিঙ্গা গাছ হলো। কিছুদিন পরে পাতা গজালো। আমাদের সহকর্মীর কৌতূহল হলো। সজনে পাতা নিয়ে ঐ পাতার সাথে মেলালেন। এসে বললেন, গুরুজী! এ তো সজনে পাতা। আমি তো আপনার কথা শুনে ভেবেছি যে, ইয়া আল্লাহ! লন্ডন থেকে এসেছে। কী জানি!

এই সজনে পাতা খাবেন। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস-এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। কারণ আয়ুর্বেদের সূত্র অনুসারে সজনে গাছের শুধু পাতা না, ছাল-বাকল, কাণ্ড, ডাটা—সবই পুষ্টিগুণে ভরপুর। ৩০০ ধরনের রোগের প্রতিষেধক এই সজনে গাছের মধ্যে রয়েছে। এজন্যে সজনেকে বলা হয় পুষ্টির ডিনামাইট। অর্থাৎ একেবারে পুষ্টির বিস্ফোরক হচ্ছে সজনে। সজনে পাতার সমপরিমাণ ওজনের কমলাতে যে পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে তার চেয়ে সজনে পাতায় ভিটামিন সি-এর পরিমাণ সাত গুণ বেশি, চার গুণ ক্যালসিয়াম ও দুই গুণ আমিষ বেশি। গাজরের চেয়ে চার গুণ ভিটামিন এ এবং কলার চেয়ে তিন গুণ বেশি পটাশিয়াম রয়েছে সজনে পাতায়। এ-ছাড়া ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন তো রয়েছেই। সজনে পাতা একটু টেলে বেটে ভর্তা করে নিতে পারেন। আরো ভালো হয় সজনে পাতা ভালো করে ধুয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন। প্রথমদিকে অত ভালো লাগবে না, তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে। দেখবেন যে, সজনে পাতা চিবাতে গিয়ে খুব ভালো লাগছে।

শীতকাল আসছে। ফলমূল, শাকসবজি বেশি পরিমাণে খাবেন। আর আমরা কী বলেছিলাম? পরবর্তী রান্না থেকেই ২০ ভাগ তেল কমিয়ে দেবেন এবং চিনি বর্জন করবেন। ধূমপান বর্জন করবেন। আসলে মাদক যদি হারাম হয়, তাহলে ধূমপান যেহেতু ক্ষতিকর এবং আসক্তিকর, ধূমপানও হারাম।

যখনই ধূমপান করছেন আপনি কবিরা গুনাহ্ করছেন।

যদি একবার সিগারেটে টান দেন, আয়ু থেকে দুই মিনিট সময় কমে গেল। এখানে কেউ সিগারেট খান বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু যদি কেউ খান, হিসাব করবেন যে, আজকে সারাদিনে কয়টা সিগারেট খেলাম এবং কয়বার টান দিলাম। প্রত্যেক টানের জন্যে দুই মিনিট করে আয়ু কমাতে থাকেন। কত বছর ধরে সিগারেট খাচ্ছেন সেটা হিসাব করবেন। তারপর তত গুণ দুই মিনিট বাদ দেন। তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনার আয়ু থেকে কত বছর বাদ হয়ে গেছে। হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস-এ আক্রান্ত হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে খাবার, ধূমপান, ডিজিটাল আসক্তি মূল কারণ।

ডিজিটাল আসক্তি থেকে মুক্ত হবেন কীভাবে? স্মার্টফোন প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন, যখন প্রয়োজন নেই ব্যবহার করবেন না এবং রাত ১১টা থেকে ভোর পর্যন্ত একদম অফ। স্মার্টফোন কখনো শোয়ার ঘরে রাখবেন না। কারণ স্মার্টফোনে যদি কেউ স্পাইওয়্যার দেয়, অফ করে রাখলেও আপনি যা-ই বলছেন স্মার্টফোন তা রেকর্ড করতে পারে। যে মুহূর্তে অন করলেন, ইন্টারনেটের সাথে যোগ হয়ে গেল, আপনার সব তথ্য তার কাছে চলে গেল।

তিনটা পয়েন্ট ফলো করতে হবে—নিয়মিত মেডিটেশন, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুস্থ জীবনাচার। জীবনাচার ঠিক করতে আমরা কী করব? বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, সবসময় শোকরগোজার থাকতে হবে এবং যখন পারেন, যতক্ষণ পারেন দাঁড়িয়ে থাকবেন, হাঁটবেন। বিছানায় যত কম শোবেন তত ভালো। অর্থাৎ শরীরটাকে ব্যস্ত রাখতে হবে। শরীরটাকে যত কাজ দেবেন তত আপনি সুস্থ থাকবেন।

আলোচনার পয়েন্টগুলো যিনি যতটা গ্রহণ করবেন তিনি ততটা সুস্থ থাকবেন, তিনি ততটা ভালো থাকবেন। ইনশাআল্লাহ শুধু হৃদরোগ না, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস—এই তিনটা রোগকে প্রতিহত করতে আমরা সক্ষম হবো। আমাদের প্রত্যেকের জীবন সুন্দর হোক, সফল হোক।

সংক্ষিপ্ত : ৭ অক্টোবর ২০২২, কোয়ান্টামম

নবীপ্রেম বদলে দিক আপনার জীবন

মাহে রমজান আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির জন্যে আত্মিক কার্যক্রমে অংশ নেয়ার সুযোগ এনে দেয়। গত রমজানের ন্যায় এই রমজানেও আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টায় আরো বেশি সময় দেয়ার সুযোগ পরম করুণাময় আমাদেরকে করে দিয়েছেন।

কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, খতমে কোরআন কোয়ান্টায়নে অর্থাৎ মৌনতার মাঝে করতে হবে কেন? আসলে মৌন থাকা কোরআনেরই নির্দেশ। সূরা আরাফ-এর ২০৪ নম্বর আয়াত হচ্ছে, 'যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন মৌন থাকো ও মনোযোগ দিয়ে শোনো। যাতে তোমরাও রহমত পেতে পারো।'

কোরআন থেকে রহমত জ্ঞান শেফা বা রোগমুক্তি এবং কল্যাণ পাওয়ার জন্যে মৌন থাকা এবং মনোযোগ দিয়ে শোনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে যখনই কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, এর মর্মবাণী পাঠ করা হয়, তখন যত দূর সম্ভব মৌনতা অবলম্বন করুন। যখন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, মৌন থাকবেন এবং মনপ্রাণ ঢেলে দেবেন, তখন নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রহমতের ছায়ায় থাকবেন।

আমরা যদি গভীরভাবে দেখি, কোরআনের ব্যবহারিক এবং ফলিত রূপই হচ্ছে রসুলুল্লাহর (স) জীবন এবং তাঁর বাণী। আসলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুহাদ্দিসদের দ্বারা সংরক্ষিত ও সঞ্চারিত হয়েই নবীজীর (স) বাণী আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে হাদীস হিসেবে।

হাদীস যত পড়বেন, সিরাত যত জানবেন, তত আপনার হৃদয় নবীপ্রেমে আপ্লুত হবে। কারণ আপনি তখন বুঝতে পারবেন এত মানবিক, এত সমমর্মী, এত সুবিচারক, এত দয়ালু, এত আপন কেউ পৃথিবীতে দ্বিতীয় জন আর আসেন নি। তখন আপনি অনুভব করবেন তাঁর বাণী, তাঁর জীবনাচার সেকালের ন্যায় একালেও একইভাবে প্রযোজ্য, একইভাবে অনুসরণীয়।

চারপাশের হিংসা-বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার দিকে যত তাকাবেন তত অনুভব করবেন, আল্লাহর রসুলের (স) দিক-নির্দেশনা, তাঁর সুন্নতকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই একালের মানুষ শান্তি পেতে পারে, পরিত্রাণ পেতে পারে, মুক্তি পেতে পারে সমস্ত বালা-মুসিবত হিংসা সহিংসতা থেকে।

*হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী*র উদ্বোধনী হাদীসই বলে দেয় নবীজী (স) কেমন ছিলেন! তিনি বলেছেন, 'তোমার মনে কখনো কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অমঙ্গল চিন্তা থাকবে না—এটাই আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, জান্নাতে সে আমার সাথে থাকবে।' *[আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী]*

হিংসা বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতায় নিমজ্জিত মানুষের মুক্তির জন্যে এর চেয়ে ভালো বাণী আর কী হতে পারে! আসলে তিনি শুধু বাণী দিয়ে যান নি, সেই বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে যা যা করতে হবে, তিনি নিজে তা করেছেন এবং সেভাবেই দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

জীবনদৃষ্টি অধ্যায়ের সূচনার হাদীসটিই হচ্ছে, নবীজী (স) বলেন, 'প্রতিটি কাজ তুমি সবচেয়ে ভালোভাবে করবে—এটাই আল্লাহর নির্দেশ।' *[শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা); মুসলিম, তিরমিজী]*

নবীজী (স) আল্লাহর এই নির্দেশ শুধু মানুষকে জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি তাঁর নিজের জীবনে প্রতিটি কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, ধর্মীয় জীবন, সবক্ষেত্রেই তিনি প্রতিটি কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করা অর্থাৎ এহসানের গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা পালন করেছেন। তাঁর সাহাবীরাও সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং সেজন্যেই তারা এক আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা নির্মাণ করতে পেরেছিলেন।

নবীজীর (স) প্রতিটি নির্দেশ সাহাবীরা কত আন্তরিকভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন, সাহাবীদের জীবনে তার প্রতিফলন আমরা দেখি। শুধু প্রথম সারির নয়, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ সারির সাহাবীরাও একইভাবে আন্তরিক ছিলেন তাদের অঙ্গীকার রক্ষায়, ওয়াদা পালনে। সাহাবী জারির ইবনে

আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'আমি নবীজীর (স) কাছে বায়াত (অলঙ্ঘনীয় শপথ) করি নামাজ কায়েম, যাকাত আদায় এবং প্রত্যেক মুসলমানের সাথে সদাচরণের।' *[বোখারী, মুসলিম]*

জারির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) জীবনের একটি ঘটনা ইমাম তাবারানী উল্লেখ করেছেন। একবার জারির (রা) তার এক কর্মচারীকে একটি ঘোড়া কিনতে পাঠান। কর্মচারী ৩০০ দিরহাম মূল্যে একটি ঘোড়া কেনেন এবং ঘোড়ার মালিককে সাথে নিয়ে আসেন, যাতে জারির (রা) তাকে মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। জারির (রা) ঘোড়াটাকে ভালোভাবে দেখলেন। বিক্রেতাকে বললেন, এই ঘোড়ার দাম তো ৩০০ দিরহামের বেশি। তুমি কি এটা ৪০০ দিরহামে আমার কাছে বিক্রি করবে? বিক্রেতা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার ইচ্ছা!

জারির (রা) আবারো ঘোড়াটাকে দেখলেন। বললেন, না, এটা খুবই ভালো ঘোড়া। এর মূল্য ৮০০ দিরহাম হওয়া উচিত। বিক্রেতার এই ব্যাপারে কোনো বক্তব্য ছিল না। সে ৩০০ থেকে শুরু করে যে-কোনো মূল্যেই বিক্রি করতে রাজি ছিলেন, কিন্তু জারির (রা) তাকে ৮০০ দিরহাম দিলেন।

যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি এটা কেন করলেন? তখন জারির (রা) উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহর রসুলের (স) কাছে বায়াত করেছিলাম যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানের সাথে সদাচরণ করব। অর্থাৎ আন্তরিক সুবিচার করব। আমার আন্তরিক সুবিচারই বলল, এই ঘোড়ার মূল্য ৮০০ দিরহাম। ৩০০ দিরহাম দিলে তাকে ঠকানো হবে। তাই আমি তাকে ৮০০ দিরহামই দিলাম।

এই ঘটনা থেকে আমরা খুব স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, সাহাবীরা প্রত্যেককে তার প্রাপ্য প্রদানের ব্যাপারে কতটা আন্তরিক ও সচেতন ছিলেন।

*হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী*র ৪৩ নম্বর হাদীস—জাবির ইবনে সুলাইম (রা) একদিন রসুলুল্লাহর (স) সাথে দেখা করতে এলেন। জাবির (রা) অনুরোধ করলেন, 'ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাকে উপদেশ দিন।' নবীজী (স) তখন তাকে বললেন, 'কাউকে কখনো গালিগালাজ বকাবকি করবে না। ভালো কোনো কাজকেই ছোট মনে করবে না। অহংকারের প্রকাশ ঘটে এমন কিছু করবে না।' জাবির (রা) বলেন, 'এরপর আমি কখনো কোনো মানুষ বা পশুকে গালিগালাজ বা বকাবকি করি নি।' *[আবু দাউদ, তিরমিজী]*

এই হচ্ছে নবীপ্রেম! এবারের রমজানে আমরা প্রত্যেকে নিজের জন্যে প্রার্থনা করি—আমাদের অন্তরে নবীপ্রেম জাগ্রত হোক! শুধু বাহ্যিক লেবাস

পরিবর্তন হলেই, লোক-দেখানো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় মেতে থাকলেই নবীপ্রেম জাগ্রত হয় না। সত্যিকারের নবীপ্রেম হচ্ছে তাঁর সুন্নতকে, তাঁর নির্দেশকে নিজের জীবনে অনুসরণ করা।

আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আমার মনে কখনো কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অমঙ্গল চিন্তা থাকবে না। প্রতিটি কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করব এবং প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকারকে নিশ্চিত করব। কাউকে কখনো গালিগালাজ, বকাবকি করব না। ভালো কোনো কাজকেই ছোট মনে করব না। অহংকারের প্রকাশ ঘটে এমন কিছু করব না।

রমজানের প্রতিটি দিন এই প্রত্যয় জোরদার হতে থাকুক। ধীরে ধীরে এই প্রত্যয় আপনার কর্মে রূপান্তরিত হোক। হিংসা বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার বিনাশ ঘটুক নবীপ্রেমের প্লাবনে।

১৬ এপ্রিল ২০২১, ঢাকা

গভীর ধ্যান ॥
কোরআন অনুধাবনের পথ

পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি আমাদেরকে হেদায়েতের পথ, সাফল্যের সরলপথ দেখিয়েছেন বলেই আমরা কোরআন অনুধাবন ও আত্মস্থ করার জন্যে সঠিক পথে পা বাড়াতে পেরেছি।

কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা যেমন ফরজ একইভাবে এই জ্ঞান অনুশীলন করার চেষ্টা করাও ফরজ। আপনি ততটাই অনুসরণ করতে পারবেন যতটা আপনি চেষ্টা করবেন, যতটা আপনি একাত্ম হতে পারবেন। যত আপনি এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কোরআন অনুসরণ করার মধ্যেই আমার কল্যাণ, আমার মঙ্গল, আমার ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য, তত আপনি ভেতর থেকে উদ্বুদ্ধ হবেন। কোরআন তত আপনার গভীরে প্রবেশ করবে, কোরআনের দিক-নির্দেশনা অনুসরণের আগ্রহ অনুভব করবেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

তখনই আপনি কোরআনের গভীরে প্রবেশ করতে পারবেন যখন আপনি আত্মনিমগ্ন হবেন। এই আত্মনিমগ্ন হওয়ার পথই হচ্ছে ধ্যানের পথ। এজন্যে পৃথিবীতে যত ধর্ম এসেছে, প্রতিটি ধর্মই ধ্যানকে আত্ম উপলব্ধি, আত্মনিমগ্নতার পথ হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছে।

পবিত্র কোরআনে গভীর ধ্যান বোঝাতে তাদাব্বুর এবং তাফাক্কুর—দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা সাদ-এর ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আমি তোমার ওপর এই কল্যাণময় কিতাব নাজিল করেছি, যাতে

মানুষ এই কোরআনের বাণী নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়! (সেইসাথে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে) এর শিক্ষা অনুসরণ করে।'

সূরা সাবা-র ৪৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, '(হে নবী! ওদের) বলো, আমি তোমাদের একটিমাত্র পরামর্শ দিচ্ছি, এককভাবে বা যৌথভাবে আল্লাহর সামনে সচেতন হয়ে দাঁড়াও। নিজের গভীরে ধ্যানে নিমগ্ন হও। (তাহলেই উপলব্ধি করতে পারবে) ...।'

আসলে ধ্যানের পথ আত্মনিমগ্নতার পথ। এজন্যেই আধুনিক কালের খুব বড় একজন ফকিহ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী ধ্যানকে উচ্চস্তরের ইবাদত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ধ্যানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ধ্যান হচ্ছে আকারহীন ইবাদত। যা স্থান বা কাল, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য, কোনোকিছু দিয়েই বাধাগ্রস্ত করা যায় না।

আরেকজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ অধ্যাপক মালিক বাদরি তার Contemplation : An Islamic Psychospiritual Study বইতে লিখেছেন, 'একজন বিশ্বাসী নিজেকে নিয়ে, স্রষ্টার সৃষ্টিরহস্য নিয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হলে আল্লাহর রহমতে অন্য ধ্যানীদের চেয়ে উচ্চতর উপলব্ধিতে উপনীত হবেন।'

ধ্যান উচ্চস্তরের ইবাদত বলেই নবীজী (স) বলেন, 'একঘণ্টার ধ্যান ৭০ বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।' *[আবু হুরায়রা (রা); ইবনে হিব্বান]*

ধ্যান এবং মৌনতা একজন মানুষকে যথার্থ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার পথে নিয়ে যেতে পারে। এজন্যেই নবীজী (স) বলেছেন, 'মৌনতা প্রজ্ঞার পথ।' *[আনাস ইবনে মালেক (রা); বায়হাকি (আশকালানী)]*

মৌনতাকে তিনি অত্যন্ত ওজনদার আমল হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

ইমাম গাজ্জালি (র) তার *এহিয়া উলমুদ্দিন* বইয়ে হেকিম লোকমানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছেন যে, 'হেকিম লোকমান মাঝে মাঝেই সবার থেকে আলাদা হয়ে মৌনতা ও ধ্যানের মাঝে ডুবে যেতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি প্রায়শই একা মৌন থাকেন। মানুষজনের সাথে মেলামেশা করে তাদের সাথে কথা বলা আপনার জন্যে কি আরো কল্যাণকর হতো না? লোকমান জবাবে বলেছিলেন, দীর্ঘসময় একা মৌন থাকা গভীর ধ্যানের জন্যে অত্যন্ত সহায়ক। আর দীর্ঘসময় যদি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা যায়, তা মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়।'

হেকিম লোকমান নবী ছিলেন না। কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন। ক্রীতদাস ছিলেন। লোকমান হেকিমের বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে তার মনিব তাকে আজাদ করে

দেন। প্রচলিত আছে যে, আল্লাহ তাকে নবুয়ত এবং প্রজ্ঞার মাঝে যে-কোনো একটি বেছে নেয়ার প্রস্তাব দেন। হেকিম লোকমান প্রজ্ঞা বেছে নেন এবং তিনি প্রজ্ঞায় অভিষিক্ত হন। নবী না হওয়া সত্ত্বেও কোরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে তার নামে। এ থেকেই বোঝা যায় পরম করুণাময়ের কাছে তার মর্যাদা কত উঁচুতে! দীর্ঘ মৌনতা, দীর্ঘ ধ্যানের পথ ধরেই তিনি এত উঁচু মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন।

দীর্ঘসময় মৌনতা পালন করা ধর্মপরায়ণতার জন্যে কত গুরুত্বপূর্ণ, এটাও আমরা নবীজীর (স) আরেকটি হাদীস থেকে খুব পরিষ্কার বুঝতে পারি। আবু যর গিফারী (রা) বর্ণিত *বায়হাকি শরীফের* হাদীস, ‘দীর্ঘ মৌনতা পালন করো। দীর্ঘ মৌনতা শয়তানকে তোমার কাছ থেকে দূরে তাড়িয়ে দেয় এবং তোমার ধর্মপরায়ণতা জোরদার করে।’

ধ্যানের গুরুত্ব সম্পর্কে নবীজীর (স) একটি মন্তব্য দেখে চমকিত হলাম। আল্লামা উসমান নুরী তার Contemplation in Islam বইয়ে *বায়হাকি*র উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, আল্লাহর রসুল (স) বলেছেন, ‘There is no worship like contemplation.’ অর্থাৎ ‘গভীর ধ্যানের তুল্য কোনো ইবাদত নেই।’ আপনি যখন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হবেন, তখন আপনি অস্তিত্বের সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে পৌঁছে যেতে পারবেন যেখানে প্রজ্ঞার নিবাস। যে স্তরে স্রষ্টার কাছ থেকে সরাসরি বাণী লাভ করা যায়। এজন্যেই হয়তো আল্লাহর রসুল (স) বলেছেন, গভীর ধ্যানের তুল্য কোনো ইবাদত নেই।

পরম করুণাময়—সমস্ত জ্ঞানের যিনি উৎস, সমস্ত প্রজ্ঞার যিনি উৎস, সমস্ত শক্তি নিরাময় কল্যাণের যিনি উৎস, তাঁর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এবারের রমজানে সাত দিন দীর্ঘসময় মৌন থেকে তাঁর কালাম শোনা এবং সেই ভাবনার মধ্যে নিমগ্ন থাকার সুযোগ তিনি আমাদের দিয়েছেন। যারা পুরো সময়টা নিমগ্ন থাকতে পেরেছেন তারা নিঃসন্দেহে অনেক লাভবান। রহমতের ছায়ার মাঝে, ধ্যানের মাঝে, মৌনতার মাঝে যতটুকু সময় থাকা যায়, ততটুকু কল্যাণই আপনি পাবেন।

নবীজী (স) সকল সৃষ্টির জন্যে করুণা হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। অহিংসা সমমর্মিতার সার্থক রূপকার ছিলেন তিনি। তিনি বলেছেন, ‘তোমার মনে কখনো কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অমঙ্গল চিন্তা থাকবে না—এটাই আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, জান্নাতে সে আমার সাথে থাকবে।’ *[আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী]*

অর্থাৎ যিনিই নবীজীর (স) সুন্নতের যথার্থ অনুসারী হবেন, তিনি সমমর্মিতার প্রতীক হবেন। হিংসা-বিদ্বেষের প্রকাশ তার জীবনে ঘটবে না।

নবীজী (স) তাঁর জীবনে কখনো কাউকে ঠকান নি। কারো অধিকারকে লঙ্ঘন করেন নি। কারো ওপর অন্যায় করেন নি। সবার সাথেই সদাচরণ করেছেন। প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দিয়েছেন। প্রত্যেকের সাথে সুবিচার করেছেন। কাউকে কখনো গালিগালাজ বকাবকি করেন নি। ভালো কোনো কাজকে কখনোই ছোট মনে করেন নি। অহংকারের প্রকাশ ঘটে এমন কিছুই করেন নি। নবীজীর (স) সাহাবীরা তার এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিজেদের জীবনে লালন করার চেষ্টা করেছেন। নবীজীকে (স) অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে তারাও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাদের নামও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

এবারের রমজানে আল্লাহর মহিমা উপলব্ধি করার পাশাপাশি আমরাও লক্ষ্য স্থির করেছি—নবীপ্রেমে অন্তর প্লাবিত হোক! যত নবীপ্রেমে নিজেকে আপ্লুত করতে পারব, তত অহিংসা ও সমমর্মিতায় আমাদের হৃদয় সিক্ত হবে। পরম করুণাময় আমাদের কবুল করুক।

২৩ এপ্রিল ২০২১, ঢাকা

নামাজ হোক আপনার মেরাজ

আজ পবিত্র জুমাতুল বিদা। রোজাদারদের জন্যে জুমাতুল বিদা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নবীজী (স) বলেছেন, 'সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুমআর দিন হচ্ছে সর্বোত্তম। জুমআর দিন বেশি বেশি দরুদ পড়ো।' *[আউস ইবনে আউস (রা); আবু দাউদ]*

তিনি বলেছেন, 'গোসল করে তোমরা জুমআর নামাজ পড়তে যাও। জুমআর নামাজকে অবহেলা করবে না। যারা অবহেলা করবে তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' *[আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); মুসলিম]*

রোজাদারদের জন্যে জুমাতুল বিদা হচ্ছে রমজানের শ্রেষ্ঠ জুমআ। জুমাতুল বিদার মধ্য দিয়েই রমজান মাসের সমাপ্তির সূচনা হয়। বুদ্ধিমান ইবাদতকারীরা এই দিনে পুরো রমজানের ইবাদত ও সৎকর্মের হিসাবনিকাশ করেন। ইবাদত ও সৎকর্মে কোনো ঘাটতি থাকলে এই ঘাটতি বা অবহেলা পূরণের জন্যে অবশিষ্ট দিনগুলোতে তারা কাজ করার সুযোগ পান।

জুমআর নামাজ স্বাভাবিকভাবেই জামে মসজিদে পড়া হয়। যখন মসজিদে যাবেন, তখন কী করতে হবে সেটাও নবীজী (স) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'নামাজের জন্যে সারিবদ্ধ হও। কাঁধের সাথে কাঁধ মেলাও। দুজনের মধ্যে যেন কোনো দূরত্ব না থাকে। যখন কেউ কাঁধের সাথে কাঁধ লাগিয়ে সারি ঠিক করে দাঁড়ায়, আল্লাহ তাকে (রহমতের সাথে) সংযুক্ত রাখেন। আর যে ব্যক্তি সারি থেকে বিযুক্ত হয়, আল্লাহ তাকে (রহমত থেকে) বিযুক্ত করেন।' *[আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); আবু দাউদ]*

স্বাভাবিক সাধারণ পরিবেশে এটি নবীজীর (স) সুস্পষ্ট নির্দেশনা। তিনি

বলেছেন, 'নামাজের জন্যে মসজিদে আগে এলে সামনের কাতারে দাঁড়াও। যারা পরে আসবে, পরের কাতারে দাঁড়াবে। আগে এসে পেছনে বসার অভ্যাস সৃষ্টি কোরো না। যদি কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী আগে এসে পেছনে বসতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাদেরকে পেছনেই ফেলে রাখেন।' *[মুসলিম]*

অতএব নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে, বিশেষত জুমআর নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ে প্রত্যেক নামাজীর সতর্ক থাকা উচিত। জুমআর নামাজে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা তখন আসবে, যখন আপনি আপনার জীবনে নামাজের গুরুত্বকে অনুধাবন করতে পারবেন। কেন নামাজ আপনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ? নবীজী (স) খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'নামাজ হচ্ছে বিশ্বাসীর সাথে শরিককারী ও সত্য অস্বীকারকারীর মধ্যে বিভাজন রেখা।' *[জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); মুসলিম]*

তিনি বলেছেন, 'যে নামাজ ত্যাগ করল সে কুফরী করল।' *[বুরাইদা (রা); তিরমিজী]*

নবীজী (স) আরো বলেছেন, 'দেহ-মনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, একাগ্রচিত্তের নামাজ এবং ধৈর্যের সাথে আল্লাহর ইবাদত—আল্লাহর পথে জেহাদ করার মতোই সওয়াবের কাজ।' *[আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম]*

নামাজের গুরুত্ব কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে নানানভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনকাবুত-এর ৪৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে নবী! তোমার ওপর নাজিলকৃত কিতাবের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দাও। নামাজ কায়েম করো। মনে রেখো, নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণ (জিকির) সবচেয়ে ভালো কাজ। তোমাদের সকল কাজ সম্পর্কেই আল্লাহ জানেন।'

আমরা যদি আজ এই জুমাতুল বিদার দিনে একটু চিন্তা করি যে, নামাজ কি আমাদেরকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করছে? যদি আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি যে, আমরা এত নামাজী, মসজিদ উপচে পড়ে, জুমআর দিন বহু জায়গায় রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায় নামাজীর ভিড়ে; তারপরও চারপাশে এত অন্যায়, এত অশ্লীলতা কেন? এত অস্থিরতা, এত অসহিষ্ণুতা, এত হিংসা, এত বিদ্বেষ কেন?

একজন ইন্টারনেট ব্যবসায়ী লিখেছেন, 'আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমাদের ইন্টারনেট ব্যবসার পরিধি গ্রামে গ্রামে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। আমাদের দেশের ৮০ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয় বিনোদনের

জন্যে। এই ৮০ শতাংশের মধ্যে অন্তত ৬০ শতাংশ ব্যবহার হওয়ার পরিবর্তে অপব্যবহার হচ্ছে পর্নোগ্রাফিতে! টেলিকম কোম্পানিগুলো ৪২০ টাকার ইন্টারনেট ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রি করছে। গ্রামের বয়স্ক মানুষরা বুঝতে পারছে, কিন্তু তরুণদের থামাতে পারছে না।'

আসলে ব্যবহৃত ইন্টারনেটের ৮০ শতাংশ যদি বিনোদনে ব্যয় হয় আর এই ৮০ শতাংশের মধ্যে ৬০ শতাংশ যদি অশ্লীলতার পেছনে, পর্নোগ্রাফির পেছনে ব্যয় হয়, তাহলে আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াচ্ছে? এই পরিসংখ্যান যদি সত্য হয়, আমাদের সমাজের জন্যে বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যারা নামাজ আদায় করেন, এই ৬০ শতাংশের মধ্যে তাদের কোনো অংশ নাই—একথা বলা কঠিন! অবশ্য ইন্টারনেটে বিভিন্ন সাইট ভিজিট করার পরে অনেকে সেটা ডিলিট করেন বা মুছে ফেলেন মেমোরি থেকে। কিন্তু পোস্টমর্টেম করলে তার পায়ের ছাপ ট্রেস করা যায় যে, তিনি ইন্টারনেট দিয়ে কী কী করেছেন, কী কী দেখেছেন, কোথায় কোথায় গিয়েছেন।

আমরা নামাজ পড়ছি, আবার অন্যায় ও অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। অর্থাৎ নামাজকে আমরা অনেকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে সুরক্ষা হিসেবে কাজে লাগাতে পারছি না। কারণটা কী? যদি একটু অনুসন্ধান করি, তাহলে প্রধানত দুটি কারণ শনাক্ত করতে পারি। প্রথম কারণটি হলো, নামাজের যে পার্টনার, তার প্রতি অবহেলা। নামাজের এই পার্টনার বা অংশীদার হচ্ছে যাকাত। হিজরি ৯ম শতকের বিশিষ্ট ইমাম, ইমাম আল আয়ান বলেছেন, 'যাকাত ছাড়া নামাজ নিষ্ফল।'

অধিকাংশ নামাজী নামাজকে যেভাবে গুরুত্ব দেন, যাকাতের গুরুত্বকে সেইভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। কোরআনে ইসলামের তিনটি স্তম্ভ—ঈমান বা বিশ্বাস, নামাজ ও যাকাতের কথা বার বার একসাথে বলা হয়েছে। নামাজ ও যাকাতের কথা কোরআনের ১৬টি সূরায় ২৮ বার একসাথে বলা হয়েছে। এজন্যে হিজরি ৮ম শতকের বিখ্যাত আলেম, ইমাম আল ইরাকী খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, 'যারা ঈমান নামাজ ও যাকাত—এই তিনটি স্তম্ভের আন্তরিক যত্ন নেবেন, তারা অন্য দুটি স্তম্ভ—রোজা ও হজ পালন করতে পারবেন অনায়াসে।'

আমরা অনেক নামাজী নামাজের সাথে সাথে যাকাতের গুরুত্বকে অনুধাবন করি না। যাকাত ঠিকভাবে আদায় না করলে নামাজ যে নিষ্ফল—এটাও আমরা বুঝি না।

আপনি যদি ইতিহাসের দিকে তাকান, নবীজীর (স) ওফাতের পরে

আরবের বিভিন্ন অংশের অনেক ইসলাম গ্রহণকারী যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। তারা বলেছিল, আমাদের ঈমান ঠিক আছে। আমরা নামাজ কায়েম করব, কিন্তু যাকাত দেবো না। খলিফা আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সাহাবীরা তাদেরকে মুসলমান বলে গণ্য করেন নি।

এবার আপনি নিজের দিকে তাকান। প্রথমত খেয়াল করুন, যাকাত আদায় করার মতো সম্পদ অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদ আপনার আছে কিনা। নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে সেটা যথাযথভাবে হিসাব করে আপনি যাকাত আদায় করছেন কি? যাকাতদাতা হয়ে থাকলেও দান-খয়রাতের মতো করে আপনি যাকাত বিতরণ করছেন, নাকি আপনার যাকাত শরিয়ত নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করছেন? আপনি কি সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করছেন? এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে দিচ্ছেন যারা শরিয়ত নির্ধারিত আটটি খাতে সেই অর্থ ব্যয় করে?

যাকাত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহের জন্যে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। প্রয়োজনীয় তথ্য পেলে আপনার সিদ্ধান্ত নেয়া এবং যথাযথভাবে যাকাত আদায় করা সহজ হবে। আসলে নামাজের অংশীদার যাকাত। এই অংশীদারের হক যথাযথভাবে আদায় করে আপনি অন্যায় এবং অশ্লীলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।

আবার নামাজকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে সুরক্ষা হিসেবে কাজে লাগাতে না পারার দ্বিতীয় কারণটি হতে পারে আপনি নিজেই। রসুলুল্লাহ (স) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ‘একাগ্রচিত্ততা (হুদরিল ক্বালব) ছাড়া নামাজ আল্লাহ গ্রহণ করেন না।’ *[আল ফজল ইবনে আব্বাস (রা); তিরমিজী]*

তিনি বলেছেন, ‘প্রতিটি কাজ তুমি সবচেয়ে ভালোভাবে করবে—এটাই আল্লাহর নির্দেশ।’ *[শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা); মুসলিম, তিরমিজী]*

নামাজের ক্ষেত্রেও তিনি ইহসানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সবচেয়ে ভালোভাবে কীভাবে নামাজ আদায় করা যায়? তিনি বলেছেন, ‘ইহসান (সবচেয়ে ভালোভাবে নামাজ পড়া) হলো, তুমি এমনভাবে নামাজ পড়ো (ইবাদত করো), যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। কারণ তুমি যদি দেখতে না-ও পাও, নিশ্চিতই তিনি তোমাকে দেখছেন।’ *[আবু হুরায়রা (রা); বোখারী]*

একাগ্রচিত্ততা বা হুদরিল ক্বালব নামাজের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আল্লাহ একাগ্রচিত্ততা ছাড়া নামাজ গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ যদি নামাজ গ্রহণ না করেন, তাহলে অন্যায় এবং অশ্লীলতা থেকে যে সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে, তা থেকে স্বাভাবিকভাবেই নামাজী বঞ্চিত হবেন। তাই যখনই

নামাজে দাঁড়াবেন নিজেকে শান্ত করবেন। মন থেকে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা দূর করে দাঁড়াবেন। নামাজে তাড়াহুড়ো করবেন না। আধাঘণ্টা একঘণ্টা দুঘণ্টা আমরা টিভি সিরিয়াল দেখি, স্মার্টফোনে ডুবে থাকি, আমাদের সময় নষ্ট হয় না। অথচ তিন মিনিটের নামাজে আমরা তাড়াহুড়ো করি! যা একজন বিশ্বাসীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ, তা নিয়ে তাড়াহুড়ো করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। অতএব যখন জায়নামাজে দাঁড়াবেন, ধীরস্থিরভাবে দাঁড়ান। চোখ বন্ধ করুন। মনটাকে শান্ত এবং স্থির করার জন্যে অনুভব করুন, আল্লাহর ঘর—কাবা শরীফের সামনে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। অনুভব করুন, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। এই অনুভূতি আসার পরে চোখ মেলুন। তারপর যথানিয়মে নামাজ আদায় করুন।

রমজানের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন চেষ্টা করুন নামাজে চিত্তকে প্রবলভাবে একাত্ম করতে। একাগ্রচিত্তে যখন সেজদায় যাবেন, যে-কোনো সময়ে তা মেরাজে রূপান্তরিত হতে পারে। তখন নামাজে আপনি সত্যিকারের তৃপ্তি অনুভব করবেন। সেই নামাজ আপনাকে অন্যায় এবং অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করবে। আপনি তখন অনুভব করবেন, কেন আল্লাহর রসুল (স) বলেছেন, 'নামাজ জান্নাতের চাবি।' *[জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা); আহমদ, মেশকাত]*

যখন জায়নামাজে দাঁড়াবেন, আল্লাহ মহামহিমের কাছে প্রার্থনা করুন—'দয়াময়! তুমি আমার সেজদাকে মেরাজে রূপান্তরিত করো।' একাগ্র বিশ্বাস নিয়ে যখন প্রার্থনা করবেন, আল্লাহ তা কবুল করতে পারেন। আপনার চাওয়া যদি আল্লাহ পূরণ করতে চান, তাঁর কারো কাছে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি মুহূর্তেই একাগ্র চাওয়াকে কবুল করতে পারেন।

সকল মানুষের হৃদয় ধ্যানের কল্যাণশক্তিতে অবগাহন করুক। হিংসা অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে শান্তি ও সমমর্মিতায় প্লাবিত হোক প্রতিটি অন্তর।

৭ মে ২০২১, ঢাকা

কীসে আপনি তৃপ্তি পাবেন?

একজন মানুষ কীসে তৃপ্তি পায়? উত্তর খুব সহজ হতে পারে যে, একটা ভালো খাবার পেলে তৃপ্তি পায়। একটা ভালো পোশাক পেলে বা একটা পছন্দের জিনিস কিনতে পারলে তার ভালো লাগে। আবার একটা কাজ ভালোভাবে করতে পারলে সে আনন্দ পায়।

আসলে আমরা সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পাই কখন? যখন নিজে ভালো খেতে পারি, আবার আরেকজনকে ভালো খাওয়াতে পারি। কথাটা ঠিক কিনা? এরকম কে আছেন যে, আরেকজনকে ভালো খাওয়াতে পারলে আনন্দ পান না? অন্যকে দিতে না পারলে একমাত্র কৃপণ ছাড়া কেউ তৃপ্ত হয় না। একটা ভালো কাজ করতে পারলে আনন্দ হয়, সেইসাথে আনন্দ হয় যখন আরেকজনকে ভালো কাজে উৎসাহিত করতে পারেন। নিজে ভালো পোশাক পরার সাথে সাথে কাছের মানুষকেও ভালো পোশাক উপহার দিতে পারেন।

একজন মা, একজন বাবা, নিজে একটু কম খেয়েও ছেলেমেয়েকে ভালো খাওয়াতে পারলে, ভালো পরাতে পারলে বেশি খুশি হন। আমি কি ভুল বললাম? আসলে ছেলেমেয়েকে বা আপনজনকে ভালো খাইয়ে নিজে একটু কম ভালো খেয়েও মানুষ তৃপ্তি পায়।

একজন সেবক অন্যের জন্যে করে কেন আনন্দিত হন? কারণ তাদের অন্তরে মায়া আছে, দয়া আছে। মানুষের অন্তরে এই যে মায়া এবং দয়া, এটাই মানুষকে নিজের কল্যাণের পাশাপাশি অন্যের উপকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যের কল্যাণে কাজ করা, অন্যের সেবা করা, সাহায্য করা, সহযোগিতা করা—এটাই হচ্ছে সেবা, এটাই দান, এটাই সাদাকা। সেবা দান সাদাকা ইবাদতের মধ্যে উত্তম ইবাদত। আল্লাহ বলেন, ভগবান বলেন, ঈশ্বর

বলেন, স্রষ্টাকে যে নামেই ডাকেন, প্রভুকে যে নামেই ডাকেন, তাঁকে পাওয়ার পথ হচ্ছে এই সেবা দয়া সাদাকা বা দান।

এজন্যেই প্রত্যেক ধর্মে সেবাকে এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'যাদের দ্বারা মানুষ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়, আল্লাহ তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।' *[আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা); তাবারানী]*

স্বামী বিবেকানন্দের একটা বাণী আমরা জানি—বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

এই বাণীর মূল কথাটা কী? ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজছ? তোমার আশেপাশে যে প্রাণ আছে, যে জীব আছে, এই জীবে দয়া করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে, ঈশ্বরের সেবা হবে।

মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, 'দানের অনন্ত কল্যাণ সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি মানুষ তা জানত, তাহলে কাউকে না দিয়ে সে অন্ন গ্রহণ করত না। প্রকৃত নিরন্ন মানুষকে যে অন্ন দান করে, সে পরলোকে স্বর্গে গমন করবে।' *[ইতিবুত্তক ২৬]*

কোয়ান্টামে আমরা বলি, সেবা উত্তম ইবাদত। কেন বলি? নবীজী (স) বলেছেন, 'সেবামূলক কাজে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদকারী ব্যক্তির সমান। কাজ থেকে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত এ মর্যাদা বহাল থাকে।' *[রাফি ইবনে খাদিজ (রা); তিরমিজী]*

নবীজী (স) আরো বলেছেন, 'নিঃস্ব, বঞ্চিত ও অবহেলিতদের কল্যাণ করার মধ্য দিয়ে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করো।' *[আবু দারদা (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী]*

কারণ অন্যের জন্যে কাজ, অন্যের সেবা, অন্যের যত্ন, অন্যের উপকার কে করতে পারে? কোনো কৃপণ তা কখনো করতে পারবে না।

এখন থেকে ৪০ বছর আগের কথা। আমি ঢাকা শহরে এমন কৃপণ দেখেছি, যিনি সেই সময়ে বাড়িভাড়া পেতেন মাসে আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা। যখন জিনিসপত্রের দাম অনেক কম ছিল। সেই লোকের স্যান্ডেলের তলা ক্ষয় হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার এত টাকা কিন্তু স্যান্ডেলের কী অবস্থা? বললেন, স্যান্ডেল তো কিনতেই চাচ্ছিলাম। অনেক দাম! ভাবলাম, ঠিক আছে। আরো কয়েক দিন চলুক। তখন ১০ টাকা, ১৫ বা ২০ টাকায় স্যান্ডেল পাওয়া যেত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এত টাকা দিয়ে কী করেন? তিনি বললেন, কোথায় টাকা! বাড়িভাড়া থেকে মাত্র দুই-তিন লাখ

আসে! তার নিজের বাড়িভাড়া লাগে না স্বাভাবিকভাবেই। তারপরও স্যান্ডেল কিনতে পারেন না। কেন? টাকা খরচ হয়ে যাবে এই ভয়ে।

অন্যের কল্যাণ, অন্যের উপকার কারা করতে পারে? যাদের অন্তরে দয়া আছে, মায়া আছে। যাদের মনুষ্যত্ব রয়েছে। এরা হচ্ছে মানুষ।

প্রত্যেকটা ভালো কাজ হচ্ছে সেবা। রসুলুল্লাহকে (স) জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রসুল! আমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে পানি পান করালেও কি সওয়াব পাব?' তিনি উত্তরে বলেন, 'প্রতিটি জীবকে পানি পান করালেই সওয়াব পাওয়া যাবে।' এটা *বোখারী* ও *মুসলিম শরীফে*র হাদীস। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভালো কাজ ইবাদত। প্রত্যেকটা ভালো কাজ সাদাকা দান।

আপনি একজনকে 'আসসালামু আলাইকুম' বললেন, কী করলেন? আপনি তার শান্তি কামনা করলেন। এটা সেবা। কারণ আপনি যখন হাসি দিয়ে সালাম দিলেন, তখন তার মুখ একটু বেজার থাকলেও তিনি হাসিমুখ করে আপনাকে 'ওয়ালাইকুম আসসালাম' বলছেন যে, আপনার ওপরেও শান্তি বর্ষিত হোক। এটা ইবাদত হলো। এটা সেবা হলো। রাস্তায় একটা কাঁটা পড়ে আছে, এটা সরিয়ে দেয়া সেবা। একটা কলার খোসা পড়ে আছে, যে-কেউ পিছলে যেতে পারে, এটা সরিয়ে দেয়া সেবা। একজনকে একটা ভালো পরামর্শ দেয়া সেবা সাদাকা বা দান। অর্থাৎ দান শুধু অর্থ দেয়া নয়, প্রত্যেকটা ভালো কাজ, প্রত্যেকটা উপকার দান।

আপনি আপনার স্ত্রীকে বললেন, আমি তোমাকে ভালবাসি। এটা সওয়াবের কাজ। এটা দান বা সেবা। স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। স্বামী বিমোহিত হয়ে গেল যে, এত সুন্দর হাসি দিয়েছে আমার স্ত্রী আজকে! এটা সেবা, এটা ইবাদত, এটা দান।

আমরা খালি মনে করি যে, টাকা দিয়ে দেয়া দান। না। বন্ধু একটু পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। আপনি ধরে ফেললেন তাকে। এটা দান। বন্ধু একটা ভুল করতে যাচ্ছে, আপনি বললেন যে, দোস্ত! থামো! তাকে শুধরে দিলেন। এটা সেবা, দান বা সাদাকা। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণে যত কাজ করা সম্ভব প্রত্যেকটা কাজ হচ্ছে দান। যখন আপনি ইবাদত করবেন, সেবা করবেন, দান করবেন, তখন স্রষ্টা এর প্রতিদান দেন শতগুণ, সহস্রগুণ, কখনো লক্ষগুণ, কোটিগুণ।

ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। একজন চিকিৎসক। তার সন্তান হচ্ছিল না। হরমোনের সমস্যা। ডাক্তার যখন বললেন, কোনো আশা নাই, তখন এই নারীর সারাজীবনের সব ভালো রেজাল্ট, পেশাগত সাফল্য, পারিবারিক

অবস্থান, সবকিছু অর্থহীন মনে হতে লাগল যে, আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে! তীব্র বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হলেন। বিষণ্ণতার জন্যে ওষুধ খেতে শুরু করলেন। যত দিন যায় তত নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছেন। তার এক সিনিয়র ডাক্তার সহকর্মী তাকে পরামর্শ দিলেন, তোমার যেহেতু মন এত খারাপ, তুমি কোয়ান্টামে যাও। কোর্স করো। মেডিটেশন করো। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এলেন। তিনি কিন্তু তার সমস্যা সমাধানের নিয়তে আসেন নি, মেডিটেশন করলে একটু মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে, এই ভেবে এসেছিলেন।

কোর্সের চতুর্থ দিন লামার শিশুদের ভিডিও যখন দেখলেন এবং কোয়ান্টাদের সম্পর্কে শুনলেন, তখন এই ডাক্তারের মনে হলো যে, আমার সন্তান নেই তাতে কী! পৃথিবীতে অনেক শিশু আছে, যার মাথার ওপর হাত রাখার কেউ নেই। আমি সেই শিশুদের জন্যে কাজ করব। তার জীবনে দৃষ্টিভঙ্গিগত একটা পরিবর্তন এলো। তিনি প্রথমবারের মতো পৃথিবীর সব শিশুর প্রতি নিজের সন্তানের মতো মমতা অনুভব করলেন।

কোর্সের পরদিন তিনি যখন হাসপাতালে গেলেন, তার সেই সিনিয়র সহকর্মী দেখলেন যে, তিনি যেন একজন নতুন মানুষ। পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে শুরু করলেন। জীবনে আনন্দ ফিরে এলো। সন্তান না থাকার দুঃখটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। দেখুন, শুধু দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন একটা মানুষের জীবনকে কত বদলে দিতে পারে! কোয়ান্টাম গত ৩০ বছর ধরে এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার কাজটাই করছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে, একবছরের মধ্যে স্রষ্টা তার কোল ভরিয়ে দিলেন। পুত্রসন্তানের মা হলেন তিনি।

এরকম বহু ঘটনা রয়েছে। এক দম্পতি। ২০ বছরের সংসার। তাদের কোনো সন্তান নেই। যখন আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে এলেন, কান্নায় ভেঙে পড়লেন। স্ত্রীও কাঁদছেন, স্বামীও কাঁদছেন। অনেকে পরামর্শ দিয়েছে যে, আরেকটা বিয়ে করো। কিন্তু তারা দুই জন দুই জনকে খুব ভালবাসেন। আমি বললাম, সন্তান নাই তাতে কী হয়েছে! মনে করেন যে, আপনার সন্তান লামাতে আছে। নিজের সন্তানের যেভাবে দায়িত্ব নিতেন, সেভাবে তার লালনপালন করেন। সেভাবে তাকে দেখেন। তারা দায়িত্ব নিলেন। দায়িত্ব নেয়ার একবছরের মধ্যে স্ত্রী কনসিভ করলেন এবং এখন তার সন্তানের বয়স পাঁচ বছর হয়ে গেছে।

সৃষ্টির সেবা এত আনন্দের, এত গুরুত্বপূর্ণ বলেই কোয়ান্টামে আমরা সৃষ্টির সেবায় নিজেদের নিবেদিত করেছি। আমরা প্রভুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তিনি আমাদের এ কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের

অর্থায়নে এরকম বহুমুখী সেবামূলক কাজ আমাদের দেশে খুব কম প্রতিষ্ঠান করার সুযোগ পেয়েছে। এখানে সরকারি বা বিদেশি কোনো সাহায্য নেই। সবগুলো কাজ হচ্ছে স্ব-অর্থায়নে। অর্থাৎ আমাদের সবার টাকায়। কেন? আমরা সবাই মিলে দান সংগ্রহ এবং দান বিতরণ করছি।

আল্লাহর রসুল (স) বলেছেন, 'সততার সাথে দান সংগ্রহকারী ও দান বিতরণকারী দাতার মতোই সমান সওয়াব এবং পুণ্যের অধিকারী হবে।' *[আবু মুসা আশয়ারী (রা); বোখারী, মুসলিম]*

ঢাকাতে আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। থ্যালাসেমিয়া রোগী, যাদের প্রতি মাসে রক্ত লাগে তাদের মধ্যে যারা অসহায়, তাদের প্রত্যেককে আমরা স্থায়ী কার্ড করে দিয়েছি যে, তাদেরকে আবেদন করতে হবে না। এই কার্ড নিয়ে এলেই প্রত্যেক মাসে তারা রক্ত পায়।

আমাদের অন্যতম সেবা কার্যক্রমগুলো হলো : দেশের বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল বা ইঁদারা স্থাপন, দুস্থের চিকিৎসাসেবা, চক্ষুসেবা ও ছানি অপারেশন। চিন্তা করুন, চোখে ছানি পড়ে যাওয়ার কারণে যে ব্যক্তি কিছুই দেখতে পেত না তারা আবার পৃথিবীর রং-রূপ দেখতে পাচ্ছে। এ-ছাড়া মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় গর্ভবতী মায়েদের সন্তান প্রসবে সহায়তা, সুন্নতে খতনা, দাফন এবং সৎকার, বৃক্ষরোপণ, প্রবীণসেবা, গৃহ নির্মাণ, সেলাই মেশিন বিতরণ ও প্রশিক্ষণ, দুর্গত মানুষকে আর্থিক সাহায্য করা। প্রবীণসেবার মূল কাজটা করা হয় লামাতে আর আশ্রয়মম রাজবিলাতে। ৫৭ জন প্রবীণ স্থায়ীভাবে বাস করছেন রাজবিলাতে। বেশ কয়েকজন ওখানে মারা গেছেন। তাদেরকে খুব যত্নের সাথে শেষকৃত্য এবং দাফন করা হয়েছে।

হাফেজিয়া মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু হবে। যেখান থেকে হিফজ শেষ করে সবাই আবার স্কুলে/ মাদ্রাসা লাইনে স্বাভাবিক নিয়মে পড়াশোনা করবে।

আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ। আলহামদুলিল্লাহ! কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে এখন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের একজন ছাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করে সম্প্রতি ফুল স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পড়াশোনা করতে গিয়েছে।

দয়া এবং মায়া যার অন্তরে আছে সে দান করতে পারে। কৃপণ কখনো দান করে না, বরং দানকে নিরুৎসাহিত করে। এজন্যে কৃপণকে স্রষ্টা অপছন্দ করেন। স্রষ্টা দাতাকে পছন্দ করেন, সেবাকারীকে পছন্দ করেন।

সেবাকাজের একটা বাস্তব রূপ আমাদের কোয়ান্টামম, যা সাধনা এবং সেবার বিকাশভূমি। সেবা ছাড়া সাধনা কখনো পরিপূর্ণ হয় না। যদি শুধু ধ্যান করলে স্রষ্টার সন্তুষ্টি পাওয়া যেত, তাহলে কোনো মহামানব নবুয়ত পাওয়ার পরে মানুষের জন্যে কাজ করতেন না। তারা নির্জনে বসেই ধ্যানে বা জিকিরে লিপ্ত থাকতেন, ওজিফা পাঠে লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু তারা যখন বোধি লাভ করেছেন, জ্ঞান লাভ করেছেন, সত্য উপলব্ধি করেছেন, নবুয়ত লাভ করেছেন, এরপর তারা কী করেছেন? মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছেন এবং তাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছেন।

কোয়ান্টাম সেই কাজটাই করছে। কোয়ান্টামের এই কাজ হাজার বছর ধরে ইনশাআল্লাহ বহমান থাকবে। আমরা যারা এই কাজের সাথে যুক্ত আছি—দোয়া দিয়ে, দান দিয়ে, শ্রম দিয়ে, ঘাম দিয়ে, আমাদের প্রত্যেকের দান, প্রত্যেকের সেবা সদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ বহমান সৎকর্ম।

এই কাজগুলো যতদিন থাকবে, এর সমস্ত সওয়াব যিনি আজকে যতটুকু করছেন তিনিও পেতে থাকবেন। একবার যদি কেউ শেয়ার কিনে ফেলে, যতদিন কোম্পানি থাকে, ঐ শেয়ারের ডিভিডেন্ট ততদিন তিনি পেতে থাকেন। তেমনি আপনি ৫০ টাকা দিলেন, পাঁচশ টাকা বা পাঁচ হাজার টাকা দিলেন, এই দানটা সৎকর্মের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। বছরে যত কোটি টাকার কাজ হচ্ছে, সমস্ত কাজের বরকত, সমস্ত কাজের পুরস্কার স্রষ্টা আপনাকে দিতে পারেন। কারণ দাতার পুরস্কার স্রষ্টা নিজে তাঁর ইচ্ছেমতো দেন। যে-কোনো সৎকর্মের সওয়াব শুরু হয় ১০ গুণ থেকে, আর সৎদানের সওয়াব শুরুই হচ্ছে কমপক্ষে ৭০০ গুণ থেকে। সূরা বাকারা ২৬১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'সৎদান এমন একটি শস্যবীজ, যাতে উৎপন্ন হয় সাতটি শীষ এবং প্রতিটি শীষে থাকে শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন।'

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এরকম একটি সুন্দর কাজের সাথে, সুন্দর ইবাদতের সাথে, আরাধনার সাথে সংযুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। যার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমরা স্রষ্টার অনুগ্রহভাজনদের একজন হতে পারব।

৪ নভেম্বর ২০২২, কোয়ান্টামম

দাতারাই স্মরণীয় হন

কেন সাদাকা? কেন সেবা? কারণ যত উপাসনা রয়েছে, আরাধনা ইবাদত রয়েছে, তার মধ্যে উত্তম ইবাদত হচ্ছে সেবা সাদাকা সহযোগিতা দয়ামায়া।

আমরা ভালো কাজ করি কেন? ভালো কাজ করলে স্রষ্টা খুশি হন। বন্ধুর সাথে, সন্তানের সাথে হাসিমুখে কথা বললে তিনি খুশি হন। মা-বাবার সাথে মমতা নিয়ে কথা বললে তিনি খুশি হন। উপাসনা আরাধনা করলে খুশি হন। ধরুন, আপনি একটা ব্যবসা করতে চাচ্ছেন। যেটাতে লাভ কম হবে সেটাতে বিনিয়োগ করবেন, না যেটাতে লাভ বেশি সেটাতে বিনিয়োগ করবেন? লাভ যেটাতে বেশি হবে সেখানেই তো আপনি বিনিয়োগ করবেন। একইভাবে কোন কাজ করলে আল্লাহ বেশি খুশি হন সেটা যদি বুঝতে পারেন, তাহলে বুদ্ধিমান মানুষ সেই কাজটাই বেশি বেশি করবে।

আবু দারদা (রা) বর্ণিত হাদীস। নবীজী (স) বলেছেন, 'নিঃস্ব, বঞ্চিত ও অবহেলিতদের কল্যাণ করার মধ্য দিয়ে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করো।' *[আবু দাউদ, তিরমিজী]*

অবহেলিত বঞ্চিতের কল্যাণকারী, তাদের সেবাকারীকে নবীজী (স) যে মর্যাদা দিয়েছেন সেটা যদি আমরা জানি তাহলে আমাদের আরো ভালো লাগবে। *তিরমিজী শরীফের* আরেকটি হাদীস হচ্ছে, 'সেবামূলক কাজে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদকারী ব্যক্তির সমান। কাজ থেকে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত এ মর্যাদা বহাল থাকে।' *[রাফি ইবনে খাদিজ (রা); তিরমিজী, মেশকাত]*

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস—'বিধবা ও এতিম অসহায় মানুষের কল্যাণে নিরলস পরিশ্রমকারীর মর্যাদা আল্লাহর পথে জেহাদরত মুজাহিদের

মতো। তার মর্যাদা সারারাত অবিরাম নামাজ আদায়কারী এবং সারাদিন রোজা পালনকারীর সমতুল্য।' *[বোখারী, মুসলিম]*

অসহায় মানে কী? একজন প্রবীণ, যিনি নিজে নিজে চলাফেরা করতে পারেন না, তিনি অসহায়। একজন অসুস্থ, যিনি নিজে কিছু করতে পারেন না, তিনি অসহায়। এদের জন্যে যিনি কাজ করছেন তার মর্যাদা সেই মানুষের সমান, যিনি সারাদিন রোজা রেখে সারারাত ইবাদত করেন, নামাজ পড়েন।

মুসলিম শরীফের আরেকটি হাদীস। এটা বলে দেয় যে, অসুস্থ মানুষের সেবা করা, বঞ্চিতের সেবা করা কত সওয়াবের, কত পুণ্যের, কত গুরুত্বপূর্ণ। এই হাদীসে মহাবিচার দিবসের কথা বলা হয়েছে যে—

মহাবিচার দিবসে মহামহিম আল্লাহ অনুযোগ করবেন, 'হে আদমসন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে যাও নি।' অভিযুক্ত তখন আরজ করবে, 'প্রভু হে! তুমি তো মহাবিশ্বের প্রতিপালক। (তুমি কীভাবে অসুস্থ হতে পারো?) আমি কোথায় তোমাকে দেখতে যাব?' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে, অমুক অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাও নি। তুমি কি জানতে না যে, তাকে দেখতে গেলে সেখানেই আমাকে পেতে?'

আল্লাহ বলবেন, 'হে আদমসন্তান! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাও নি।' অভিযুক্ত তখন আরজ করবে, 'হে মহান অন্নদাতা! তুমি যেখানে সবার অন্নের ব্যবস্থা করো, সেখানে আমি তোমাকে কীভাবে খাওয়াব?' আল্লাহ বলবেন, 'অমুক তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাও নি। তুমি কি জানতে না যে, তখন যদি তুমি তাকে খাবার দিতে, তাহলে তার পুরস্কার আমার কাছ থেকে পেতে?'

আল্লাহ বলবেন, 'হে আদমসন্তান! আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাও নি।' অভিযুক্ত তখন আরজ করবে, 'হে মহান তৃষ্ণা নিবারণকারী! তুমি যেখানে মহাবিশ্বের সবার তৃষ্ণা নিবারণ করো, সেখানে আমি তোমাকে কীভাবে পানি পান করাব?' আল্লাহ বলবেন, 'অমুক তৃষ্ণার্ত তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাও নি। তুমি কি জানতে না যে, তখন তুমি তাকে পানি পান করালে এখন আমার কাছ থেকে এর পুরস্কার পেতে?' *[আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম]*

তার মানে কী? আল্লাহ কিন্তু 'কোনো নফল ইবাদত করছ কিনা' একথা জিজ্ঞেস করবেন না। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তৃষিতকে তুমি পানি দাও নি কেন? ক্ষুধার্তকে কেন খাবার দাও নি? অসুস্থের কেন সেবা করো নি? এই যে

সেবা—তৃষিতকে পানি দেয়া, ক্ষুধার্তের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

আপনারা ইমাম আবু হানিফার (র) নাম জানেন। অধিকাংশ মুসলমানই হানাফি মাজহাব অনুসরণ করেন অর্থাৎ শরিয়া সম্পর্কে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাটাকে অনুসরণ করেন। তার জীবনের দিকে তাকান।

ইমাম আবু হানিফার (র) প্রতিবেশীদের মধ্যে এক মুচি ছিল। খ্রিষ্টান মুচি। প্রায় প্রত্যেক রাতেই সে মদ খেয়ে ঘরে ফিরত এবং বউকে পেটাত, চিৎকার-চেঁচামেচি করত। আশেপাশের লোকজন আর কত সহ্য করবে! তারা ভাবল যে, আমাদের মহল্লায় এত বড় ইমাম রয়েছেন, তাকে গিয়ে নালিশ দেই। তিনি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন।

যখন ইমাম সাহেবের কাছে নালিশ দিল, ইমাম সাহেব মুচিকে ডেকে বোঝালেন যে, দেখ! মদ খাওয়া ভালো নয়, ছেড়ে দাও। এত বড় ইমাম তাকে ডেকেছেন! সে তো 'জ্বী হুজুর, জ্বী হুজুর' করছে। কয়েকদিন সব শান্ত। কয়েকদিন পরে আবার সেই একই অত্যাচার, চিৎকার-চেঁচামেচি। মহল্লার লোকজন গিয়ে এবার বসরার গভর্নরের কাছে বিচার দিল। গভর্নর পুলিশ পাঠিয়ে তাকে ধরে নিয়ে গেল। মুচিকে যে রাতে ধরে নিয়ে গেল সেই রাতে ইমাম সাহেব আর কোনো চেঁচামেচির আওয়াজ শুনলেন না। তিনি ভাবলেন যে, যাক! আমার পরামর্শে কাজ হয়েছে।

পরদিন ভোরবেলা ফজরের নামাজের জন্যে তিনি যখন মসজিদের দিকে রওনা দিয়েছেন, মুচির বাসা থেকে এক মহিলার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। খুব করুণ স্বরে বিলাপ করে কান্না। তিনি থামলেন। বাইরে থেকেই জিজ্ঞেস করলেন যে, মা! কাঁদছ কেন? কী হয়েছে? মুচির বউ তো ইমাম সাহেবের গলা শুনে বেরিয়ে এসে একেবারে তার পায়ে পড়ে বলল যে, হুজুর! আমার স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ঘরে খাবার নাই। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আমরা উপোস করছি।

মসজিদের দিকে না গিয়ে তিনি বাসায় ফিরে এলেন। বাসায় এসে বেগম সাহেবকে বললেন, আমার প্রতিবেশী মুচির বাসায় কোনো খাবার নেই। তুমি মুচির বাসায় খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করো। এই বলে তিনি আবার রওনা দিলেন নামাজ পড়ার জন্যে। এত বড় ইমাম! যাচ্ছিলেন মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ার জন্যে। যখন শুনলেন—বিপন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না, তিনি বাসায় ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন মুচির বাড়িতে খাবার পাঠানোর জন্যে! তারপরে তিনি মসজিদে গেলেন নামাজ পড়তে। অর্থাৎ একজন মানুষ যখন

বিপদে পড়ে তখন তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা, নিজের সামর্থ্যানুযায়ী সেই মানুষটার কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করা একজন বিশ্বাসীর জন্যে, একজন ভালো মানুষের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পরদিন ইমাম সাহেব বসরার গভর্নরের কাছে গিয়ে মুচিকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন। যে মুচির জন্যে তিনি এই কাজ করলেন, তিনি কিন্তু খ্রিষ্টান ছিলেন। সেটা ইমাম সাহেবের জন্যে বিবেচ্য বিষয় ছিল না। ইমাম সাহেবের জন্যে বিবেচ্য বিষয় ছিল—সে দুস্থ, সে বিপদগ্রস্ত! তাকে সাহায্য করা হচ্ছে কর্তব্য এবং তিনি সেই কাজটিই করেছিলেন।

আমরা ইমাম আবু হানিফার (র) জীবন থেকে কী শিক্ষা পাই? বিপন্নের কোনো জাত নাই, পাত নাই। যে-কোনো বিপন্ন মানুষের উপকার করা একজন বিশ্বাসীর জন্যে, একজন ভালো মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম কাজ।

আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথা জানি। স্বামীজী বলেছেন, 'মানুষের ঘরে জন্ম নিলেই মানুষ হওয়া যায় না, মানুষ হয়ে উঠতে হয়।' মানুষ হওয়ার জন্যে শিক্ষা দরকার, সত্যজ্ঞান দরকার। সত্যজ্ঞান পেলে সে মানুষ হয়। শিষ্যদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'মানুষের জন্যে কাজ পূজোরই শামিল।'

মানুষের জন্যে কাজ করা এবং পূজো করাকে তিনি সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মানুষের জন্যে কাজ করে করে তোরা শেষ হয়ে যা, এটাই আমার আশীর্বাদ।'

বঞ্চিত মানুষের উপকারে কাজ করাকে স্বামী বিবেকানন্দ কত গুরুত্বপুর্ণ মনে করতেন! ১৮৯৮ সাল। এখন থেকে সোয়া শ বছর আগে কলকাতায় প্লেগ মহামারি হয়। আতঙ্কে কলকাতা জনশূন্য হয়ে যায়। স্বামীজী তার অন্যান্য গুরুভাই ও শিষ্যদের ডেকে পাঠালেন। বেলুর মঠ তখনো তৈরি হয় নি। মাত্র জমি কেনা হয়েছে। তিনি সমবেত শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন যে, 'মরণভয় তুচ্ছ করে প্লেগ রোগীর সেবা করতে হবে। এদের ওষুধ দিতে, চিকিৎসা দিতে যদি মঠের জমি বিক্রি করতে হয়, তা-ও আমি বিক্রি করব।'

আমরা কিন্তু সেই কাজটাই করছি। করোনাকালে আমরা কী করেছি? আমাদের মরণভয়কে তুচ্ছ করে মানুষের সেবা করেছি। জাতিধর্ম নির্বিশেষে পরম মমতায় মৃত মানুষটিকে তার ধর্মীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানিয়েছি। বাংলাদেশে করোনায় মৃতদের যে মর্যাদা দিয়ে শেষ বিদায় জানানো হয়েছে, সারা পৃথিবীতে মৃতেরা সেই মমতা সেই মর্যাদা পায় নি।

অনেকে কল্পনা করে যে, প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হবো, তারপরে সমাজের জন্যে কাজ করব। আসলে এরা কখনো সমাজের জন্যে কাজ করতে

পারে না। তারা নিজের জন্যে কাজ করেই শেষ করতে পারে না। তারা আসলে বুভুক্ষু। তাদের প্রচুর অর্থের ক্ষুধা কখনো পূরণ হয় না। কাজ করতে হয় যা আছে তা দিয়ে। যা আছে তা নিয়ে যখন একজন মানুষ কাজ করে, তখন আল্লাহর রহমত তার ওপরে নাজিল হয়। প্রভু তার ওপরে দয়া করেন এবং তার কাজগুলো সুন্দর হয়। যে-রকম আমরা কিন্তু প্রচুর অর্থ নিয়ে শুরু করি নি। আমরা কাজে নেমেছি। সদস্যরা টাকা দিয়েছেন, শুভানুধ্যায়ীরা টাকা দিয়েছেন এবং আমাদের টাকার অভাব হয় নি। প্রত্যেকটা কাজ আমরা স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস করে শুরু করেছি, তারপর টাকা এসেছে।

মাদার তেরেসার একটা কথা আছে, 'তুমি যদি ১০০ জন ক্ষুধার্তকে খাওয়াতে না পারো, অন্তত একজনকে খাওয়াও।'

মাদার তেরেসার বই where there is love, there is God অর্থাৎ যেখানে মমতা আছে, ঈশ্বর সেখানে আছেন। বইয়ে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে, একদিন একজন আমাদের আশ্রমে এসে বলল, মাদার! একটা হিন্দু পরিবার রয়েছে। তাদের আট সন্তান। তারা এখন অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাদের জন্যে কিছু করুন। মাদার তেরেসা কিছু চাল নিয়ে সেই বাড়িতে গেলেন। বিধবাকে চালগুলো দিলেন। বিধবার চোখ ছলছল করে উঠল। কারণ সন্তান যখন ক্ষুধার্ত থাকে, সে-সময় যদি কেউ খাবার নিয়ে হাজির হয়, তখন আনন্দ কৃতজ্ঞতা ভেতর থেকে আসে।

মাদার বলছেন, খেয়াল করলাম, চাল পাওয়ার পরেই সে চালগুলোকে দুভাগ করে ফেলল। একভাগ রেখে আরেক ভাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার কৌতূহল হলো। ভাবলাম যে, ঘটনাটা কী? কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? বলল, আমার প্রতিবেশীও ক্ষুধার্ত। তার ঘরেও খাবার নেই। তাকে চাল দিতে গিয়েছিলাম।

মাদার বলছেন, আমি বিস্মিত হলাম! সে চাল ভাগ করে দিয়ে এসেছে সেজন্যে নয়; সে জানে যে, প্রতিবেশীও ক্ষুধার্ত। প্রতিবেশীর জন্যে এই যে মমতা, এই মমতাই আমাকে বিস্মিত করেছে। যাকে তিনি চাল দিয়ে এলেন সেই প্রতিবেশীর পরিবার কিন্তু হিন্দু ছিল না, তারা মুসলমান ছিল!

আসলে ক্ষুধার্ত অসহায় বঞ্চিতের জাতপাত ধর্ম বিবেচ্য নয়। যে জাত হোক, যে পাত হোক, যে ধর্ম হোক, যে বর্ণ হোক; যারা ভালো মানুষ, যারা সত্যিকারের ইমাম, যারা সত্যিকারের স্বামী, যারা সত্যিকারের মাদার, তারা সবসময় মানুষের সেবা করেছেন। মানুষের সেবা করাটাকেই তারা স্রষ্টার সেবা করা হিসেবে গণ্য করেছেন। এই বইয়ে মাদার তেরেসার একটা

কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা কতগুলো ডিপ্লোমা অর্জন করেছি, কত অর্থ কামাই করেছি, কতগুলো মহান কাজ করেছি, জীবন শেষে আমাদেরকে এটা দিয়ে বিচার করা হবে না। আমাদের বিচার করা হবে... তার ভাষায় উদ্ধৃত করছি, We will be judged by "I was hungry, and you gave me something to eat, I was naked and you clothed me. I was homeless, and you took me in." অর্থাৎ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দিয়েছিলে। আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তুমি আমাকে পোশাক দিয়েছিলে। আমি গৃহহীন ছিলাম, তুমি তোমার ঘরে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে—এটা দিয়ে আমাদের বিচার করা হবে।

যুগে যুগে যত ধর্ম এসেছে, যত ধর্মীয় পুরুষ এসেছেন—মহামতি বুদ্ধ, শ্রী রাম, শ্রীকৃষ্ণ, ইব্রাহিম (আ), ঈসা (আ) বা যিশু, মুসা (আ), নবীজী (স)—যত মুনি-ঋষি অলি-বুজুর্গ এসেছেন, সবার শিক্ষা কিন্তু একই। তারা ঘরে বসে নীরবে জিকির করার চেয়ে, ওজিফা পড়ার চেয়ে মানুষের কল্যাণ করাটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

সবচেয়ে বড় পাঁচ জন হাদীসবেত্তার একজন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি ইবনে আব্বাস (রা) নামেই পরিচিত। তিনি মসজিদে নববীতে এতেকাফ করছিলেন। রোজার মাসের শেষ ১০ দিন মসজিদে মৌন থেকে আল্লাহর ইবাদত করার নাম হচ্ছে এতেকাফ।

এর মধ্যে এক ব্যক্তি এসে তাকে সালাম করল। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে খুব চিন্তিত দেখছি। সে বলল যে, হাঁ, অমুকের কাছ থেকে আমি ঋণ করেছিলাম। ঋণ পরিশোধ করার জন্যে চাপ দিচ্ছে, কিন্তু ঋণশোধ করার সাধ্য আমার নাই। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বললেন, আমি কি সেই ব্যক্তির সঙ্গে তোমার ব্যাপারে কিছু বলব? ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বলল, যদি আপনি ভালো মনে করেন তাহলে বলুন। ইবনে আব্বাস (রা) তখনই মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। লোকটি বলল, আপনি যে এতেকাফে ছিলেন তা কি ভুলে গেছেন? তিনি বললেন, এই মসজিদে নববীতে যিনি শুয়ে আছেন তিনি বলেছেন, কোনো দুর্দশাগ্রস্তের দুর্দশা মোচনের জন্যে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া, মসজিদে বসে ১০ বছর এতেকাফের চেয়ে বেশি সওয়াবের। *[ইবনে আব্বাস (রা); তাবারানী, মুস্তাদরাক আল হাকেম]*

দুস্থ মানুষের অভাব মোচন করা, তার দুর্গতি দূর করা, তার সমস্যা দূর করার জন্যে কাজ ১০ বছর এতেকাফ করার চেয়েও উত্তম। এই কথা যখন

ইবনে আব্বাস (রা) বলছিলেন, তখন তার চোখ ছলছল করে উঠেছিল।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, আমরা কোয়ান্টামে এই কাজটাই করার সুযোগ পেয়েছি। এখন আমাদের করসেবা চলছে সারাদেশে। করসেবায় যারা অংশগ্রহণ করছেন প্রতিদিন তারা যে কাজ করছেন, তা সারারাত নফল নামাজ পড়া ও সারাদিন রোজা রাখার সওয়াবের সমান। কারণ নিরন্ন মানুষ, অবহেলিত বঞ্চিত মানুষের সেবা করার চেয়ে উত্তম কাজ আর কিছু নাই।

প্রবীণসেবা কার্যক্রমের ছবি দেখছিলাম। সেখানে এক প্রবীণ কোনোরকমে একটু একটু চোখে দেখেন, নিজে কিছু করতে পারেন না। তাকে যখন খাইয়ে দেয়া হচ্ছে, যখন গোসল করিয়ে দেয়া হচ্ছে, তার চেহারার মধ্যে কী আনন্দ! কী তৃপ্তি!

আমরা কেন প্রবীণকে গোসল করাচ্ছি? কারণ গোসল করালে আল্লাহ খুশি হবেন। যারা অসহায়ের জন্যে, বঞ্চিতের জন্যে, শিশু-কিশোরদের জন্যে কাজ করছেন তারা আসলে এতেকাফের চেয়েও উত্তম কাজ করছেন।

কোয়ান্টামমে যারা রোগীদের সেবা করছেন, শিশুদের লালন করছেন, শিশুদের জন্যে ঘর বানাচ্ছেন, বাজার করছেন, খাবার রান্না করছেন ও পরিবেশনা করছেন—প্রত্যেকটা কাজ সওয়াবের। আমাদের এই কাজগুলো কোনো একক কাজ নয়। সবাই মিলে কাজ না করলে এই কাজগুলো কখনো সম্পন্ন হতো না। যে কারণে নবীজী (স) বলেছেন, 'যিনি অর্থ দান করছেন, যিনি সেই দান সংগ্রহের জন্যে শ্রম দিচ্ছেন, সময় ব্যয় করছেন এবং যিনি সেই দানটাকে কাজে লাগাচ্ছেন অর্থাৎ দান বিতরণ করছেন, সবাই দাতার সমান সওয়াবের অধিকারী হবেন, পুণ্যের অধিকারী হবেন।'

আমরা যদি আন্তরিকতা নিয়ে দুস্থের সেবা করি, অসুস্থের সেবা করি, একটা শিশুর যত্ন নিই, তাকে জ্ঞানের আলো দান করি, মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে সময় শ্রম মেধা অর্থ দান করি, তাহলে আল্লাহ খুশি হবেন। আল্লাহ খুশি হবেন এই নিয়ত নিয়ে কাজ করলে এই কাজের সাথে যারা বিন্দুমাত্র জড়িত, তাদেরকেও প্রভু ক্ষমা করে দিতে পারেন। অতএব আমরা যখনই কারো সেবা করি, যত্ন নিই, উপকার করি, কল্যাণ করি, লোক-দেখানোর জন্যে যেন না করি। সবসময় যেন নিয়ত থাকে—প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে আমি এই কাজ করছি। তাহলেই আমরা প্রভুর দয়ায় ইহকাল এবং পরকালে পরিত্রাণ পাব!

১৮ নভেম্বর ২০২২, কোয়ান্টামম

অভাবীকে দিয়ে স্রষ্টার কাছে চান

ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। প্রথমেই আমরা সেই বীরদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যাদের আত্মত্যাগে আমরা স্বাধীন জাতির সম্মান লাভ করেছি, সবচেয়ে আশাবাদী জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে স্থান করে নিয়েছি। এবারের ডিসেম্বর আমাদের কাছে আরো একটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে কোয়ান্টামের ৩০ বছর পূর্তি হবে এ মাসে।

এই আনন্দক্ষণে আমাদের নিবেদিতপ্রাণ সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণে সময় শ্রম, মেধা ও অর্থ ব্যয় করেছেন বলেই আমাদের দেশে 'কোয়ান্টাম' শব্দটি মেডিটেশন বা ধ্যানের প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে। সকল বয়সের লক্ষ মানুষ আজ অনায়াসে ধ্যানের শান্তির ভুবনে ডুবে যেতে পারছেন। শারীরিক মানসিক সামাজিক ও আত্মিক ফিটনেস অর্জনের প্রয়াস চালাতে পারছেন। এই নিবেদিতপ্রাণ সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রয়াসে মেডিটেশন যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তেমনি তাদের আন্তরিক প্রয়াস, দোয়া, শ্রম ও অর্থেই পরিচালিত হয়ে আসছে সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টামের সকল কাজ।

২৫ বছরে ৩৬ ধরনের সেবা নিয়ে মানুষের পাশে আছে কোয়ান্টাম। সৃষ্টির সেবায় সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানকে একত্র করে কাজ করছে। আর এই ক্ষুদ্র দান একত্র করার মাধ্যম হলো মাটির ব্যাংক।

আমাদের প্রধান সেবা কাজগুলো হলো : কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। বর্তমানে বছরে লক্ষাধিক ইউনিট রক্ত সরবরাহ করে স্বেচ্ছা

রক্তদান কার্যক্রম রক্তগ্রহীতাদের ভরসার প্রথম স্থানে পরিণত হয়েছে। এ-ছাড়া স্বাস্থ্যসেবা, চক্ষু চিকিৎসা ও চোখের ছানি অপারেশন, সুন্নতে খতনা, বৃক্ষরোপণ, স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা উল্লেখযোগ্য কাজ।

বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে বেড়ে ওঠা বঞ্চিত শিশুদের অর্জন তো এখন সবারই জানা। যা একসময় গণ্য করা হতো গ্রাম্য পাঠশালা হিসেবে, সেই স্কুলই গত চার বছর ধরে ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশসেরা স্কুলের সম্মানে ভূষিত। এই স্কুলের দেড় শতাধিক ছাত্র এখন পড়ছে মেডিকেল কলেজ, পাবলিক ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ ছাড়াও ফুল স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশেও যাওয়া শুরু করেছে একদা অবহেলিত এই শিশুরা। কারণ আপনারা যাদের অভিভাবক, তারা তো অবহেলিত বা বঞ্চিত থাকতে পারে না। আপনাদের দোয়ায় তারা এখন সব জায়গায় পাচ্ছে বিশেষ আদর ও সম্মান।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়া ও পরিচালনা করা নিঃসন্দেহে সদকায়ে জারিয়া বা বহমান সৎকর্ম। এর পুণ্য বা নেকি আপনি মৃত্যুর পরও পেতে থাকবেন। তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সুস্থ একটি নবজাতককে পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করা। কারণ শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ একটি শিশু শুধু সেই পরিবারেই নয়, দেশের সম্পদ। মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত প্রসূতিদের গর্ভধারণ থেকে সন্তান প্রসবের পর ৪০ দিন পর্যন্ত পুষ্টি ওষুধপথ্য ও চিকিৎসার খরচ বহন করছে কোয়ান্টাম। সুবিধাবঞ্চিত প্রসূতিদের তরফ থেকে, সুস্থ ফুটফুটে শিশুদের তরফ থেকে আমরা আপনাদের কাছে এজন্যে আবারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ছোট হোক বা বড়, সৃষ্টির কল্যাণে প্রতিটি কাজই অত্যন্ত পুণ্যের। রাস্তা থেকে একটা কাঁটা, একটা ভাঙা কাচের টুকরো, একটা পরিত্যক্ত ইট বা যে-কোনো প্রতিবন্ধকতা সরানোও পুণ্যের। হাসিমুখে সালাম ও সালামের জবাব দেয়া পুণ্যের। একটা ভালো পরামর্শ দেয়া পুণ্যের। তবে আমার কাছে সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী ছিল চলাফেরা করতে অক্ষম প্রবীণ সুরুজ মিয়ার ঘটনা। আমাদের একজন সহকর্মী বললেন, কোয়ান্টামমে ঢোকার পথে লম্বাখোলায় একটা টিনের দোকানের পাশে বেড়া ঘেঁষে এক বৃদ্ধ পড়ে আছেন। স্ত্রী পুত্র বা আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। কেউ যদি খাবার খাইয়ে দেয় তো খান, নইলে পড়ে থাকেন।

ভেতরে একটা ব্যথা অনুভব করলাম। আসলে যিনি নিজে উঠতে পারেন না, চলাফেরা করতে পারেন না, তার অবস্থা তো আমরা বুঝতেই পারি।

রাজবিলায় আশ্রয়মমে নিয়ে যাওয়ার কথা বললাম। কিন্তু সুরুজ মিয়া এই জায়গা ছেড়ে যেতে নারাজ। আমাদের কর্মীরা ওখানেই একটা অর্ধনির্মিত ঘরে লোহার খাটে তাকে শোয়ানোর ব্যবস্থা করলেন। শুরু হলো নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, গোসল ও খাওয়ানোর ব্যবস্থা। যত্নের ফলে একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন সুরুজ মিয়া।

একদিন সকালে হাঁটতে বেরিয়ে দেখতে গেলাম সুরুজ মিয়াকে। সুরুজ মিয়া আমার দিকে তাকালেন। সেই চোখ, সেই চাহনি এখনো চোখে লেগে আছে। মুহূর্তে আমি তার চোখে যেন দেখতে পেলাম সারাদেশের সন্তান ও পরিজন পরিত্যক্ত অসহায় প্রবীণদের বেদনার্ত চেহারা। ভেতরটা আবারো কেঁদে উঠল। মনে হলো, এরা যখন যুবক ছিলেন, শরীরে যখন বল ছিল, এদের মেধা ও শ্রমে আমরা উপকৃত হয়েছি, সমাজ উপকৃত হয়েছে। আজ এরা অসহায়। সমাজকেই তো এদের পাশে দাঁড়াতে হবে। সুরুজ মিয়া মারা গেছেন। তার আর সেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কোনো অসহায় প্রবীণকে যেন রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে না হয়, ডোবার পাশে পড়ে থাকতে না হয়, দোকানের ভাঙা বেড়ার পাশে পড়ে থাকতে না হয়।

আসলে মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মমতা। যখন তিনি মমতা পান তখন মৃত্যুটা অবহেলার হয় না, করুণার হয় না। তখন মৃত্যুটা হয় তৃপ্তির। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখেই তিনি পরকালে পাড়ি জমাতে পারেন। সে লক্ষ্যেই কোয়ান্টামমে আমরা নির্মাণ শুরু করেছি প্রবীণসেবা কেন্দ্র। সেবাকেন্দ্র নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। আমরা প্রবীণসেবা কেন্দ্রকে বড় করতে চাই, যেন দেশের যে-কোনো প্রান্তের অসহায় প্রবীণদের এখানে রেখে আমরা আপনজনের মমতা দিতে পারি, যত্ন নিতে পারি। যেন জীবনসায়াহ্নে তিনি অনুভব করতে পারেন মমতার স্পর্শ!

আপনি আপনার বৃদ্ধ মা-বাবার সুস্থ স্বাভাবিক ও সম্মানজনক মৃত্যু অথবা মৃত মা-বাবার মাগফেরাত বা অনন্ত কল্যাণ, আর নিজে যাতে বৃদ্ধ বয়সেও সুস্থ কর্মক্ষম থেকে কাজ করতে করতে আপনজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় মারা যেতে পারেন—সেই নিয়তে প্রবীণসেবায় দান করতে পারেন।

রোগ-শোক-বিপদ ও বালা-মুসিবত থেকে মুক্তির জন্যে দোয়াকে ফলপ্রসূ ও কার্যকর করে দান। সাধকরা সবসময়ই একথা বলেছেন। হযরত হাবিব আজমীর ঘটনা। তিনি অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন। একবার এক মা কাঁদতে কাঁদতে হাবিব আজমীর কাছে এলেন। ছেলেকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে তিনি শোকে পাগলপ্রায়। হুজুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি দান

করার মতো কিছু আছে? মহিলা বললেন, দুই দিরহাম আছে। তিনি ঐ দুই দিরহাম নিয়ে গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। এরপর দোয়ায় বসলেন। দোয়া শেষ করে মহিলাকে বললেন, 'তুমি বাসায় যাও। তোমার ছেলে ফিরে এসেছে।' মহিলা বাসায় পৌঁছে দেখলেন, হারানো ছেলে ফিরে এসেছে!

অভাবীদের কিছু দিয়ে স্রষ্টার কাছে চাইবেন। কারণ আপনি তখন স্রষ্টার দৃষ্টিতে দাতা হয়ে যাবেন। নবীজী (স) বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করলে সেই সাদাকা বা দান গ্রহীতার হাতে পৌঁছার আগেই আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। *[তাবারানী]*

আর স্রষ্টা দাতাকে পছন্দ করেন। পছন্দ করেন দান সংগ্রহকারী আর দান বিতরণকারীকেও। স্রষ্টার কাছে তাদের মর্যাদাও দাতার সমান।

ডিসেম্বর পার হলেই নতুন বছর আসবে। শুরু হবে কোয়ান্টাম বর্ষ ৩১। ধ্যান দান ও দোয়ায় আপনার জীবন ভরে উঠুক প্রশান্তি সুস্থতা ও প্রাচুর্যে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন উন্নীত হোক নতুন উচ্চতায়। প্রিয় মাতৃভূমি দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাক বিশ্বের সেরা জাতি হওয়ার পথে। নতুন আশাবাদ সঞ্চারিত হোক সারাবিশ্বের শান্তিকামী মানুষের অন্তরে।

২ ডিসেম্বর ২০২২, ঢাকা

আত্মদীপ ভবঃ

আজকে বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমা। এরকমই এক পূর্ণিমা তিথিতে মহামতি গৌতম বুদ্ধ এখন থেকে ২,৫৬৭ বছর আগে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৩ সালে কপিলাবস্তু রাজ্যের লুম্বিনী জনপদের এক বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ করেন। লুম্বিনী কপিলাবস্তু তখন এই বাংলার অংশ ছিল। তিনি রাজকুমার ছিলেন। যখন তার নামকরণের জন্যে রাজগুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, রাজগুরু পদ্মাসনে বসেছিলেন। শিশুটির পা পদ্মাসনের মাঝে অর্থাৎ দুপায়ের মাঝে ঢুকে যায়। রাজগুরু হেসে বললেন, এ তো শিশু অবস্থায়ই আমাকে ছাড়তে চাচ্ছে না। রাজকুমার সন্ন্যাসী হবে!

কোনো রাজাই চায় না যে, তার পুত্র সন্ন্যাসী হোক। প্রত্যেক রাজাই চান তার পুত্র তার মতোই রাজা হোক। বালক গৌতম যেন কখনো সন্ন্যাসের নাম না নেন সেজন্যে সে-সময় যত রকম ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা রাজার পক্ষে করা সম্ভব ছিল, তিনি করেছেন। তিনটা প্রাসাদ বানিয়েছেন পুত্রের জন্যে। গ্রীষ্মকাল শীতকাল এবং বর্ষাকাল—তিন কালে তিন প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু কোনোকিছুই তাকে সংসারে আটকে রাখতে পারে নি। ২৯ বছর বয়সে এক কাপড়ে তিনি রাজগৃহ ত্যাগ করলেন। কী খাবেন, কী পরবেন, কোথায় থাকবেন—কোনো চিন্তা ছিল না তার।

কেন? তিনি দুঃখকে অনুভব করছিলেন! গভীর অরণ্যে এক বৃক্ষতলে তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ছয় বছর পার হলো। তখন তার বয়স ৩৫ বছর। এরকম আরেক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। যখন চোখ মেললেন

আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ ...। তিনি বোধি লাভ করলেন। দুঃখের কারণ অনুভব করলেন, দুঃখ দূর করার উপায় অনুধাবন করলেন। তিনি যে সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন সেই জ্ঞানের আলোয় মানুষকে আলোকিত করার জন্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছেন।

৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে জোড়া শাল বৃক্ষের নিচে, আরেক বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। পৃথিবীতে আগমন, বোধিলাভ এবং পৃথিবী ত্যাগ করেন এই বৈশাখী পূর্ণিমায়। যে কারণে সারা পৃথিবীতে মহামতি বুদ্ধের অনুসারীরা বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে এই দিনটি উদযাপন করেন। মহামতি বুদ্ধের প্রতি, তার স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আজকে আড়াই হাজার বছর পরেও আমরা কেন মহামতি বুদ্ধকে স্মরণ করছি? তার প্রজ্ঞার জন্যে, তার সত্যজ্ঞানের জন্যে। সত্যজ্ঞানে অন্যদের আলোকিত করার জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার যে অক্লান্ত পরিশ্রম, সেই পরিশ্রমের জন্যে। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, আড়াই হাজার বছর পরে বুদ্ধবাণীর প্রাসঙ্গিকতা আছে কি? আসলে মহামতি বুদ্ধের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা তখন যে-রকম ছিল, এখনো তা একইরকম প্রাসঙ্গিক এবং শতাব্দীব্যাপী প্রাসঙ্গিক থাকবে। কারণ পৃথিবীতে যে দেশে, যে কালে যত মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন, মহামানবদের শিক্ষা এবং আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদের (স) শিক্ষা একই সূতোয় গাঁথা। তারা মানুষকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দেয়ার জন্যেই কাজ করেছেন।

বুদ্ধ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, দুঃখের কারণ হচ্ছে আসক্তি এবং আসক্তির কারণ হচ্ছে অবিদ্যা। অবিদ্যা কী? ভ্রান্ত চিন্তা, ভ্রান্ত অভিপ্রায়, ভ্রান্ত চাওয়া, ভ্রান্ত কামনা-বাসনা। এটাই হচ্ছে অবিদ্যা। এই অবিদ্যা আসক্তি সৃষ্টি করে। সমস্ত দুঃখের কারণ এই আসক্তি। এ থেকে মুক্তির পথ কী? মহামতি বুদ্ধের এই একটি উপদেশ অনন্তকালের জন্যে প্রাসঙ্গিক। কী উপদেশ?

মহামতি বুদ্ধ বোধি লাভ করার পরে একবারই ঘরে গিয়েছিলেন। তার পিতা অর্থাৎ স্বয়ং রাজা তাকে আসতে বলার পর। বুদ্ধের পুত্রের নাম ছিল রাহুল। স্ত্রী দেখলেন যে, এই সুযোগ! রাহুলকে বললেন, তোমার পিতার অনেক সম্পদ। যাও, তুমি তোমার পিতার কাছ থেকে তা চেয়ে নাও।

পুত্র রাহুল এলো পিতার কাছে সম্পদ চাইতে। জবাবে বুদ্ধ তার পুত্রকে একটি মাত্র বাক্য বলেছিলেন। বাক্যটি ছিল খুব ছোট্ট—'আত্মদীপ ভবঃ' অর্থাৎ নিজেকে প্রজ্জ্বলিত করো! আমরা যদি আরো ভেঙে বলি—নিজের শক্তিকে

জাগ্রত করো। নিজের মধ্যে যে সুপ্ত মেধা রয়েছে, এই মেধাকে জাগ্রত করো। একজন মানুষের নিজের শক্তিই তার সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা কী বলি? বল বল আপনা বল।

আপনার অর্থবিত্ত প্রাসাদ জমিজমা কলকারখানা সব আরেকজন কেড়ে নিতে পারে; কিন্তু আত্মশক্তি অর্থাৎ নিজের শক্তি বা বলকে কেউ কখনো কেড়ে নিতে পারবে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা অনন্য মানবীয় সত্তা আছে। যাকে আমরা বলি সুপারম্যান, অনন্য মানুষ বা ইনসানে কামেল। ইনসানে কামেলের শক্তি সুপ্ত আছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। সেই শক্তিকে জাগ্রত করতে পারলেই যে-কোনো মানুষ তার দুঃখকে আনন্দে, রোগকে সুস্থতায়, অশান্তিকে প্রশান্তিতে এবং অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করতে পারবে। আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে মহামতি বুদ্ধের এই বাণীকে স্মরণ করি—আত্মদীপ ভবঃ! নিজের শক্তিকে জাগ্রত করো।

একজন পিতা তার পুত্রকে এর চেয়ে বড় কোনো সম্পদ, বড় কোনো উপহার দিতে পারে না—পুত্র যেন নিজের শক্তিকে জাগ্রত করে সেই পিতাকে অতিক্রম করতে পারে; পুত্রের নামে যাতে পিতা পরিচিতি পেতে পারে যে, অমুকের বাবা অমুক। আর যদি আত্মশক্তিকে কেউ জাগ্রত না করে, পিতার শক্তিকে সে অপচয় করে ফেলে।

বুদ্ধ কিন্তু সবসময় ঘুরে বেড়াতেন গ্রাম থেকে গ্রামে, নগর থেকে নগরে। মানুষকে জ্ঞানের পথে, সত্যের পথে, দুঃখ মুক্তির পথে নিয়ে আসার জন্যে। মহামতি বুদ্ধ তার সারাজীবন ব্যয় করেছেন মানুষের ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করার জন্যে। এই জাগ্রত করার পথটা কী? সৎ চিন্তা, সৎ অভিপ্রায়, সৎ ভাবনা। এই যে ভাবনার শক্তি, চিন্তার শক্তি, অভিপ্রায়ের শক্তি, এই বাণীই তিনি সবার মাঝে প্রচার করেছেন।

ধম্মপদ কণিকার প্রথম পদ হচ্ছে, ‘চিন্তা বা অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটে স্বভাব বা প্রকৃতিতে। যদি কেউ মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে, দুঃখ তাকে অনুগমন করে। আর কেউ যদি সুচিন্তা নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে, সুখ তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে।’ *[যমকবগ্‌গো : ১-২]*

প্রত্যেক মানুষের দুঃখের কারণ হচ্ছে ভ্রান্ত চিন্তা, ভ্রান্ত অভিপ্রায়, মন্দ অভিপ্রায়। যখনই দুঃখ পাবেন তখন অন্যের মধ্যে কারণ খুঁজতে যাবেন না যে, অমুকে আমাকে কষ্ট দিল। কেউ কাউকে কষ্ট দিতে পারে না, যদি আপনি কষ্ট না পান। কেউ কাউকে অপমানিত করতে পারে না, যদি আপনি অপমানিত

বোধ না করেন। মহামতি বুদ্ধ কিন্তু বলে দিয়েছেন, দুঃখ কোন পথে এবং সুখ কোন পথে পাবে। অর্থাৎ পথ দুটো। একটা সুখের পথ। একটা দুঃখের পথ।

বুদ্ধের আবির্ভাবের হাজার বছর পরে আরবে জন্মগ্রহণ করলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (স)। তার বাণী সম্বলিত গ্রন্থ *বোখারী শরীফ* এবং *মুসলিম শরীফের* প্রথম হাদীস কী? 'নিয়ত সকল কর্মের অঙ্কুর।' *[ওমর ইবনে খাত্তাব (রা); বোখারী, মুসলিম]*

যেভাবে নিয়ত করবেন, যেভাবে অভিপ্রায় করবেন আপনি সেই ফলই লাভ করবেন। আপনি দেখেন, মহামানবদের শিক্ষার মধ্যে কত চমৎকার মিল!

বুদ্ধের শিক্ষা কর্মের শিক্ষা। আমাদের আসলে বুদ্ধবাণী নিয়ে ভুল ধারণা রয়েছে। আমরা মনে করি যে, যারা সন্ন্যাসী হবে, ভিক্ষু হবে, শ্রমণ হবে, বুদ্ধবাণী শুধু তাদের জন্যে। না, বুদ্ধবাণী প্রত্যেকের জন্যে। মহামতি বুদ্ধ যে কাজটি করেছেন, সেটা সেই সময়ের সবচেয়ে বড় এবং সাহসী কাজ। তখনকার সমাজ ছিল বর্ণবাদী সমাজ। সেখানে মানুষের মর্যাদা নির্ণীত হতো জন্মসূত্রে। যে যেই গোত্রে বা যেই বর্ণে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই বর্ণ অনুসারে তার মর্যাদা নির্ধারিত হতো। বুদ্ধ প্রথম প্রতিবাদ করলেন যে, না, জন্ম কাউকে ব্রাহ্মণ করে না, জন্ম কাউকে শূদ্র করে না, কর্ম মানুষকে ব্রাহ্মণ করে, কর্ম মানুষকে শূদ্র করে। অর্থাৎ কর্ম দ্বারা তার মর্যাদা নির্ধারিত হবে।

তখনকার সমাজ ছিল চরম বর্ণবাদী। উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষকে কখনো মানুষ হিসেবে গণ্য করত না। নিম্নবর্ণের মানুষের মানবীয় কোনো মর্যাদা ছিল না। বুদ্ধ তাদেরকে মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, নিম্নবর্ণের কারো ছায়া যদি উচ্চবর্ণের কারো গায়ে পড়ে, তাহলে গঙ্গাজলে স্নান করে তাকে শুচি হতে হয়। স্পর্শ করা তো পরের কথা, কেবল ছায়া পড়লেই অশুচি হতো। স্বাভাবিকভাবে নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণের মানুষ দেখলেই রাস্তা থেকে দূরে সরে দাঁড়াত।

বুদ্ধ একদিন রাজগৃহের রাস্তা দিয়ে মগধের রাজধানীতে যাচ্ছেন। একজন মেথর, যার নাম সুনীত, ঝাড়ু দিচ্ছিল। দূর থেকে মহামতি বুদ্ধকে আসতে দেখেই সে একবারে জড়সড় হয়ে রাস্তা ছেড়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বুদ্ধ যখন কাছে এলেন, তাকে ডাকলেন। বুদ্ধ ডাকছেন, কাছে না গিয়ে তো উপায় নেই। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমন করলে কেন? সে বলল, আমার ছায়া যদি আপনার গায়ে লাগে তো আপনার অশুচি হবে। সেজন্যে আমি সরে গিয়েছিলাম। বুদ্ধ বললেন, না, তুমিও আমার মতোই মানুষ। সুনীত বিস্মিত

হলো। হা করে তাকিয়ে রইল। 'বলেন কী! আমিও মানুষ!' তারপর তার প্রশ্ন জাগল, আমি কি সাধনা করতে পারব? কারণ তখন নিম্নবর্ণের মানুষের সাধনা করার উপায় ছিল না। সাধনাও সীমাবদ্ধ ছিল বিশেষ বর্ণের মানুষদের জন্যে। বুদ্ধ বললেন, অবশ্যই পারবে।

সুনীত সব ছেড়ে বুদ্ধের সাথে চললেন। রাজগৃহের সবচেয়ে বড় বিহার বেনুবনে তাকে নিয়ে গেলেন এবং তাকে দীক্ষিত করলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে অর্হৎ। সাধনা করতে করতে সুনীত অর্হৎ-এর মর্যাদা লাভ করলেন।

বুদ্ধ মানুষকে তার মানবীয় মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহামতি বুদ্ধ নারীদের জন্যেও সাধনার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। নারীদের মধ্যেও যারা সাধনা করেছেন, যেমন : মহাপ্রজাপতি গৌতমী, সুজাতা—তারাও অর্হৎ পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন নিজেদেরকে। অর্থাৎ মহামতি বুদ্ধ সাধনার পথ নারী-পুরুষ, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্যে উন্মুক্ত করেছিলেন।

মহামতি বুদ্ধ বোধি লাভ করার পর যেখানে যেতেন বিহার স্থাপন করতেন। তিনি তার অনুসারীদের, শ্রমণদের ধ্যানের পথে, বিনয়ের পথে, সাধনার পথে নিয়ে যেতেন। তাদের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করার জন্যে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

গৃহীদের জন্যে তিনি সবসময় কর্মের উপদেশ দিয়েছেন। আমরা জানি, বুদ্ধ যে কালে জন্মগ্রহণ করেন তখন সমাজে একটা পরিবর্তন এসেছিল। লোহার বহুমুখী প্রচলন শুরু হয়েছে। গ্রামীণ জনপদগুলো ভেঙে শহর সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ একটা সামাজিক বিবর্তনকালে বুদ্ধের আগমন।

দিঘাজানু নামের এক ব্যক্তি বুদ্ধের কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, মহামতি! আমরা সাধারণ গৃহী মানুষ। আমাদের পরিবার আছে, স্ত্রী আছে, সন্তান আছে। আপনি কি আমাদের জন্যে কোনো উপদেশ দেবেন? বুদ্ধ বললেন, দেখ, একজন মানুষের সুখ লাভের চারটা উপায় আছে। এই চারটা কাজ যদি করো, তুমি পৃথিবীতে সুখী হবে।

এক. যে পেশাতেই তুমি থাকো না কেন, প্রথম তোমাকে দক্ষ হতে হবে, আন্তরিক হতে হবে, উদ্যোগী হতে হবে, কর্মঠ হতে হবে।

দুই. তোমার ঘাম এবং শ্রম দিয়ে সৎভাবে যা উপার্জন করলে, এই উপার্জন তোমার সুরক্ষা করবে।

তিন. ভালো বন্ধুর সংস্পর্শে থাকবে। যারা বিশ্বস্ত, সৎকর্মশীল, বুদ্ধিমান

এবং যারা উদারমনা, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করবে। তাহলে তুমি খারাপ এবং অন্যায় থেকে রক্ষা পাবে।

চার. যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যয় করবে, মিতব্যয়ী হবে। অপচয় করবে না, অপব্যয়ী হবে না, আবার কৃপণ হবে না। অর্থাৎ নিজের সামর্থ্যের মধ্যে সবসময় জীবনধারণ করবে। তাহলে তুমি ইহকালে সুখ পাবে।

মহামতি বুদ্ধের একজন অনুরাগী শিষ্য ছিলেন। তিনি গৃহী এবং সেই সময়কালে ব্যাংকার ছিলেন। অর্থাৎ অর্থলগ্নী এবং অর্থ লেনদেন করতেন। তিনি সুখ লাভের জন্যে উপদেশ চাইলেন। বুদ্ধ সুখের চারটা সূত্র তাকে বলেছিলেন। তার মূল বক্তব্য ছিল পালি ভাষায়। পালি থেকে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেছে। এজন্যে দুই ভাষার মধ্যে অনেক মিল।

তিনি বলেন, একজন গৃহী চার ভাবে সুখী হতে পারে—

হালাল উপার্জন। বৈধপন্থায় যে সম্পদ উপার্জন করবে, এই সম্পদ তাকে আর্থিক নিরাপত্তা দেবে। এটা হচ্ছে সুখের প্রথম সূত্র।

দ্বিতীয়ত, যখন এই সম্পদ সে মুক্তহস্তে নিজের জন্যে, নিজের পরিবারের জন্যে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়ের জন্যে এবং ভালো কাজে ব্যয় করবে।

তৃতীয়ত, তাকে সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

চতুর্থত, অসৎ চিন্তা, অসৎ কর্ম থেকে দূরে থেকে সৎ সুন্দর জীবনযাপন করতে হবে।

বুদ্ধ আড়াই হাজার বছর আগে ঋণ থেকে মুক্ত থাকতে বলে গেছেন। কারণ ঋণ একজন মানুষকে দাসে রূপান্তরিত করে এবং শেষ পর্যন্ত সে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়। এটার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, দারিদ্র্য হচ্ছে কষ্টের, দুঃখের। ঋণগ্রস্ত হওয়া আরো কষ্টের, আরো দুঃখের। ঋণের সুদ দেয়া কষ্টের। ঋণশোধ করতে হবে—এই চাপ কষ্টের। খাতক তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সে যখন টের পায় যে, তাকে খোঁজা হচ্ছে ঋণশোধের জন্যে, এটা কষ্টের। তার জীবন হয়ে যায় দাসের জীবন। কারণ যখন সে ঋণশোধ করতে পারে না, সে বিনা অর্থে কামলাগিরি করে। কামলা বোঝেন তো? বেগার খাটে। খেটে আসবে কিন্তু কোনো পয়সা পাবে না। এই দাসত্বটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কষ্টের।

বুদ্ধের কাছে শ্রমণ বা ভিক্ষু হওয়ার জন্যে যারা আসতেন, তাদের মধ্যে কোনো ঋণগ্রস্ত লোককে তিনি আশ্রমে ঢোকাতেন না। তিনি বলতেন, আগে ঋণশোধ করে আসো। ঋণগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা মহামতি বুদ্ধ যেভাবে উপলব্ধি

করেছিলেন, এর কোনো তুলনা নেই।

হাজার হাজার বছর ধরে যত নবী-রসুল এসেছেন, যত মহামানব এসেছেন তাদের শিক্ষার পরিপূর্ণ রূপ হচ্ছে মহানবী মুহাম্মদের (স) শিক্ষা। নবীজী (স) কী বলেছেন ঋণের ব্যাপারে? তিনি উপার্জনের ব্যাপারে কী বলেছেন? গৃহীদের জন্যে কী বলেছেন? *বোখারী শরীফের* হাদীস : 'একবার নবীজী (স) তার সাহাবীদের সাথে বসেছিলেন। একজন শ্রমিক তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। উপস্থিত সাহাবীরা মন্তব্য করলেন, হায়! এর মেহনত যদি আল্লাহর পথে হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! নবীজী (স) তাদের মন্তব্য সংশোধন করে বললেন, যদি তার এই মেহনত তার সন্তানের লালনপালনের জন্যে হয়, তাহলে সে আল্লাহর পথেই কাজ করছে। তার মেহনত যদি তার পিতামাতার ভরণপোষণের জন্যে হয়, তাহলেও এই কথা প্রযোজ্য হবে। অন্যের কাছে ভিক্ষা যাতে করতে না হয়, সে উদ্দেশ্যে যদি সে মেহনত করে থাকে, তাহলেও সে আল্লাহর পথেই কাজ করছে।' *[বোখারী (কিদওয়াই)]*

অর্থাৎ একজন গৃহীর সৎ অন্নের জন্যে, হালাল রুজির জন্যে শ্রম দেয়াকে বুদ্ধ যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন একইভাবে মুহাম্মদ (স) গুরুত্ব দিয়েছেন।

মহামতি বুদ্ধের শিক্ষার সারাংশ যদি একটা বাক্যে আমরা বলি, যেটা তিনি তার সন্তানকে বলেছিলেন যে, আত্মদীপ ভবঃ—নিজেকে প্রজ্জ্বলিত করো। এই শিক্ষা সমস্ত যুগের, সমস্ত কালের মানুষের জন্যে প্রযোজ্য। একজন মানুষ যদি নিজেকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারে—সৎ চিন্তা, সৎ ভাবনার মাধ্যমে যদি সে নিজের অন্তর্গত শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে, তাহলে সে সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। সে তখন সম্পদশালী হয়ে ওঠে। সমস্ত সুখ তখন তার, সমস্ত প্রাচুর্য তখন তার। তার প্রাচুর্য, তার সম্পদ, তার সুখ পৃথিবীর কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

আমরা কোয়ান্টামে গত ৩০ বছর ধরে এটাই বলছি যে, নিজের শক্তিকে জাগ্রত করো। এই শক্তিকে যত আপনি জাগ্রত করবেন তত আপনি অভাবমুক্ত থাকবেন। আপনার জীবন প্রাচুর্যে ভরে উঠবে। আপনার কারো দিকে তাকাতে হবে না। নিজের ভেতরের এই শক্তিই আপনার দুঃখকে আনন্দে, অভাবকে প্রাচুর্যে, রোগকে সুস্থতায়, অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করবে। তাই প্রথমে ভালো ভাবতে হবে। সৎ অভিপ্রায়, নিয়ত, চিন্তা ঠিক করতে হবে। আমরা কোয়ান্টামে কী বলি? ভাবুন, বিশ্বাস করুন, অর্জন করুন। ইনশাআল্লাহ! সব সম্ভব।

মহামতি বুদ্ধ এই বাংলার মানুষ ছিলেন। এটা আমাদের জন্যে আনন্দের। এই বুদ্ধ পূর্ণিমাতে আমি কোয়ান্টামমে অবস্থান করছি এবং আপনাদের সামনে কথা বলতে পারছি, এটাও আমার জন্যে আনন্দের। কারণ আপনাদের এই মুখগুলোকে যখন দেখি, আমার নাতি-নাতনিদের যখন দেখি, আমার বুক ভরে যায়। আমি সবচেয়ে ভাগ্যবান দাদা অথবা নানা যে, আমার এত নাতি-নাতনি! আমার নাতিরা উপার্জন করতে শুরু করেছে। তারা আমার জন্যে খামে করে শুধু চিঠি না, চিঠির ভেতরে আবার টাকা পাঠিয়েছে। প্রথম যখন টাকা দেখলাম, আমি আমার চোখের পানি সামলাতে পারি নি। দোয়া করেছি। সে আজকে কোন স্তরে উঠে গেছে! সে-ও দান করতে শিখেছে!

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। কোয়ান্টামমের সিকি শতাব্দী। ২৫ বছরে আমরা আমাদের ধ্যানঘরকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করতে পারছি। এই ধ্যানঘরকে কেন্দ্র করেই আস্তে আস্তে আমাদের স্কুল, আমাদের কলেজ এবং সামনে কসমো ভার্সিটি হবে। কসমো ভার্সিটি মানে হচ্ছে ক্লাস্টার অব ইউনিভার্সিটি। ইনশাআল্লাহ অন্তত ১০টা বিশ্ববিদ্যালয় আমরা করব।

আমরা স্বপ্ন দেখি, পুরো পাহাড়ি জনপদে কেউ শিক্ষাবঞ্চিত থাকবে না। শুধু পাহাড় নয়, সারাদেশেই কেউ শিক্ষাবঞ্চিত থাকবে না। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়বে। সেভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। মানুষের আত্মশক্তিকে যেন জাগ্রত করতে পারি সেজন্যে করণীয় কাজগুলো আমরা ধাপে ধাপে করব, ইনশাআল্লাহ!

৫ মে ২০২৩, কোয়ান্টামম

পরিভাষা

আত্মশুদ্ধি কার্যক্রম : কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অগ্রসর সদস্যদের নিয়ে বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে অনুষ্ঠিত একটি আত্ম উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

ইকরান : কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস।

করসেবা : সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কায়িক শ্রম করা হয় সেটাই করসেবা।

কোয়ান্টা : কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের বলা হয় কোয়ান্টা।

কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট : কোয়ান্টাম মেথড কোর্স সম্পন্নকারী।

কোয়ান্টামম : কোয়ান্টাম চেতনার লালনভূমি। কোয়ান্টাম ও মমতা—এই দুই শব্দের মিশেলে কোয়ান্টামম। বান্দরবান লামার সরই ইউনিয়নে অবস্থিত এক আলোকিত জনপদ।

কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন : রমজান মাসের বিশেষ বরকতময় প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামটিতে মৌন থেকে আরবি ও বাংলা কোরআন শ্রবণ ও অনুধাবনের আয়োজন করা হয়।

জাবলে রাজিউন : কোয়ান্টামমে আরোগ্যশালা সংলগ্ন কবরস্থান।

ধ্যানঘর : কোয়ান্টামমে ধ্যানীদের আত্মনিমগ্ন হওয়ার জন্যে নির্মিত স্থাপনা।

প্রবীণসেবা : অসহায় প্রবীণদের লালনপালন ও পূর্ণ যত্নায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের একটি সেবা কার্যক্রম।

ফিকরান : কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ছেলে শিক্ষার্থীদের প্রাইমারি ক্যাম্পাস।

মনছবি : আপনি যা হতে চান বা পেতে চান সেটা বিশ্বাস করা, হয়ে যাচ্ছি বা পাচ্ছি বলে অনুভব ও অবলোকন করার নাম মনছবি।

মারহামান হল : বান্দরবানের কোয়ান্টামমে অবস্থিত সুবিশাল প্রোগ্রাম হলটির নামকরণ করা হয়েছে মারহামান হল।

হিকমান : কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের ছেলে শিক্ষার্থীদের হাই স্কুল, ভোকেশনাল ও কলেজ ক্যাম্পাস।

প্রিয় পাঠক,

এ বইয়ের কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

মহাজাতক

যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
E-mail : info@quantummethod.org.bd

মহাজাতক

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন ও পজিটিভ লাইফস্টাইল চর্চার পথিকৃৎ। জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথডের উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে ৩৩ বছর ধরে একনাগাড়ে দেশজুড়ে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

মেডিটেশন চর্চার ইতিহাসে উদ্ভাবক কর্তৃক এককভাবে ক্লাস নিয়ে ৪৯৯+ কোর্স সম্পন্ন করা বিশ্বে এই প্রথম।

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত নন-ফিকশন গ্রন্থ *কোয়ান্টাম মেথড*সহ তার রচিত সবগুলো বই ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ২০১৪ সালে *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* এবং ২০২১ সালে *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী* প্রকাশিত হওয়ার পর পেয়েছে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা।

কোয়ান্টাম ভালো ভাবার, ভালো বলার,
ভালো করার, ভালো থাকার বিজ্ঞান।
আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

কী চান আপনি?
আত্মবিশ্বাস? অস্থিরতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও
বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি? প্রশান্তি? সুস্বাস্থ্য? বর্ণিল জীবন?
উপচে-পড়া প্রাচুর্য? ঈর্ষণীয় অর্জন? সুখ?

চাওয়া যা-ই হোক, আসুন, মেডিটেশন চর্চা করুন।
মাইন্ড সেট করুন। আপনার মধ্যে বিশ্বাস ও
ইতিবাচক শক্তির স্ফুরণ ঘটবে।

আপনি অর্জন করবেন
নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করার সামর্থ্য।
চারপাশের মানুষ ভাবতে শুরু করবে—
আপনি সৌভাগ্যের বরপুত্র। আপনার আন্তরিক চাওয়া
স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিণত হবে পাওয়ায়।

লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন—
ইনশাআল্লাহ সব সম্ভব!
আপনার কণ্ঠেও ধ্বনিত হবে—
ভালো মানুষ ভালো দেশ! স্বর্গভূমি বাংলাদেশ!

quantummethod.org.bd

978-984-35-8734-3

978-984-35-8734-3